Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনে বর্ণিত নবীদের ঘটনা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রোমানা ইসলাম সীমা

রোলঃ 227020891

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনে বর্ণিত নবীদের ঘটনা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রোমানা ইসলাম সীমা

রোলঃ 227020891

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআনে বর্ণিত নবীদের ঘটনা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রোমানা ইসলাম সীমা, আইডিঃ 227020891বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআনে বর্ণিত নবীদের ঘটনা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

রোমানা ইসলাম সীমা

(স্বাক্ষর)

রোমানা ইসলাম সীমা

আইডিঃ 227020891

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

হযরত আদম আলাইহিসিস সালাম

ফেরেশতার উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব

ইমাম বাগাবী রহ. বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন বলেন, আমি যমিনে খলীফা বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ পরস্পরে আলোচনা করলেন যে, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যা ইচ্ছা সৃষ্টি করবেন, কিন্তু নিশ্চয় আমাদের চেয়ে উত্তম কোন মাখলুক সৃষ্টি করবেন না। আর যদি কোন মাখলুক আমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট সৃষ্টিও করেন, তবু জ্ঞানের দিক দিয়ে আমরা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ থাকবো নিশ্চয়। কেননা, প্রথমত আমরা তাদের আগে সৃষ্টি হয়েছি এবং দ্বিতীয়ত আমরা এমন সব আশ্চর্য ঘটনা দেখেছি, যা তারা দেখেনি।

তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। এ ব্যবস্থা সম্পর্কে সূরা বাকারায় বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۚ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○ قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ○ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ○

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা আদম 'আলাইহিস সালামকে যাবতীয় (বস্তুর) নাম শিক্ষা দিলেন। তারপর সেগুলোকে ফেরেশতাগণের সামনে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন, তোমরা এসবের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ফেরেশতাগণ বললেন, আপনি অতি পবিত্র, আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের কোন জ্ঞানই নেই। নিশ্চয় আপনিই প্রকৃত জ্ঞানবান ও প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম, তাদের এগুলোর নাম বলে দাও। সঙ্গে সঙ্গে যখন আদম 'আলাইহিস সালাম তাদের সেগুলোর নাম বলে দিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আসমান ও যমিনের যাবতীয় অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ, আমি সবই জানি? (সূরা বাকারা, আয়াত: ৩১-৩৩)

হযরত আদম 'আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা কোন কোন বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন, এব্যাপারে তাফসীরকারদের থেকে কয়েকটি মত বর্ণিত আছে। অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, সারাবিশ্বের সমস্ত মাখলুকের নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.,

মুজাহিদ ও কাতাদা রহ. বলেন, যাবতীয় বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন। এমনকি বড় পেয়ালা ও ছোট পেয়ালার নামও শিখিয়েছিলেন।

অনুরূপ কেউ কেউ বলেন, পৃথিবীতে যা আগে হয়েছে এবং যা কিয়ামত পর্যন্ত হবে, সবকিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন।

হযরত রবী ইবনে আনাস রহ. বলেন, তাকে ফেরেশতাগণের নাম শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, তার সন্তানসন্ততির নাম শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

আবার কেউ কেউ এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, আদম ‘আলাইহিস সালামকে সকল বস্তুর নাম ও গুণাবলী শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

তেমনিভাবে কারো কারো অভিমত হলো, আল্লাহ তা‘আলা আদম ‘আলাইহিস সালামকে সমস্ত ভাষা শিক্ষা দিয়েছিলেন। একারণেই আদমসন্তানরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। (তাফসীরে মাযহারী)

সারকথা, আল্লাহ তা‘আলা এভাবে ফেরেশতাদের সামনে হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অনন্য মর্যাদার বিষয়টি চাক্ষুষভাবে প্রমাণিত করলেন এবং বললেন, বিশ্ব খিলাফতের জন্য পৃথিবীতে যতো সৃষ্ট জিনিস রয়েছে এর নাম, গুণাবলী, বিস্তারিত অবস্থা ও যাবতীয় লক্ষণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। বস্তুত তোমাদের মধ্যে এধরনের যোগ্যতা ও গুণাবলী নেই। কিন্তু আদমের মধ্যে সেই গুণাবলী আছে।

আল্লামা বাগাবী রহ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের আত্মাহীন দেহ মক্কা ও তায়েফের মাঝখানে রাখা ছিল। তখন ইবলীস সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় বলেছিল, একে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? এরপর সে তার সঙ্গী ফেরেশতাদের বললো, যদি তাকে তোমাদের চেয়ে উত্তম বানানো হয় এবং তোমাদের তার আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে তোমরা কী করবে? ফেরেশতাগণ সবাই এক স্বরে বললেন, আমরা আমাদের রবের হুকুম মেনে নিব। ইবলীস তখন মনে মনে বললো, আল্লাহর কসম, আমাকে যদি তার উপর ক্ষমতাবান করা হয়, তবে আমি তাকে ধ্বংস করে ছাড়বো। আর তাকে যদি আমার উপর ক্ষমতাবান করা হয়, তা হলে অবশ্যই আমি তাকে অমান্য করবো।

এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা'আলা আদম 'আলাইহিস সালামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের পর ফেরেশতাদের বলেন,

وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ

অর্থঃ এবং আমি জানি যা তোমরা প্রকাশ করছো এবং যা তোমরা লুকিয়েছিলে। (সূরা বাকারা, আয়াত: ৩৩)

অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ যে আমার আনুগত্য প্রকাশ করেছে তা আমি জানি। আর শয়তান যে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা তার মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে, সে সম্পর্কেও আমি অবগত।

আলাইহিস সালামকে সিজদার নির্দেশ এবং ইবলীসের অবাধ্যতা

হযরত আদম 'আলাইহিস সালামের মাঝে যেহেতু ফেরেশতা ও জিন উভয় সম্প্রদায়ের যাবতীয় জ্ঞানের সমাহার ঘটেছিল, সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ পদমর্যাদা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট ছিল। এখন আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টি কার্যকরভাবে প্রকাশ করার ইচ্ছা করলেন যে, ফেরেশতা ও জিনদের দিয়ে হযরত আদম 'আলাইহিস সালামের প্রতি এমন বিশেষ ধরনের সম্মান প্রদর্শন করানো হোক, যদ্দ্বারা কার্যত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি তাদের উভয়ের চাইতে উত্তম ও পূর্ণতর। এজন্য তাদের হযরত আদম 'আলাইহিস সালামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনমূলক সিজদা করার আদেশ দিলেন।

তখন আল্লাহ তা'আলার হুকুম পাওয়ামাত্র সকল ফেরেশতা একসঙ্গে সিজদা করলেন। কিন্তু ইবলীস সিজদা করলো না। সে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে সিজদা করতে অস্বীকার করলো। এ সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّآ اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ○

অর্থঃ যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো। তখন তারা সবাই সিজদা করলো ইবলীস ছাড়া। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করলো এবং অহংকার প্রদর্শন করলো। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (সূরা বাকারা, আয়াত: ৩৪)

সুজূদ (سجود) বা সিজদা (سجدة) শব্দের আভিধানিক অর্থ বিনয় ও হীনতা প্রকাশ করা। আর শরী'আতের পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে ইবাদতের উদ্দেশ্যে যমিনের উপর কপাল রাখা।

ফেরেশতাগণের প্রতি যে সিজদার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল, এর দিয়ে শর'ঈ সিজদা বুঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে সিজদা গণ্য হবে আল্লাহ তা'আলারই জন্য। কেননা, এর নির্দেশ তিনিই দিয়েছেন। সেই সাথে এর দিয়ে হযরত আদম 'আলাইহিস সালামের প্রতি অনন্য সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্য। এতে করে প্রথমপর্যায়ে ফেরেশতাগণ আদম 'আলাইহিস সালামের মর্যাদা যে অস্বীকার করেছিল, তা অসার প্রমাণিত হবে এবং এর বিপরীতে তাদের দিয়ে আদম 'আলাইহিস সালামের সুউচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি প্রমাণিত হবে। এ হিসেবে বলা যায়, আল্লাহর জন্য সিজদার ক্ষেত্রে আদম 'আলাইহিস সালামকে কিবলা বানানো হয়েছিল। হাদীস শরীফে এমনটিই বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আদম-সন্তান যখন (পবিত্র কুরআনের) সিজদার আয়াত পাঠ করে এবং সিজদা করে, তখন শয়তান কোনায় গিয়ে কান্না করে এবং বলতে থাকে, আফসোস, আদম-সন্তানকে সিজদার হুকুম করা হয়েছে, আর সে সিজদা করে জান্নাতের অধিকারী হয়েছে। অপরদিকে আমাকে সিজদার হুকুম করা হয়েছিল, কিন্তু আমি তা অমান্য করেছি, তাই আমার জন্য রয়েছে জাহান্নাম!

এই ব্যাখ্যা অনুসারে اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ -এর لِ (অর্থ জন্য) শব্দটি اِلٰى (অর্থ দিকে)-এর অর্থ দিবে। এতে অর্থ হবে আদমের দিকে ফিরে আমাকে (আল্লাহকে) সিজদা করো।

অথবা আয়াতটির তাবীর এভাবেও করা যায় যে, ফেরেশতাদের তরফ থেকে যেহেতু বাহ্যত আদম 'আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার জন্য আপত্তি প্রকাশ পেয়েছিল, তাই তাওবা হিসাবে তাদের উপর একটি সিজদা ওয়াজিব হয়েছে। আর ওই সিজদার মূল কারণ আদম 'আলাইহিস সালাম হওয়ার দরুন لِاٰدَمَ বলা হয়েছে।

এই ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতের অর্থ হবে আদমের কারণে আমাকে সিজদা করো। তখন لِاٰدَمَ-এর لِ হরফটি কারণমূলক অব্যয় হবে।

কিংবা এখানে সিজদার আদেশ দিয়ে সিজদা শব্দের আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য বলেও তাবীর করা যায়। অর্থাৎ আদমের সামনে সম্মানসূচক বিনয় ও নীচতা প্রকাশ করো। যেরূপ হযরত ইউসুফ 'আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা তাকে সম্মানসূচক সিজদা করেছিল। (তাফসীরে মাযহারী)

ইবলীস হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামকে সিজদা না করার সময় দুটি কথা বলেছিল, প্রথমত সে বলেছিল, আদম মাটির তৈরী এবং আমি আগুনের। আপনি মাটির আদমকে আমি-আগুনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন কেন?

এই প্রশ্নটি আল্লাহ তা‘আলার আদেশের বিপরীতে সেই নির্দেশের রহস্য জানার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কোন আদিষ্ট ব্যক্তির এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই।

আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট ব্যক্তির যে রহস্য অনুসন্ধানের অধিকার নেই, একথা বলাইবাহুল্য। কারণ, দুনিয়াতে স্বয়ং মানুষ তার চাকরকে এই অধিকার দেয় না যে, সে তার চাকরকে কোন কাজ করতে বলবে এবং চাকর সেই কাজটি করার পরিবর্তে মালিককে প্রশ্ন করবে, এর রহস্য কী? তাই ইবলীসের এই প্রশ্নটিকে উত্তরের অযোগ্য সাব্যস্ত করে কুরআন মজীদে তার স্পষ্ট কোন উত্তর দেওয়া হয়নি।

তবে বাহ্যিক উত্তর হলো, এক বস্তু অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অধিকার একমাত্র সেই সত্তার, যিনি সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি যখন যে বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন, তখন তা-ই শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে কারো কোনরূপ আপত্তি তোলার কোন অধিকার নেই।

ইবলীসের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, যদি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত জীবন দান করা হয়, তবে আমি কিছু মুখলিস বান্দা ছাড়া আদমের গোটা বংশধরকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো।

আল্লাহ তা‘আলা এর উত্তরে বলেছেন, আমার খাঁটি বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা চলবে না, যদিও তোর গোটা বাহিনীর সর্বশক্তি এই কাজে নিয়োজিত হয়। আর অবশিষ্ট অখাঁটি বান্দারা তোর বশীভূত হয়ে গেলে, তাদের দুর্দশা তা-ই হবে, যা তোর জন্য নির্ধারিত। অর্থাৎ জাহান্নামের আযাবে তাদের সবাই নিপতিত হবে।

কুরআন মজীদে একথাই বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا○ قَالَ اَرَءَيْتَكَ
هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا ○ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ
تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا○

অর্থঃ স্মরণ করুন, যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো, তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সিজদা করলো। সে বললো, আমি কি এমন ব্যক্তিকে সিজদা করবো, যাকে আপনি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? সে বললো, আচ্ছা বলুন তো, এ ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন (তার মধ্যে মর্যাদার কী আছে?), আপনি যদি আমাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন, তা হলে আমি স্বল্পসংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদের আমার বশীভূত করে ফেলব। আল্লাহ তা'আলা বললেন, যাও, তাদের মধ্য থেকে যারা তোমার অনুসরণ করবে, জাহান্নামই হবে তোমাদের সকলের যথার্থ শাস্তি। (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৬১-৬৩)

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র উক্ত বিষয়টি এভাবে বিবৃত করা হয়েছে,

قَالَ مَا مَنَعَکَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُکَ ؕ قَالَ اَنَا خَیْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِیْنٍ○

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা বললেন, কোন বিষয়টি তোমাকে সিজদা করতে বারণ করলো যখন আমি তোমাকে আদেশ করেছি? ইবলীস উত্তরে বললো, আমি আদমের চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আর আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১২)

অর্থাৎ শয়তানের বক্তব্য ছিল, আমি আদমের চেয়ে অধিক সম্মানিত। কেননা, আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং আগুন ঊর্ধ্বগামী আর আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা নিম্নমুখী। আগুনের সৃষ্টির সাথে মাটির সৃষ্টির তুলনা হতে পারে না। অতএব আমি কেন আদমকে সিজদা করবো?

আল্লাহ তা'আলা অন্তর্যামী, মনের গুপ্তবিষয়ও তিনি জানেন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই তাঁর নিকট সমান। ইবলীসের মনের অবস্থা তিনি সবই জানতেন। তবু তিনি পরীক্ষার জন্য এবং সর্বসমক্ষে তার জবাব প্রকাশ করানোর জন্য ইবলীস-শয়তানকে উক্ত প্রশ্ন করেছেন।

হতভাগা ইবলীস নিজের গর্ব ও অহংকারের দরুন একথা ভুলে গেল যে, যখন সে এবং আদম উভয়ে আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্ট, তখন সৃষ্টজীবের মূল তথ্য, স্রষ্টার চেয়ে বেশী সৃষ্টজীব নিজেও জানতে পারে না। শয়তান নিজের আত্মগরিমা ও অহংকারের কারণে এই কথাটি বুঝতেই পারলো না যে, ইজ্জত-সম্মানই কখনো ঐ জিনিসের উপর নির্ভর করে না, যা দিয়ে সে তৈরী

বরং ইজ্জত-সম্মান নির্ভর করে ঐ সমস্ত গুনের উপর, যা বানানেওয়ালা বানানোর পর ঐ জিনিসের মধ্যে দিয়েছেন।

শয়তানের জবাব যেহেতু অহংকার ও গর্বের মূর্খতাপ্রসূত ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল, তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে স্পষ্ট বলে দিলেন, মূর্খতাজনিত গর্ব ও অহংকার তোকে এত অন্ধ করে দিয়েছে যে, তুই নিজের স্রষ্টার হকও ভুলে গিয়েছিস। সে কারণে আমার নির্দেশে আপত্তি উত্থাপন করেছিস, যা এই কথা প্রমাণ করছে যে, আমি (আল্লাহ) তোকে যে আদেশ করেছি তা আমার (আল্লাহর) অন্যায় হয়েছে। আমাকে (আল্লাহকে) দোষী প্রমাণ করার মতো বেআদবী আর দুঃসাহস তোর দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। একথা বুঝতে পারলি না যে, তোর মূর্খতা তোকে আসল তথ্য বুঝতে অক্ষম ও অপারগ বানিয়ে দিয়েছে। অতএব, তুই এখন এ অবাধ্যচরণের জন্য চিরস্থায়ী ধ্বংসের উপযুক্ত হয়েছিস এবং এটাই তোর কাজের উপযুক্ত বিনিময়। সুতরাং তুই এই জান্নাত থেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় বের হয়ে যা এবং তোর নিজের ও তোর অনুসারীদের পরিণতি হিসাবে চিরস্থায়ী অভিশাপ ও জাহান্নামের অপেক্ষায় থাক।

পবিত্র কুরআনে এ বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে,

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَکَ اَنْ تَتَکَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّکَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ○

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুই এখান থেকে নেমে যা। এখানে থেকে তুই অহংকার করবি, তা হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যা; তুই নিকৃষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিস। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৩)

ইবলীস যখন দেখলো, বিশ্বপালনকর্তার আদেশ অমান্য করা, গর্ব ও অহংকার করা এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি অন্যায় আদেশদানের দোষ আরোপ করার মতো অপরাধগুলো তাকে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের রহমতের দরবার থেকে বিতাড়িত এবং বেহেশত থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে, তখন সে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে তাওবা-ইসতিগফার করার পরিবর্তে দুঃসাহস দেখিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট এই দাবি জানালো যে, "কিয়ামত পর্যন্ত আমাকে (আমার শয়তানি কার্যক্রম চালানোর জন্য) অবকাশ দান করুন। এই লম্বা সময়টুকুর জন্য আমার আয়ু লম্বা করে দিন।" আল্লাহ তা'আলার হেকমতের চাহিদাও ছিল এটাই। সুতরাং তিনি ইবলীসের দাবি মনযুর করলেন।

এ পর্যায়ে সে আরেকবার নিজের শয়তানি স্বভাব জাহির করে বললো, আপনি যখন আমাকে আপনার দরবার থেকে বিতাড়িতই করে দিলেন তখন যেই আদমের কারণে এই অপমান ও লাঞ্ছনা আমার ভাগ্যে জুটল, আমি তার সন্তানদের পথভ্রষ্ট করবো, তাদের পিছনে, সামনে, আশপাশে তথা চারদিক থেকে তাদের গোমরাহ করবো এবং তাদের অধিকাংশকে আপনার অকৃতজ্ঞ ও নাফরমান বানিয়ে ছাড়বো। অবশ্য আপনার খাঁটি বান্দাদের পথভ্রষ্ট করতে আক্রমণ করেও কাবু করতে পারব না। তারা সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা বললেন, তাতে আমার কোন পরোয়া নেই। আমার সৃষ্টির বিধান, “যেমন কর্ম তেমন ফল” অটল থাকবে। সুতরাং যে যেমন কাজ করবে, সে তেমনই ফল ভোগ করবে। তাই যেই আদম-সন্তান আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তোর রাস্তা অনুসরণ করবে, সে তোরই সাথে জাহান্নামে আযাবের ভাগী হবে। পবিত্র কুরআনে এই বিষয়টি এভাবে বিবৃত হয়েছে,

قَالَ اَنْظِرْنِىْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ○ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ○ قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ○ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ؕ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ○

অর্থঃ শয়তান বললো, আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, ঠিক আছে, তুই অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। সে বললো, যেহেতু আপনি আমাকে গোমরাহ সাব্যস্ত করেছেন, তাই আমি অবশ্যই বনী আদমের জন্য আপনার সরল-সঠিক পথে ওত পেতে বসে থাকবো। তারপর আমি অবশ্যই তাদের কাছে আসব তাদের সামনে, পিছে এবং ডান ও বাম দিক দিয়ে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে শোকরগুযার পাবেন না। আল্লাহ তা'আলা বললেন, এখান থেকে বেরিয়ে যা, লাঞ্ছিত ও অপমান অবস্থায়। তাদের মধ্য থেকে যে-কেউ তোর অনুসরণ করবে, আমি অবশ্যই তোদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবো। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৪-১৮)

ফেরেশতাগণ যখন হযরত আদম 'আলাইহিস সালামের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে তার সামনে সিজদা করলেন আর ইবলীস আত্মগরিমা ও হঠকারিতার দরুন কাফের হয়ে জান্নাত থেকে বেরিয়ে গেল, তখন হযরত আদম 'আলাইহিস সালাম এবং তার সহধর্মিণী হাওয়া 'আলাইহিস সালাম এই নির্দেশপ্রাপ্ত হলেন যে, তোমরা জান্নাতে বসবাস করতে থাকো এবং সেখানকার নিয়ামতসমূহ তৃপ্তিভরে ভোগ করতে থাকো। আর একটি নির্দিষ্ট গাছ সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হলো, এর কাছে-ধারেও যাবে না। অর্থাৎ সেটির ফল খাবে না। কুরআনে কারীমে বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে,

وَقُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَامِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الْظَّالِمِيْنَ ○

অর্থঃ আর আমি বললাম, হে আদম, তুমি ও তোমার বেগম জান্নাতে বসবাস করতে থাকো এবং সেখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাকো। কিন্তু এই গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। তা না হলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। (সূরা বাকারা, আয়াত: ৩৫)

হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম লম্বাসময় যাবত একাকী জীবনযাপন করছিলেন। কিন্তু নিজের জীবনযাপনে এবং সুখ-শান্তিতে একপ্রকার নির্জনতা ও শূন্যতা অনুভব করছিলেন। তাই আল্লাহ তা‘আলা হযরত হাওয়া ‘আলাইহিস সালামকে পয়দা করলেন।

হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম নিজের জীবনসঙ্গিনীকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং অন্তরে শান্তি অনুভব করলেন।

উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিমাস সালামের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে বেহেশতের যেকোনো স্থানে বসবাস করার অনুমতি ছিল এবং যেকোনো বস্তু ব্যবহার ও খাওয়ার অনুমতি ছিল। তবে নির্দিষ্ট একটি গাছ সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, তা ফল খাবে না, এমনকি তার কাছেও যাবে না।

এই পর্যায়ে ইবলীস এর সুযোগ গ্রহণ করলো। নিজের সুরত বদল করে, সে হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিমাস সালামকে এই কুপরামর্শ দিল যে, এই গাছটি “অমর গাছ”। এই গাছের ফল খেলে অত্যন্ত আরাম ও শান্তির সাথে চিরকাল বসবাস করা এবং আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য লাভ করা অবধারিত হয়ে যাবে। তদুপরি সে নানান উপায়ে শপথ করে তাদের অন্তরে এই বিশ্বাস জমিয়ে দিল যে, সে তাদের একান্ত হিতাকাংক্ষী, তাদের শত্রু নয়।

আল্লাহর নামের কসম শুনে হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিমাস সালাম চিন্তাও করতে পারলেন না যে, কেউ আল্লাহর নাম নিয়ে মিথ্যা বলতে পারে। তাই ইবলীসের নসীহত শুনে আদম ‘আলাইহিস সালাম বিষয়টি বেমালুম ভুলে গেলেন। ভুলে গেলেন যে, আল্লাহ এটি করতে নিষেধ করেছিলেন। আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে কোন কাজ করা যাবে না। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি, চিরকাল বেহেশতে থাকা এবং আল্লাহর নৈকট্যে থাকার বাঁধা হয়ে দাঁড়ালো। ফলে তারা সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খেলেন।

সেই ফল খাওয়ার সাথে সাথেই অবধারিত পরিণতি দেখা গেল। তাঁরা দেখতে পেলেন, তাঁরা উভয়েই বস্ত্রহীন এবং বেহেশতী পোশাক থেকে বঞ্চিত। তখন তাড়াতাড়ি আদম ও হাওয়া 'আলাইহিমাস সালাম দুজনেই জান্নাতের গাছের পাতা জড়িয়ে নিজ নিজ আবরণযোগ্য স্থান আবৃত করলেন। বিষয়টি যেন মানবসভ্যতার প্রকাশ ছিল; দেহ আবৃত করার জন্য সর্বপ্রথম তারা দুজন গাছের পাতা ব্যবহার করলেন।

এ পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলার তিরস্কার নাযিল হলো এবং আদম ও হাওয়ার নিকট থেকে কৈফিয়ত তলব করা হলো, নিষেধ সত্ত্বেও নির্দেশ কেন লঙ্ঘন করলে?

আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামের তাওবা

আদম 'আলাইহিস সালাম তো আদমই ছিলেন, আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা আর হাওয়া 'আলাইহিস সালামও তারই মতো আল্লাহর অনুগত বান্দী ছিলেন। সুতরাং তারা শয়তানের মতো বিতর্ক করলেন না বা নিজেদের ভুল অপব্যাখ্যার আবরণে ঢাকতে চেষ্টা করলেন না। বরং অনুতাপ ও লজ্জার সাথে স্বীকার করলেন, ভুল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এর কারণ অবাধ্যতা নয়; বরং মানবিক স্বভাবগত ভুলই এর কারণ। তবু তা ভুলই বটে, তাই তাওবা করে তার অনুশোচনা ও রোনাজারির সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, আয় আল্লাহ, এই মুহূর্তে আপনি আমাদের না ক্ষমা করলে এবং দয়া না করলে, আমাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই ওযর কবুল করলেন এবং তাদের ক্ষমা করে দিলেন।

কিন্তু পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধিত্ব করার সময়, হযরত আদম 'আলাইহিস সালামের এসে গিয়েছিল তাই আল্লাহ তা'আলার হেকমতের চাহিদা অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গেই এই নির্দেশ শুনানো হলো যে, হে আদম, তোমাকে এবং তোমার সন্তানদের এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করতে হবে এবং তোমার শত্রু ইবলীসও তার শত্রুতার যাবতীয় উপকরণ নিয়ে সেখানে অবস্থান করবে। তাই তোমাকে ফেরেশতাসুলভ ও অবাধ্যতামূলক বিপরীত শক্তির মাঝখানে থেকে ঈমান ও সৎকাজের সাথে জীবনযাপন করতে হবে। এমতাবস্থায় তুমি এবং তোমার সন্তানগণ যদি খাঁটি বান্দা ও সত্যিকার ফরমাবরদার বলে সাব্যস্ত হও, তবে তোমার আসল বাসস্থান বেহেশত অনন্তকালের জন্য তোমার ও তোমার সন্তানদের মালিকানায় দিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ তোমরা জান্নাতের অধিকারী হবে।

অতএব, আপাতত তুমি ও তোমার বেগম দুনিয়াতে চলে যাও, আমার যমিনে গিয়ে বসবাস করতে থাকো এবং নিজের নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বন্দেগীর হক আদায় করতে থাক।

তখন মানবজাতির আদি পিতা এবং আল্লাহ তা'আলার খলীফা হযরত আদম 'আলাইহিস সালাম নিজের জীবনসঙ্গিনী হযরত হাওয়া 'আলাইহিস সালামকে সঙ্গে নিয়ে যমিনে আগমন করলেন।

উপরোক্ত ঘটনাবলীর বর্ণনায় মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَيٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ○ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَاوٗرِىَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ○ وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ○ فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَ نَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ اَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ○وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ۚ

অর্থঃ হে আদম, তুমি ও তোমার বেগম জান্নাতে বসবাস করো। অতঃপর সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও। তবে এই গাছের কাছে যেয়ো না। তা না হলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। তারপর শয়তান তাদের উভয়কে প্ররোচিত করলো, যাতে প্রকাশ করে দেয় তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের কাছে গোপন ছিল এবং বললো, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের এই গাছ থেকে শুধু এজন্য নিষেধ করেছেন, যেন তোমরা ফেরেশতা হয়ে না যাও কিংবা অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়ে না যাও। আর সে তাদের উভয়ের কাছে শপথ করে বললো, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী একজন। এভাবে সে তাদের ধোকা দিয়ে বিভ্রান্ত করলো। তারপর যখন তারা সেই গাছের ফল খেলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা নিজেদের উপর বেহেশতের পাতা জড়াতে লাগলেন। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের বললেন, আমি কি তোমাদের এই গাছ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ? তারা উভয়ে বললেন, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমরা নেমে যাও! তোমরা একে অপরের শত্রু । আর পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকার ব্যবস্থা রইল। তিনি বললেন, সেখানেই তোমরা জীবনযাপন করবে, সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের বের করে আনা হবে। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৯-২৫)

হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিমাস সালাম আল্লাহ তা‘আলার দরবারে তাওবা করার পরে আল্লাহ তা‘আলা তাদের তাওবা কবুল করলেন। কুরআন মজীদে তাদের এই তাওবার কথা বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

فَتَلَقّٰىٓ اٰدَمُ مِنْ رَّ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ○

অর্থঃ অতঃপর হযরত আদম তার পালনকর্তার কাছ থেকে কিছু বাণী শিখে নিলেন। তারপর আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা-ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (সূরা বাকারা, আয়াত: ৩৭)

এই আয়াতে শুধু হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের তাওবা কবুল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, হাওয়া ‘আলাইহিস সালাম হুকুমের দিক থেকে আদম ‘আলাইহিস সালামের অধীনস্থ ছিলেন। আর এ কারণেই কুরআন ও সুন্নাহর অধিকাংশ স্থানে নারীদের কথা সরাসরিভাবে উল্লেখ করা হয়নি। (বরং পুরুষদের কথা উল্লেখের মধ্যে অধীন হিসাবে নারীদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে)। (তাফসীরে মাযহারী- ১ম খণ্ড)

আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ঘোষণার পরেও হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার দরবারে কী পরিমাণ অনুতপ্ত ছিলেন, নিম্নবর্ণিত রেওয়ায়াতটি দিয়ে তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিমাস সালাম দুইশত বছর কান্না করেন এবং চল্লিশদিন পর্যন্ত কোন কিছু না খেয়ে অনুশোচনা করতে থাকেন। তেমনিভাবে হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম অনুশোচনাগ্রস্ত হয়ে একশত বছর পর্যন্ত হাওয়া ‘আলাইহিস সালামের নিকটেও আসেননি।

হযরত শাহর ইবনে হাউশাব রহ. বলেন, আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয়ে তিনশত বছর পর্যন্ত মাথা ওঠাননি।

……………………

হজরত জাকারিয়া (আলাইহিস সালাম)

দীন প্রচারে আল্লাহর নিকট সন্তান কামনা

হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম স্বগোত্রীয়দের ব্যাপারে শঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি ভয় পেয়েছিলেন, তার মৃত্যুর পর তারা পাপ-পংকিলতায় জড়িয়ে পড়বে। ফলে আল্লাহর কাছে সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা করলেন, যেন তার ওফাতের পর সেই সন্তান নবী হয়ে নবুওয়্যাতের মাধ্যমে তাদের পরিচালিত করতে পারেন। আল্লাহ তা‘আলা তার মনের বাসনা পূরণ করলেন।

যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম এজন্য শঙ্কা করেননি যে, তার মৃত্যুর পর তারা তার ত্যাজ্য সম্পদের মালিক হয়ে যাবে। কারণ, প্রথমতঃ নবীগণের সম্পদে কোন ওয়ারিস নাই। তারা যা রেখে যান, তা সদকারূপে গণ্য হয়। এ প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমরা নবীগণ যা-কিছু রেখে যাই, তার কোন উত্তরাধিকারী হয় না। বরং তা সদকার মধ্যে গণ্য হয়। (বুখারী, ফরযুল খুমুস অধ্যায়)

দ্বিতীয়তঃ নবীগণ এ ধরনের পার্থিব ব্যাপার হতে অনেক উর্ধ্বে যে, তারা সম্পদের ভালোবাসায় এতটা মোহগ্রস্ত থাকবেন যে, নিজের মৃত্যুর পর স্বগোত্রীয় লোকদের দ্বারা তাঁর সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়াকে পরশ্রীকাতরতার চোখে দেখবেন এবং সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা করবেন, যাতে সে তার রেখে যাওয়া সম্পদের মালিক হয়। তা ছাড়া স্বাভাবিকভাবেও তাঁর এ পরিমাণ সম্পদ ছিলনা, যে সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য তাঁর গোত্রের লোকেরা লালসা করবেন। কারণ, তিনি নিজ হাতে কাঠের কাজ করে জীবিকানির্বাহ করতেন। এ কাজ করে কতটুকুই বা সম্পদ জমা করা যায়!

সুতরাং আয়াতে বর্ণিত উত্তরাধিকারী হওয়ার অর্থ হবে, তার মৃত্যুর পর নবুওয়্যাতের ক্ষেত্রে তাঁর উত্তরাধিকারী হওয়া। পরবর্তী বাক্য “এবং ইয়াকুব বংশধরের উত্তরাধিকারী হবে” এ কথাটিও উপর্যুক্ত অর্থেরই সমর্থন করে। নবীদের উত্তরাধিকারী হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُوْدَ

অর্থঃ সুলাইমান 'আলাইহিস সালাম দাউদ 'আলাইহিস সালামের উত্তরাধিকারী হলেন।

অর্থাৎ নবুওয়্যাতের ক্ষেত্রে তার স্থলাভিষিক্ত হলেন। অন্যথায় যদি এখানে সম্পদের উত্তরাধিকারের কথা বলা হত, তবে তাঁর ভাইদের বাদ দিয়ে বিশেষভাবে শুধু তাঁর কথা উল্লেখ করা হত না। কারণ, সব ধর্ম ও শরী'আতের স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হল, স্বাভাবিকভাবেই সন্তান তার বাবার সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়। আলোচ্য আয়াতে যেহেতু নবুওয়্যাত প্রাপ্তির বিশেষ উত্তরাধিকারের কথা বুঝানো হয়েছে, সেজন্যই এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। মুজাহিদ রহ. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাঁর উত্তরাধিকার ছিল ইলমকেন্দ্রিক। তেমনি কাতাদা রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের উপর দয়া করুন, তাঁর মাল-সম্পদের কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। (তাফসীরে আব্দুর রাযযাক; ২: ৫/১৭৩৪)।

বৃদ্ধ বয়সে সন্তান কামনা

আল্লাহ তায়ালা জাকারিয়া আলাইহিস সালামের ঘটনা রাসুল (সা) কে জানিয়েছেন এবং মানুষের নিকট বর্ণনা করার নির্দেশ দিয়েছে।জাকারিয়া আলাইহিস সালাম এর স্ত্রী যৌবন কাল থেকেই বন্ধ্যা ছিলো। আল্লাহ যখন তাদেরকে পুত্র সন্তান দান করলো তখন তিনি ছিলেন বৃদ্ধ। আর এখন বার্ধক্যে আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এসব প্রতিকুল অবস্থা বিদ্যমান থাকার সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর রহমতবও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়নি। চুপিসারে আল্লাহকে ডেকেছেন।
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন -

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا,إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا

অর্থঃএটা আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তারঁ বান্দা জাকারিয়ার প্রতি। যখন সে তারঁ পালনকর্তাকে আহবান করেছিলো নিভৃতে।(সুরা মারইয়াম,আয়াত:২-৩)
কাতাদা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ স্বচ্ছ অন্তর ও ক্ষীণ আওয়াজ সম্পর্কে সম্যক অবহিত। কোনো কোন প্রাচীন আলিম বলেছেন, হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম রাত্রিবেলা নিদ্রা থেকে উঠে চুপিসারে যাতে তারঁ কাছের কেউ শুনতে না পায় আল্লাহকে আহ্বান করে বলেন, হে আমার রব, হে আমার রব, হে আমার রব।আল্লাহ তাআলা আহ্বানে সাড়া দিয়ে বললেন, লাব্বায়িক, লাব্বায়িক,লাব্বায়িক এরপর জাকারিয়া আলাইহিস সালাম বলেন
প্রভু আমার অস্থি দুর্বল হয়ে পরেছে বয়সের দেহ ভরাবনত হয়ে গিয়েছে। إِنِّي وَهَنَالْعَظْمُ مِنِّى وَاشْتَعَلَ
وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا
বার্ধক্যে মস্তক শুভ্র হয়েছে।অগ্নি শেখা যেমন কাষ্ঠ খন্ড গ্রাস করে, তেমন বার্ধক্য আমার কালো চুল গ্রাস করে নিয়েছে।হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম আল্লাহকে জানালেন, বার্ধ্যক্যের দুর্বলতা বাহ্যিকভাবে ও অব্যন্তরীনভাবে তাকে গ্রাস করে ফেলেছে وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَاءِكَ رَبِّ شَقِيًّا"হে

আমার পালনকর্তা! আপনাকে ডেকে আমি কখনো বিফল হইনি। অর্থাৎ, আমি এর পূর্বে আপনার নিকট যা চেয়েছি, আপনি তা আমাকে দিয়েছেন।

সন্তান কামনার প্রেরণাঃ

হজরত জাকারিয়া সন্তান কামনার পূর্বে যে প্রেরণাটি কাজ করেছিলো, তা হলো, তিনি মারিয়াম বিনতে ইমরান ইবনু মাসানকে বায়তুল মুকাদ্দাসে দেখাশুনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বায়তুল মুকাদ্দাসের যে কক্ষে মারইয়ম থাকতেন, সে কক্ষে জাকারিয়া আলাইহিস সালাম যখনই যেতেন দেখতেন,ভিন্ন মৌসুমের পর্যাপ্ত ফল মারইয়ামের পাশে মওজুদ রয়েছে। বস্তুত এটা ছিলো আওলিয়াদের কারামতেন একটি নিদর্শন।

তা দেখে হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম অন্তরে এ কথা উদয় হলো, যে সত্তা মারইয়ামকে ভিন্ন মৌসুমের ফল দান করেছেন,তিনি আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দান করতে পারেন।
﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ
সেখানে যাকারিয়্যা তার রবের কাছে প্রার্থনা করেছিল, সে বলল, ‘হে আমার রব, আমাকে আপনার পক্ষ থেকে উত্তম সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী’। (আলে-ইমরান-৩৮)

……………………………

হযরত ইয়াহিয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের দু‘আর ফসলরূপে হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালাম ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জন্মের কিছুদিন পূর্বে বর্তমান ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন। তখন যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের বয়স হয়েছিল ১২০ বছর।

ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালাম ২৮ খ্রিস্টাব্দে নবুওয়্যাত লাভ করেন। আর ৩১ খ্রিস্টাব্দে দামেশক শহরে ইহুদীদের হাতে শহীদ হন।

পবিত্র কুরআনের চারটি সূরায় মোট পাঁচবার ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের আলোচনা এসেছে। সূরা মারিয়ামে আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন,

يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَ اٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا○ وَّ حَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ؕ وَكَانَ تَقِيًّا○ وَّ بَرًّۢا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا○ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوْتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا○

অর্থঃ হে ইয়াহইয়া, কিতাবটি দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করুন। আমি তাঁকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান এবং আমার নিকট হতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা। তিনি ছিলেন মুত্তাকী, পিতা-মাতার অনুগত এবং তিনি ছিলেন না উদ্ধত ও অবাধ্য। তার প্রতি শান্তি, যেদিন তিনি জন্ম লাভ করেছেন, যেদিন তার মৃত্যু হবে এবং যেদিন তিনি জীবিত অবস্থায় উত্থিত হবেন। (সূরা মারয়াম; আয়াত: ১২-১৫)

আল্লাহ তা‘আলা শৈশবেই তাকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং তাওরাত কিতাব ও শরী‘আতের জ্ঞানের অধিকারী করেছিলেন। সাথে সাথে দান করেছিলেন ভালো কাজের রীতি-নীতি সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وآتيناه الحكم صبيا

অর্থ: আর আমি তাকে শৈশবেই জ্ঞানবত্তা দান করেছিলাম।

উল্লেখ্য, ‘‘শৈশবেই জ্ঞানবত্তা’’ দানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেউ কেউ মনে করে থাকেন যে, ইয়াহইয়া আ. কে শৈশবেই নবুওয়্যাত দান করা হয়েছিল। এ ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। হাফেয ইবনে কাসীর রহ. এখানে ‘জ্ঞানবত্তা’র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন,

أتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا أي :الفهم والعلم والجد والعزم، والإقبال على الخير، والإكباب عليه، والاجتهاد فيه وهو صغير حدث]السن[

অর্থ: আয়াতে ‘জ্ঞানবত্তা’ দ্বারা (নবুওয়্যাত উদ্দেশ্য নয়; বরং) উদ্দেশ্য হল, (সাধারণ) প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বুঝ ও ভালো কাজের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি, যা আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে শৈশবেই দান করেছিলেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর; সূরা মারয়াম; ১২)

মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবী রহ. তার (কাসাসুল কুরআন ২/৬২২) গ্রন্থে ‘জ্ঞানবত্তা’ দ্বারা ‘নবুওয়্যাত’ উদ্দেশ্য না হওয়ার কথা জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছেন।

মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় হযরত ইয়াহইয়া আ. কর্তৃক আল্লাহর নির্দেশে বনী ইসরাইলকে বাইতুল মুকাদ্দাসে সমবেত করে দাওয়াত প্রদান করার আলোচনা এসেছে। (হাদীস নং- ১৭১৭০)

আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের উত্তম গুণাবলী আলোচনা করার পর বলেন, তাঁর প্রতি শান্তি, যেদিন তিনি জন্মলাভ করেছেন, যেদিন তাঁর মৃত্যু হবে এবং যেদিন তিনি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবেন। এ প্রসঙ্গে সুফিয়ান বিন উওয়াইনা রহ. বলেন, তিন ক্ষেত্রে মানুষ সবচেয়ে বেশি নিঃসঙ্গতা অনুভব করে।

১. যেদিন সে ভূমিষ্ঠ হয়। এ সময়ে সে নতুন পৃথিবীতে এসে একাকিত্ব অনুভব করে।

২. যেদিন তার মৃত্যু হয়, সেদিন সে এমন কিছু লোককে দেখে, যাদের সে জীবনে কোনদিন দেখেনি।

৩. যেদিন সে পুনরুত্থিত হবে, সেদিন সে অসংখ্য মানুষের সমাবেশে নিজেকে দেখে একাকিত্ববোধ করবে।

আল্লাহ তা'আলা এ সকল দিনে ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামের প্রতি অনুগ্রহ করার ঘোষণা দিয়েছেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর; ৫/২২৪-২)

ইয়াহইয়া আলাইহিস সালম এর বৈশিষ্ট্য ঃ
১. আমি তাকে দিয়েছিলাম আমার পক্ষ থেকে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা ;সে ছিলো মুত্তাকি।
২.সে ছিলো মাতা পিতার অনুগত। আর সে উদ্ধত ওঅবাধ্য ছিলো না। (সুরা মারিয়াম আয়াত ১৩-১৪)। তাফসির : শৈশবে ইয়াহইয়া (আ.)-এর বিশেষ জ্ঞান লাভের বিষয়টি আগের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।
এটি ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটিসহ পবিত্র কোরআনে ইয়াহইয়া (আ.)-এর অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য দুই আয়াতে বর্ণিত তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো হলো, তাঁকে বিশেষভাবে দান করা হয়েছে কোমলতা; তিনি ছিলেন পূত-পবিত্র; তিনি ছিলেন অতীব পরহেজগার। তিনি ছিলেন মাতা-পিতার অনুগত।

তিনি উদ্ধত ও অবাধ্য ছিলেন না।
ইয়াহইয়া (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি সম্পর্কে অন্য আয়াতে এসেছে, 'অতঃপর যখন সে [জাকারিয়া (আ.)] কামরায় নামাজরত অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল, তখন ফেরেশতারা তাকে ডেকে বলল, আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়া সম্পর্কে। যে সাক্ষ্য দেবে আল্লাহর নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে; যে নেতা হবে এবং যে নারীসঙ্গমুক্ত হবে আর যে সৎকর্মশীল নবী হবে।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ৩৯)

এ আয়াত থেকে জানা যায়, ইয়াহইয়া (আ.) ছিলেন আল্লাহর বাণীর সমর্থক, তিনি ছিলেন নেতা, তিনি স্ত্রীহীন ছিলেন আর তিনি ছিলেন একজন পুণ্যবান নবী।

বিবাহ না করেও তিনি সব ধরনের পাপাচার থেকে মুক্ত ছিলেন। ছিলেন পূত-পবিত্র জীবনের অধিকারী। তিনি ছিলেন নিষ্পাপ।
এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার যে মহান আল্লাহর অসংখ্য নবী-রাসুলের মধ্যে ইয়াহইয়া (আ.)-এর এই বিশেষত্ব ছিল যে তিনি বিবাহ করেননি। তার অর্থ এই নয় যে বিবাহ না করা নবীদের সুন্নত।

বরং বিবাহ করাই নবীদের সুন্নত। সব নবী বিবাহ করেছেন। এ বিষয়ে অন্য আয়াতে এসেছে, 'তোমার আগে আমি তো অনেক রাসুল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি

দিয়েছিলাম...।' (সুরা : রাদ, আয়াত : ৩৮) সুতরাং কুপ্রবৃত্তি দমনে নবী-রাসুলদের এই আদর্শের অনুসরণের বিকল্প নেই।
মহান আল্লাহ মানুষকে সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।
....

হযরত শু'আইব (আলাইহিস সালাম)

হযরত শু'আইব আ. এর কওমের গুনাহ ও অপরাধ

হযরত শু'আইব আ. এর কওম বিভিন্ন ধরণের গুনাহ এবং অপরাধে লিপ্ত ছিলো। যথাঃ

• তারা আল্লাহার ইবাদত করার পরিবর্তে নিজেদের মূর্তিপূজক পূর্বপুরুষদের অনুসরণে মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিলো।

• তারা অন্যকে লেনদেনের সময় মাপে কম দিতো।

• তারা পথিকদের পথ আটকে ডাকাতি করতো।
আপন কওমকে শু'আইব আ. এর দাওয়াত

হযরত শু'আইব আ. আপন কওমকে বিজ্ঞোচিত ভাষায় দাওয়াত প্রদান করেন। হযরত শু'আইব আ. তার কওমকে লক্ষ্য করে বলেন,

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ○ وَ لَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَ اذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۪ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ○

অর্থঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো! তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো মাবুদ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। সুতরাং মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে ও মানুষের মালিকানাধীন বস্তুসমূহে তাদের অধিকার খর্ব করবে না। আর দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর অশান্তি বিস্তার করবে না। এটাই তোমাদের পক্ষে

কল্যাণকর পথ, যদি তোমরা (আমার কথা) মেনে নাও। মানুষকে ধমকানোর জন্য এবং যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দান ও তাতে বক্রতা সন্ধানের উদ্দেশ্যে পথে-ঘাটে বসে থাকবে না। এবং তোমরা স্মরণ করো ঐ সময়কে যখন তোমরা সংখ্যায় নগন্য ছিলে, আল্লাহ তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন, এবং তোমরা লক্ষ করো বিশৃংখলাকারীদের পরিনাম কি হয়েছে। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৮৫-৮৬)

শু'আইব আ. এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান

কিন্তু দুঃখজনক হলো যে, হযরত শু'আইব আ. এর কওম তাঁর এ দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করলো। তাদের দাম্ভিক সর্দারগণ বললো,

لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ

অর্থঃ হে শু'আইব! আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব, তা না হলে তোমাদের সবাইকে আমাদের দীনে ফিরে আসতে হবে। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৮৮)

তারা হযরত শু'আইব আ. এর দাওয়াতকে কেবল প্রত্যাখ্যানই করলো না; বরং সাথে সাথে উপহাস করে বললো,

يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُاؕ

অর্থঃ হে শু'আইব! তোমার নামায কি তোমাকে এই আদেশ করছে যে, আমাদের বাপ-দাদাগণ যাদের ইবাদত করতো, আমরা তাদেরকে পরিত্যাগ করবো এবং নিজেদের অর্থসম্পদে যা ইচ্ছা হয় তা করবো? (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৮৭)

অবাধ্য সম্প্রদায় এখানেই থেমে থাকেনি; বরং তারা একধাপ আগে বেড়ে আগের চেয়ে বেশী ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বললো,

فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

অর্থঃ (হে শু'আইব!) তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের উপর আকাশের একটি খন্ড ফেলে দাও। (সূরা শুআরা, আয়াত: ১৮৭)

এমনকি এই হঠকারী সম্প্রদায় হযরত শু‘আইব আ.কে হত্যার হুমকি পর্যন্ত দিয়ে বললো,

يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَ لَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۫ وَ مَاۤ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ○

অর্থঃ হে শু‘আইব! তোমার অনেক কথাই আমাদের বুঝেই আসে না। আমরা দেখছি, আমাদের মধ্যে তুমি একজন দুর্বল লোক। তোমার খান্দান না থাকলে আমরা তোমাকে পাথর মেরে ধ্বংস করতাম। আমাদের বিপরীতে তুমি মোটেও শক্তিমান নও। (সূরা হুদ)

যেভাবে আযাব এলো

হযরত শু‘আইব আ.এর কওমের এই প্রত্যাখ্যান,উপহাস এবং নবীকে হত্যার মনোভাবের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর তিন ধরণের আযাব প্রেরণ করেন। ভূমিকম্প, বিকট আওয়াজ এবং মেঘাচ্ছন্ন দিবসের মেঘ থেকে আগুনবৃষ্টি।

আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে কারীমে তিন স্থানে হযরত শু‘আইব আ.এর কওমের উপর আপতিত আযাবের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ○

অর্থঃ অতঃপর তারা ভূমিকম্পে আক্রান্ত হলো এবং তারা নিজেদের বাড়িতে অধঃমুখে পড়ে থাকলো। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৯১)

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ○ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ○

অর্থঃ এবং (পরিশেষে) যখন আমার হুকুম এসে গেলো, আমি শু‘আইবকে এবং যারা তার সাথে ঈমান এনেছিলো তাদেরকে আমার বিশেষ রহমতে রক্ষা করি আর যারা জুলুম করেছিলো তাদেরকে এক প্রচন্ড আযাব এসে পাকড়াও করলো। ফলে তারা নিজেদের ঘর-বাড়িতে এমনভাবে অধঃমুখে থাকলো, যেন তারা কখনও সেখানে বসবাসই করেনি। স্মরণ রেখ,

মাদয়ানেরও সেইভাবে বিনাশ ঘটলো, যেভাবে বিনাশ হয়েছিলো সামুদ জাতি। (সূরা হুদ, আয়াত: ৯৪)

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ○

অর্থঃ মোটকথা,তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো। পরিণামে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি তাদেরকে আক্রান্ত করলো। নিশ্চয় তা ছিলো এক ভয়ানক শাস্তি। (সূরা শুআরা, আয়াত: ১৮৯)

মুফাসসিরীনে কেরাম এ আয়াতত্রয়ের এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, একটি মেঘখন্ড তাদেরকে ছায়া প্রদান করলে তারা তার আশ্রয়ে গমণ করে। কিন্তু মেঘখন্ড থেকে পানি বৃষ্টি হওয়ার পরিবর্তে আগুনবৃষ্টি হতে লাগলো এবং সাথে সাথে প্রচন্ড এক আওয়াজে তারা সবাই মূহুর্তেই ধ্বংস হয়ে গেলো। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৩:৪৯২)

....

হযরত নূহ (আলাইহিস সালাম)

যেভাবে মূর্তিপূজার সূচনা হলো

হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের কওমের মূর্তিপূজার সূচনার ঘটনা হলো, তারা পরস্পরে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিল যে, আমরা আমাদের দেব-দেবী, বিশেষত নিম্নোক্ত এই পাঁচ প্রতিমার উপাসনা ত্যাগ করবো না। ১. ওয়াদ্দ (وَدٌّ)। ২. সুওয়া (سُوَاعٌ)। ৩. ইয়াগুস (يَغُوْثُ)। ৪. ইয়াউক (يَعُوْقُ)। ৫. নাসর (نَسْرٌ)।

ইমাম বাগাবী রহ. বর্ণনা করেন, এই পাঁচজন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা‘আলার নেক ও খাস বান্দা ছিলেন। তাদের সময়কাল ছিল হযরত আদম ও হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের যমানার মাঝামাঝি। তাদের অনেক ভক্ত ও অনুসারী ছিল। তাদের ইন্তেকালের পর তাদের অনুসারীরা লম্বা সময় পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত ও হুকুম-আহকামের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে।

অতঃপর এক সময় শয়তান তাদের এই বলে প্ররোচিত করলো, তোমরা যেসব নেক বান্দার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইবাদত করো, যদি তাদের মূর্তি তৈরি করে সামনে রেখে নিতে পারো,

তা হলে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। তারা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে মূর্তি তৈরি করে ইবাদতখানা তৈরী করলো এবং তাদেরকে স্মরণ করে ইবাদতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করতে লাগল।

এই অবস্থায়ই তাদের সবাই দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো। তারা অবশ্য ঐসব মূর্তি বা প্রতিমার কখনোই পূজা করতো না। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের জায়গায় এলো। তারা এগুলোর হাকিকত জানতো না।

এবার শয়তান এসে এই নতুন প্রজন্মকে বুঝাল, তোমাদের পূর্বপুরুষদের খোদা ও উপাস্য ছিল মূর্তি ও প্রতিমা। তারা দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবীর লক্ষ্যে এসব মূর্তি ও প্রতিমারই উপাসনা করতো। তখন নতুন প্রজন্ম শয়তানের এসব কথা বিশ্বাস করলো এবং সেসব মূর্তি ও প্রতিমার পূজা শুরু করলো। তখন থেকেই পৃথিবীতে প্রতিমা পূজার সূচনা ঘটল।

নূহ আলাইহিস সালাম এর প্লাবনের ঘটনা

নূহ আ.সময় যে প্লাবন হয়েছিলো তা সমগ্র পৃথিবীর উপর হয় নি। বরং নির্দিষ্ট জাতীর উপর এবং নিদিষ্ট অঞ্চল উপর এসেছিলো।এর আয়াতন ১ লক্ষ ৪০ হাজার বর্গ কিলোমিটার। সেই সময় মানুষের বসতি খুব কম ছিলো এবং তা ছিলো সেই অঞ্চলেই।সেখানে হযরত নুহ আলাই সালাম এবং তাঁর কওম বাস করতো।এর বাইরে কোথাও কোন বসতি ছিল না। সুতরাং এই অঞ্চলটি আজাবের উপযোগী ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সাথে এই আযাবের বা প্লাবনের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই প্লাবনে নূহ আ. এবং তার অনুসারী ছাড়া সকলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

হজরত নুহ (আ.) প্রাচীন নবীদের একজন। কোরআনে হজরত নুহ (আ.)–এর আলোচনা ৪২ জায়গায় এসেছে। মানবজাতিকে এক আল্লাহর আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘তোমরা শুধু এক আল্লাহর ইবাদত করো এবং আমার কথা মানো। আল্লাহ তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।’

আল্লাহ নুহ (আ.)–কে জানিয়ে দিলেন, তোমার জাতির যেসব লোক ইমান এনেছে, তাদের ছাড়া অন্য কেউ আর ইমান আনবে না। এ নিয়ে তুমি কোনো দুঃখ কোরো না। তুমি একটি নৌকা বানাও।

হজরত নুহ (আ.) আল্লাহর আদেশ মেনে একটি বিরাট নৌকা বানাতে শুরু করেন।

হজরত আদম (আ.)-এর সন্তানেরা ধীরে ধীরে আল্লাহর কথা ভুলে গিয়েছিলো। যে মহান আল্লাহ তাদের সৃষ্টি ও প্রতিপালন করেছেন, তাঁর স্মরণ থেকে তারা বিমুখ হতে লাগল। শয়তানের প্ররোচনায় তারা পৌত্তলিক হয়ে উঠতে শুরু করল। এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে কল্পিত দেব-দেবীর উপাসনা করতে লাগল। আল্লাহ অপরিসীম দয়ালু। তাই তিনি মানবজাতির কল্যাণের জন্য হজরত নুহ (আ.)-কে নবী বানিয়ে প্রেরণ করেছিলেন।

কিন্তু লোকেরা হজরত নুহ (আ.)-এর কথায় কর্ণপাত করল না। কিন্তু তিনি মনোবল না হারিয়ে তাদের বোঝাতে লাগলেন, 'আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, নিশ্চয় তিনি বড় ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের ওপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ফলে তোমরা ফসল উৎপন্ন করতে পারো। আর সে ফসল দিয়ে তোমরা বড় বড় বাগান সাজাতে পারো। আল্লাহ পানি দিয়ে তোমাদের পৃথিবীতে নদ-নদী তৈরি করে দিয়েছেন। তিনিই তোমাদের সন্তানসন্ততি এবং ধনসম্পদ দান করেন। তোমাদের কী হলো যে তোমরা সে আল্লাহকেই মানছ না! অথচ তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং অবশেষে একদিন তোমরা এ মাটিতেই মিশে যাবে। কিয়ামতের দিন এই মাটি থেকেই তিনি পুনরায় তোমাদেরকে ওঠাবেন। সুতরাং হে লোকেরা! তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো।'

এ কথা শুনে তারা বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে। আমাদের সঙ্গে অনেক ঝগড়া করেছ। যদি তুমি তোমার কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে আনো দেখি সেই আজাব, যার ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছ!'

নুহ (আ.) বললেন, 'আল্লাহ যখন চাইবেন আজাব কেবল তখনই আসবে।'

তাঁর স্বজাতির নেতারা নৌকা বানাতে দেখে তাঁকে ঠাট্টা-তামাশা করত। তিনি বলতেন, যখন আল্লাহর প্রতিশ্রুত আজাব আসবে, তখন টের পাবে।

অবশেষে আল্লাহর প্রতিশ্রুত আজাব শুরু হলো। মাটি ফেটে পানি বেরোতে লাগল। আকাশ থেকে নামল ভারী বর্ষণ। আল্লাহ হজরত নুহ (আ.)-কে বললেন সব প্রাণীকে নারী-পুরুষ জোড়ায় জোড়ায় নৌকায় উঠিয়ে নিতে। যারা বিশ্বাসী, হজরত নুহ (আ.) তাদের বললেন, আল্লাহর নাম নিয়ে তোমরা নৌকায় চড়ে বসো।

নৌকা তাদের নিয়ে ভাসতে লাগল।

হজরত নুহ (আ.) তাঁর সন্তানকে বললেন, 'আমাদের সঙ্গে নৌকায় চড়ে বসো। অবিশ্বাসীদের সঙ্গে থেকো না।'

ছেলে দম্ভভরে বলল, 'আমি কোনো পাহাড়ে উঠে পড়ব, তখন এই পানি থেকে মুক্তি পেয়ে যাব।'

হজরত নুহ (আ.) বললেন, 'আল্লাহর আজাব থেকে তিনি ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারবেন না।'

তার ছেলে পানিতে ডুবে গেল!

অনেক দিন পর পানির বর্ষণ বন্ধ হলো। হজরত নুহ (আ.)–এর নৌকা জুদি পর্বতে গিয়ে ঠেকল। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ, আমার ছেলেও আমার পরিবারের সদস্য। আর আপনার ওয়াদা নিশ্চয় সত্য। আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমার পরিবারকে বাঁচিয়ে দেবেন, তাহলে আমার ছেলে কেন ডুবে মরল!'

আল্লাহ বললেন, 'তোমার ছেলে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। কেননা তার কাজ ভালো ছিল না। আর এমন ব্যাপারে আমার কাছে আবেদন কোরো না, যে ব্যাপারে তোমার জানা নেই।'

নুহ (আ.) জানতেন না যে তাঁর ছেলে কেনান অবিশ্বাসী ছিল। হজরত নুহ (আ.) আল্লাহর কাছে অনুশোচনা করে তাওবা করলেন। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন।

এরপর নুহ (আ.)–এর উম্মত দুনিয়ায় বসবাস করতে লাগল। ধীরে ধীরে তাদের সন্তানসন্ততি বৃদ্ধি পেতে লাগল। তারা সবাই আল্লাহর আনুগত্য করে চলল।

নূহ আলাইহিস সালামের রোজা

হজরত নূহ (আ.)-এর ব্যাপারে কেউ কেউ বলেছেন, তিনি দুই ঈদের দিন ছাড়া সর্বদা রোজা রাখতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসুলকে (সা.) বলতে শুনেছি, 'নূহ (আ.) ঈদুল ফিতরের দিন ও ঈদুল আজহার দিন ছাড়া সারা বছর রোজা রাখতেন।' (ইবনে মাজাহ : হাদিস ১৭১৪)

ইমাম তাবারি (রহ.) কাতাদাহ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, মুহাররমের ১০ তারিখ নূহ (আ.) তার তরণী থেকে নামেন। অনুসারীদের লক্ষ করে তিনি বলেন, আজ যে রোজা রেখেছো তা পূর্ণ কর, আর যে রাখনি সে রোজার নিয়ত করে নাও (তাবারি)। হজরত মুয়ায বিন জাবাল ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও দাহহাক প্রমুখ তাফসিরকারকদের থেকে আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) বর্ণনা করেন, ইসলামে প্রাথমিক পর্যায়ে রোজা ছিল, যেভাবে অন্যান্য জাতি পালন করত। আর তা ছিল প্রত্যেক মাসে তিন দিন। নূহ (আ.)-এর যুগ থেকে শুরু হয়। আর রমজানের ৩০ রোজা ফরজ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বহাল ছিল (ইবনে কাসির)।

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম এর দোয়া

তখন হজরত নুহ আলাইসি সালাম নিম্নোক্ত দোয়া করেন যে, অসাবধানতায় যেন তিনি আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত না হন। যার দৃষ্টান্ত সমগ্র জাতির জন্য আল্লাহ কুরআনে নিয়ে এসেছেন। সমগ্র মুসলিম উম্মাহর এ আয়াতটি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থণার অন্যতম মাধ্যম।
আল্লাহ বলেন-

رَبِّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ وَ إِلَّا تَغْفِرْلِيْ وَ تَرْحَمْنِيْ أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

উচ্চারণ : রাব্বি ইন্নি আ`উজুবিকা আন আসআলাকা মা লাইসা লি বিহি ইলমুও ওয়া ইল্লা তাগফিরলি ওয়া তারহামনি আকুম মিনাল খাসিরিন।

অর্থ : হে আমার পালনকর্তা আমার যা জানা নেই এমন কোনো দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব। (সুরা হূদ : আয়াত ৪৭)
হে আল্লাহ! আমাদেরকে অজানা ও অজ্ঞতা থেকে হিফাজত করুন। আপনার শিখানো ভাষায় আপনার কাছে যাবতীয় অজানা বিষয় থেকে হিফাজত থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।।

হযরত হুদ আলাইহিস সালাম

হুদ ‘আলাইহিস সালামের আহ্বান

হুদ ‘আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়ে তাওহীদের অনুসরণ করতে এবং অত্যাচার-উৎপীড়ন ছেড়ে দিয়ে ন্যায় ও সুবিচারের পথে চলতে দাওয়াত দিলেন।

হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালাম যে দীনী দাওয়াত পেশ করেন, তার মধ্যে তিনটি মূল বিষয় ছিল। প্রথমতঃ তাওহীদের আহ্বান এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যকোনো সত্তা বা শক্তিকে ইবাদত-উপাসনার যোগ্য মনে করা বাতুলতামাত্র। দ্বিতীয়তঃ আমি যে তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছি এবং যেজন্য জীবন উৎসর্গ করেছি, তোমরা চিন্তা করে দেখ, আমি এমন কষ্ট-ক্লেশের পথ কোন্ স্বার্থে অবলম্বন করেছি? আমি তো এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার বস্তুগত কোন ফায়দা বা স্বার্থও হাসিল হচ্ছে না। এটা যদি আল্লাহর নির্দেশ এবং আমার দায়িত্ব না হতো, তা হলে তোমাদের দাওয়াত দিতে এবং সংশোধন করতে গিয়ে এত কষ্ট-ক্লেশ বরণ করার কী প্রয়োজন ছিল? তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, নিজেদের অতীত জীবনে কুফরী, শিরকী ইত্যাদি যত গুনাহ করেছ, সেসব থেকে আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করো এবং ভবিষ্যতের জন্য ঐ সব গুনাহ থেকে তাওবা করো। নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে,

اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْا اِلَيْهِ

অর্থঃ হে আমার কওম, তোমাদের পালনকর্তার কাছে তোমরা ক্ষমাপ্রার্থনা করো, অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ করো।

হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালাম তাদের আশ্বাস বাণী শুনিয়ে বললেন, যদি তোমরা এরূপ সত্যিকার তাওবা ও ইসতিগফার করতে পারো, (তবে তার বদৌলতে পরকালের চিরস্থায়ী সাফল্য ও সুখময় জীবন তো লাভ করবেই), অধিকন্তু দুনিয়াতেও এর বহু উপকারিতা দেখতে পাবে।

দীনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান

হুদ ‘আলাইহিস সালামের আহ্বানের জবাবে তার দেশবাসী মূর্খসুলভ উত্তর দিল, যা নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِىْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ

অর্থঃ তারা বললো, হে হুদ, তুমি আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নিয়ে আসনি। আমরা তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের পূজা-অর্চনা বর্জন করতে পারি না। আর আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীও নই।

তারা আরো বললো, আমরা মনে করি, আমাদের দেবতাদের নিন্দাবাদ করার কারণে তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। তাই তুমি এমন অসংলগ্ন কথা বলছো।

হযরত হুদ ‘আলাইহিস সালাম পয়গামবরসুলভ নির্ভীক কণ্ঠে যে জবাব দেন, সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বিবরণ হচ্ছে,

○ اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ؕ قَالَ اِنِّىْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ
مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ○ اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَ رَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا
○هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

অর্থঃ হুদ ‘আলাইহিস সালাম বললেন, (তোমরা যদি আমার কথা না মানো, তবে শোনো) আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি আর তোমরাও সাক্ষী থাকো যে, (এক আল্লাহ ছাড়া) তোমাদের সব কাল্পনিক দেবতাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এখন আল্লাহ ছাড়া তোমরা (ও তোমাদের দেবতা) সবাই মিলে আমার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করো, এক্ষেত্রে আমাকে বিন্দুমাত্র অবকাশ দিও না। (এত বড় কথা আমি এজন্য বলছি যে,) আমি আল্লাহ তা‘আলার উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখি, যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই, যা তার পূর্ণ আওতাধীন নয়। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা সরল সঠিক পথে রয়েছেন। (সূরা হুদ, আয়াত: ৫৪-৫৬)

অর্থাৎ যে সরল সঠিক পথে চলবে, সে আল্লাহকে পাবে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে সাহায্য করবেন।

সমগ্র জাতির মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে এমন নির্ভীক ঘোষণা ও তাদের দীর্ঘদিনের লালিত ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় আঘাত হানা সত্ত্বেও এত বড় সাহসী ও শক্তিশালী জাতির মধ্যে কেউ তার একটি

লোমও স্পর্শ করতে পারল না। বস্তুত এটা হযরত হুদ 'আলাইহিস সালামের একটি মুজিযা। এর দ্বারা একে তো তাদের একথার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, আপনি কোন প্রমাণ বা মুজিযা প্রদর্শন করেননি। দ্বিতীয়ত তারা যে বলতো আমাদের কোন কোন দেবতা আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত করে দিয়েছে, তাও বাতিল করা হয়েছে। কারণ, দেব-দেবীর যদি কোন ক্ষমতা থাকতো, তবে এত বড় কথা বলার পর ওরা নিষ্ক্রিয় থাকতো না।

অতঃপর হুদ 'আলাইহিস সালাম তার কওমকে বলেন,

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّاۤ اُرْسِلْتُ بِهٖۤ اِلَيْكُمْ

অর্থঃ তোমরা যদি এভাবে সত্য প্রত্যাখ্যান করতে থাকো, তবে জেনে রাখো, যে পয়গাম পৌঁছাবার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, আমি তা যথাযথভাবে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। (সূরাহুদ, আয়াত: ৫৭)

কওমে 'আদের প্রতি আল্লাহর আযাব

হুদ 'আলাইহিস সালাম তাদের জানালেন, যথাযথভাবে আল্লাহ তা'আলার পয়গাম তোমাদের নিকট পৌঁছাবার পরও যখন তোমরা ঈমান আনছো না, তখন তোমাদের এমন কাজের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে যে, তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব ও গজব আপতিত হবে। তোমরা সমূলে নিপাত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আর আমার পরওয়ারদিগার তোমাদের যায়গায় অন্য জাতি পাঠিয়ে এই পৃথিবী আবাদ করবেন।

কিন্তু হতভাগার দল হযরত হুদ 'আলাইহিস সালামের কোন কথায় কর্ণপাত না করে বললো,

سَوَآءٌ عَلَيْنَاۤ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ○

অর্থঃ তুমি আমাদের নসীহত করো কিংবা না করো, আমরা কোন অবস্থাতেই আমাদের মত ও পথ ত্যাগ করবো না। (সূরা শুআরা, আয়াত: ১৩৬)

একথা বলে তারা নিজেদের হঠকারিতা ও অবাধ্যতার উপর অটল-অবিচল রইল।

এর পরিণতিতে তাদের উপর প্রথম এই আযাব নাযিল হলো যে, তিন বছর পর্যন্ত উপর্যুপরি বৃষ্টি বন্ধ থাকলো। এতে তাদের শস্যক্ষেতসমূহ শুকনো বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়ে

গেল এবং বাগান ও শস্য জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। কিন্তু এর পরেও তারা শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করলো না।

অতঃপর আট দিন ও সাত রাত পর্যন্ত তাদের উপর প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আযাব আপতিত হলো। কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে একথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَ اَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۙ○سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّ ثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ
○فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۚ○ فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ

অর্থঃ 'আদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছে এক প্রচণ্ড ঝড়বায়ু দিয়ে। আল্লাহ তা'আলা তা প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপর সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত অবিরাম। যেন আপনি তাদের দেখছেন, তারা অসার খেজুরকাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে আছে। আপনি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছেন কি? (সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াত: ৬-৮)

এই আযাবের ফলে তাদের অবশিষ্ট বাগ-বাগিচা ও দালান-কোঠা ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল। মানুষ ও জীব-জন্তু শূন্যে উড়তে লাগল। অতঃপর উপুড় হয়ে মাটিতে পড়তে থাকলো এবং মরতে থাকলো।

প্রথম দিকে তারা আল্লাহর গজব আসতে দেখে মজবুত কেল্লায় সংরক্ষিত ঘরে আশ্রয় নিলো। আবার অনেকে মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে শরীরের অর্ধেকাংশ ঢুকিয়ে রাখলো, যাতে প্রচণ্ড ঝড় থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। কিন্তু তাদের কোন প্রচেষ্টাই তাদের আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ

অর্থঃ আল্লাহর নির্ধারিত সময় যখন এসে যায়, তখন আর কোন অবকাশ থাকে না।

আল্লাহ তা'আলা এভাবে 'আদ জাতিকে পৃথিবীর যমিন থেকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

মূর্তির নিকট মানুষের প্রার্থনা

এক বর্ণনায় এসেছে, 'আদ জাতির উপর তিন বছর বৃষ্টি বন্ধ থাকার পরে তারা তাদের কিছুসংখ্যক লোককে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে মক্কা শরীফে পাঠিয়ে দিল। বাইতুল্লাহ শরীফে তখন অনেক দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপিত ছিল। তারা তখন ঐসব মূর্তির কাছেই নানান প্রার্থনা জানালো। কিন্তু নির্জীব মূর্তির কোন কিছু করারই তো ক্ষমতা নেই। তাই তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল।

মক্কা গমনকারীদের মধ্যে প্রথম দলে ছয় ব্যক্তি ছিল। তাদের মধ্যে দুজন ছিল তাওহীদে বিশ্বাসী। অবশ্য তারা তাদের ঈমানের কথা গোপন রেখেছিল। তাদের একজনের নাম মাজিদ এবং অপরজনের নাম ছিল লাকিম।

এই দলের পরে আরেকটি দল মক্কায় গিয়েছিল। তাদের লোকসংখ্যা ছিল সত্তর হাজার। তারা সবাই ছিল বেঈমান কাফের। এই দলের নেতার নাম ছিল কীল ইবনে ইনায।

মাজিদ উক্ত নেতাকে বললো, তোমরা পানির জন্য দু'আ করতে এসেছ, কিন্তু যতক্ষণ না তোমরা হুদ 'আলাইহিস সালাম ও তার রবের প্রতি ঈমান আনছ, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের দু'আ কবুল হবে না বলে আমার প্রবল ধারণা। তার কথা শুনে সবাই তাকে হুদ 'আলাইহিস সালামের অনুসারী মনে করে খুবই তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করলো।

তখন মাজিদ ও লাকিম উভয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলো, হে পরওয়ারদিগার, এরা কখনোই আপনার রহমতের প্রতি আস্থা আনবে না। আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের দু'আ কবুল করুন। তখন আল্লাহর দরবার থেকে অর্থাৎ গায়েব থেকে আওয়াজ এলো, তোমরা আমার কাছে কী প্রার্থনা করছো? তখন মাজিদ এই দু'আ করলো, হে প্রভু, আমি যেন কোনদিন অনাহারে না থাকি। আর লাকিম দু'আ করলো, হে পরওয়ারদিগার, তুমি আমার আয়ু তিন হাজার বছর লম্বা করে দাও। আল্লাহর তরফ থেকে জবাব এলো, তোমাদের উভয়ের দু'আ কবুল করা হলো।

অপরদিকে কীল ইবনে ইনায তার সত্তর হাজার সঙ্গী নিয়ে একত্রে প্রার্থনা করে বললো, হে প্রভু, আমাদের মধ্যে কখনো কারো রোগব্যাধি হয়নি যে, তোমার কাছে তার আরোগ্য প্রার্থনা করবো। আর আমি নিজেও কখনও কোন বিপদে পড়িনি যে, বিপদমুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাবো। আমরা সবাই শুধু 'আদ জাতির জন্য তোমার কাছে বৃষ্টি কামনা করতে এসেছি।

যেভাবে আযাব এলো

তারা এভাবে প্রার্থনা জানানোর পরে আকাশের কোণে সাদা, কালো, লাল- এই তিন বর্ণের মেঘ আত্মপ্রকাশ করলো। মেঘের মধ্য থেকে অদৃশ্য আওয়াজ শোনা গেল, হে কীল, এই তিন প্রকার মেঘ থেকে তুমি কোন্ প্রকার চাও? কীল জানতো, সাদা ও লাল মেঘে বৃষ্টি হয় না। তাই সে কাল মেঘটিই প্রার্থনা করলো।

তারপর তারা বাইতুল্লাহ থেকে দেশে ফিরে এসে, কালো মেঘটিও তাদের সাথে সাথে চলে এলো। কাফেররা তখন হুদ 'আলাইহিস সালামকে বিদ্রুপ করে বলতে লাগল, হে হুদ, তুমি বলেছিলে, আমাদের প্রতি তোমার আল্লাহর গজব নাযিল হবে। কিন্তু এখন কী দেখছ? শীঘ্রই বৃষ্টিপাত হয়ে আমাদের শস্যক্ষেত সুজলা-সুফলা করে দিবে। দেশে শান্তি ফিরে আসবে। দুর্ভিক্ষ দূর হবে।

হুদ 'আলাইহিস সালাম বললেন, আচ্ছা, তোমরা একটু ধৈর্যধারণ কর। এই কথা বলে তিনি তার ঈমানদার উম্মতদের অতি তাড়াতাড়ি সেই স্থান ত্যাগ করতে বললেন।

অতঃপর কওমে 'আদের উপর আল্লাহর কঠিন আযাব মারাত্মক বৃষ্টি নাযিল হলো। সেই আযাব এতই ভয়ংকর ছিল যে, কাফেররা কোন রকম উপায়ান্তর না দেখে প্রায় সাত লক্ষ লোক পাহাড়ের গর্তগুলোতে আত্মগোপন করে বলতে লাগল, এখন আর আসন্ন ঝড়-তুফান আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ভীষণ বজ্রধ্বনিসহ লাগাতার আটদিন এমন প্রবল ঝড়-তুফান প্রবাহিত হলো যে, দাম্ভিক 'আদ জাতির লোকদের দম্ভ ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল এবং তারাও ধ্বংস হলো।

তাদের নির্ভীক মজবুত প্রাসাদগুলো প্রথম ঝাপটায়ই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। দ্বিতীয়বারে তাদের আশ্রয়স্থল পাহাড়ের গুহাগুলোয় ঝড়বায়ু প্রবেশ করে তাদের সবাইকে বাইরে উড়িয়ে এনে এমনভাবে আছাড় মারলো যে, সাত লক্ষ মানুষের দেহ যেন উৎপাটিত খেজুর গাছের মতো নিষ্প্রাণ অবস্থায় যমিনে পড়ে রইলো। অতঃপর প্রবল বায়ুর তাণ্ডব প্রচণ্ড ধুলাবালি উড়িয়ে সেসব লাশের উপরে এমনভাবে নিয়ে ফেলল, তার মধ্যে তারা চাপা পড়ে গেল।

সূরা আলহাক্কাহর বর্ণনা দিয়ে বোঝা যায়, 'আদ জাতি ঝড়-তুফানের কবলে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু সূরা মুমিনুনের আয়াতে বলা হয়েছে,

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ

অর্থঃ একটি বিকট শব্দ তাদের পাকড়াও করলো। (সূরা মুমিনুন, আয়াত: ৪১)

এই আয়াতের ভিত্তিতে কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, ‘আদ জাতির উপর বিকট ধরনের শব্দের আযাবও নাযিল হয়েছিল।

....

সালেহ আলাইহিস সালাম

কওমে সামূদের প্রতি আল্লাহর নাফরমানীর শাস্তি

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَ اِلٰی ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَیِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ○هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰیَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِیْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَیَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ؕ

অর্থঃ আমি সামূদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম। তিনি বলেন, হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ এসেছে। এটা আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শন। সুতরাং একে আল্লাহর যমিনে বিচরণ করে খেতে দাও। এতে ক্ষতি করার মানসে স্পর্শ করো না। তা না হলে ভীষণ বেদনাদায়ক আযাব তোমাদের আঁকড়ে ধরবে। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৭৩)

সূরা আরাফের উল্লিখিত ৭৩ নং আয়াতে এবং এরপর থেকে ৭৯ নং আয়াত পর্যন্ত মোট সাতটি আয়াতে সালেহ ‘আলাইহিস সালাম ও তার সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন এরআগে এই সূরায়, কওমে নূহ ও কওমে হুদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে,

وَ اِلٰی ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا

অর্থঃ আমি সামূদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছি।

‘আদ ও সামূদ একই দাদার বংশধর দুই ব্যক্তির নাম। তাদের সন্তানরাও তাদের নামে অভিহিত হয়ে আলাদা দুটি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। একটি ‘আদ। অপরটি সামূদ।

তারা আরবের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় বসবাস করতো। তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল “হিজর”। বর্তমানে একে সাধারণত “মাদায়িনে সালেহ” বলা হয়।

‘আদ জাতির মতো সামূদও বুদ্ধিমান, শক্তিশালী ও বাহাদুর জাতি ছিল। তারা পাথর খোদাই ও রাজমিস্ত্রির কাজে খুবই পারদর্শী ছিল। সমতল ভূমিতে বিশাল বড় বড় দালান নির্মাণ ছাড়াও পাহাড় খোদাই করে তারা নানান ঘর তৈরি করতো। তাদের নির্মান কাজের নিদর্শন আজও বিদ্যমান আছে। এগুলোর গায়ে ইরামি ও সামুদি বর্ণমালার শিলালিপি রয়েছে। এক সফরে সেসব নিদর্শন আল্লাহ তা‘আলা আমাকে (লেখক, হযরতওয়ালা মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.কে) দেখার সুযোগ দান করেছেন।

দুনিয়াবী ধন-সম্পদ আর আধিপত্যের পরিণতি প্রায়ই অশুভ হয়ে থাকে। ধনীরা আল্লাহ তা‘আলা ও পরকাল ভুলে গিয়ে ভ্রান্ত পথে পা বাড়ায়। সামূদ জাতির বেলায় তা-ই ঘটেছে।

আল্লাহ তা‘আলা তার চিরন্তন রীতি অনুযায়ী সামূদ জাতির হেদায়েতের জন্য হযরত সালেহ ‘আলাইহিস সালামকে পয়গাম্বর হিসাবে প্রেরণ করেন। তিনি বংশ ও দেশের দিক দিয়ে সামূদ জাতিরই একজন সদস্য এবং সামেরই বংশধর ছিলেন। এ কারণেই আয়াতে তাকে اَخَاهُمْ صَالِحًا অর্থাৎ, “তাদের ভাই সালেহ” বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত সালেহ ‘আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে পূর্ববর্তী নবীগণের মতো তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি তাদের বলেন,

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ

অর্থঃ হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

হযরত সালেহ ‘আলাইহিস সালাম যৌবনকাল থেকেই তার সম্প্রদায়কে তাওহীদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন এবং এ কাজ করতে করতেই বার্ধক্যে উপনীত হন।

তার উপর্যুপরি পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থির করলো, তার কাছে এমন একটি দাবি করতে হবে, যা পূরণ করতে তিনি অক্ষম হবেন এবং আমরা তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করবো। সেমতে তারা দাবি করলো, আপনি যদি সত্যিই আল্লাহর নবী হোন তা হলে আমাদের "কাতিবা" পাহাড়ের পাথরের ভিতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী সবল উটনী বের করে দেখান, যার রঙ হবে সোনালি।

হযরত সালেহ 'আলাইহিস সালাম প্রথমে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন, যদি আমি তোমাদের দাবি পূরণ করে দিই, তবে তোমরা আমার প্রতি এবং আমার দাওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে কি না? তখন তারা সবাই এই মর্মে অঙ্গীকার করলো।

হযরত সালেহ 'আলাইহিস সালাম দুই রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন, "আয় আল্লাহ, আপনার জন্য কোন কাজই কঠিন না। তাই দু'আ করছি, তাদের দাবি পূরণ করে দিন।"

সালেহ 'আলাইহিস সালামের দু'আর সাথে সাথে পাহাড়ের গায়ে গর্ভধারিণীর মতো স্পন্দন দেখা দিল এবং একটি বিরাট পাথর বিস্ফোরিত হয়ে তার ভিতর থেকে দাবির অনুরূপ দশ মাসের গর্ভবতী স্বাস্থ্যবতী সোনালি রঙের একটি উটনী বেরিয়ে এলো।

হযরত সালেহ 'আলাইহিস সালামের এই বিস্ময়কর মুজিযা দেখে সেই সম্প্রদায়ের কিছুলোক সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে গেল। বাকিরাও মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলো। কিন্তু দেব-দেবীর বিশেষ পূজারি ও মূর্তিপূজার ঠাকুর-ধরনের কিছু সরদার তাদের ইসলাম গ্রহণে বাধা দিল। তাই তারা আর মুসলমান হলো না।

শেষ পর্যন্ত সালেহ 'আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়ের সেই নাফরমান লোকদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। কারণ এদের উপর আযাব এসে যেতে পারে। তাই তিনি পয়গাম্বর সুলভ দয়া প্রকাশ করে বললেন, এই উটনীর দেখাশোনা করো। একে কোনরূপ কষ্ট দিয়ো না। এভাবে করে হয়তো তোমরা আযাব থেকে বেঁচে যেতে পারবে। কিন্তু এর অন্যথা হলে তোমরা সাথে সাথে আযাবে পতিত হবে। নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

○هٰذِهٖ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْٓ اَرْضِ اللهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

অর্থঃ এটি আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্য নিদর্শন। অতএব, একে আল্লাহর যমিনে বিচরণ করে খেতে দাও এবং একে ক্ষতি করার নিয়তে স্পর্শ করো না। নতুবা তোমাদের ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে।

পৃথিবীর সবকিছুই তো আল্লাহ তা'আলার! তবু বিশেষভাবে এই উটনীকে "আল্লাহর উটনী" বলার কারণ হলো, এটি আল্লাহর অসীম শক্তির নিদর্শন এবং সালেহ 'আলাইহিস সালামের মুজিযা হিসাবে বিস্ময়কর ভাবে সৃষ্টি হয়েছে। যেমন হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের জন্মও অলৌকিকভাবে হয়েছিল বলে তাকে رُوْحُ اللهِ (আল্লাহর আত্মা) বলা হয়েছে। কিংবা সেই উটনীর মাহাত্ম্য বুঝানোর জন্য তাকে نَاقَةُ اللهِ (আল্লাহর উটনী) বলা হয়েছে।

এরপর تَأْكُلْ فِى اَرْضِ اللهِ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই উটনীর পানাহারে তোমাদের মালিকানা ও তোমাদের ঘর থেকে কিছুই ব্যয় করতে হবে না। যমিন আল্লাহর এবং এর উৎপন্ন ফসলও আল্লাহর সৃষ্টি। কাজেই তার উটনীকে তার যমিনে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও, যাতে সাধারণভাবে চারণক্ষেত্রে বিচরণ করে নির্বিঘ্নে খেতে পারে।

সামূদ জাতি যে কূপ থেকে পানি পান করতো এবং জন্তুদের পান করাতো, এই উটনীও সেই কূপ থেকেই পানি পান করতো। কিন্তু এ আশ্চর্য ধরনের উটনী যখন পানি পান করতো, তখন পানি পান করে নিঃশেষ করে ফেলতো এবং এর ভয়ে সম্প্রদায়ের অন্য সব জীব-জন্তু তখন পান করতে আসতো না। এর ফলে সমস্যা দেখা দিল।

তখন হযরত সালেহ 'আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে ফায়সালা করে দিলেন, একদিন এই উটনী পানি পান করবে এবং অন্যদিন সম্প্রদায়ের সবাই পানি নিবে। অধিকন্তু যেদিন উটনী পানি পান করতো, সেদিন অন্যরা উটনীর দুধ দিয়ে তাদের সব পাত্র ভর্তি করে নিত। সূরা কামারে এভাবে পানি বণ্টনের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ

অর্থঃ হে সালেহ, আপনি স্বজাতিকে জানিয়ে দিন, তাদের এবং উটনীর মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত, একদিন উটনীর এবং পরবর্তী দিন তাদের। (সূরা কমার, আয়াত: ২৮)

সূরা শুআরা-এর ১৫৫ নং আয়াতে সে প্রসঙ্গ এভাবে ব্যক্ত হয়েছে,

هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ

অর্থঃ এটি আল্লাহর উটনী। একদিন এর জন্য পানি বরাদ্দ থাকবে এবং অন্য নির্দিষ্ট দিনের পানি তোমাদের থাকবে।

আল্লাহর উটনী হত্যা

আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাগণ এই বণ্টন-ব্যবস্থা দেখাশোনা করতেন, যাতে কেউ এর খেলাফ করতে না পারে।

এই উটনীর কারণে সামূদ জাতির কিছুটা অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু তারাই যেহেতু এটা আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে এনেছে আর একে কিছু করা হলে তারা আযাবের সম্মুখীন হবে, তাই কিছু করতে সাহস করছিল না। তবু মনে মনে তারা এর ধ্বংস কামনা করতো।

ইতিমধ্যে শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিল। তাই তারা নিজেরা সেই উটনীটি হত্যা করার দুঃসাহস না দেখালেও অন্য কোনোভাবে তাকে খতম করার ফন্দি-ফিকির করতে লাগলো।

এক পর্যায়ে সেই সম্প্রদায়ের সাদাকা বিনতে মুখতার ও উনাইযা নামীয় দুজন নারী ফন্দি আঁটলো। যে প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান ও চেতনা বিলুপ্ত করে দেয়, তা হচ্ছে নারীর প্রলোভন। সেই দুই নারী ছিল পরম সুন্দরী। তারা বাজি ঘোষণা করলো, যে ব্যক্তি এই উটনী হত্যা করবে, সে আমাদের এবং আমাদের কন্যাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারবে।

তখন সম্প্রদায়ের দুই যুবক এই কাজের জন্য তৈরি হলো। তাদের নাম মিসদা ও কাসার। তারা সেই বাজি পাওয়ার নেশায় মত্ত হয়ে উটনী হত্যা করার জন্য বেরিয়ে পড়লো।

তারা উটনীর যাতায়াতের পথে একটি বড় পাথরের টুকরার পেছনে গোপনে বসে রইল। তারপর উটনী সামনে আসতেই মিসদা তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করলো এবং কাসার তরবারির আঘাতে তার পা কেটে তাকে হত্যা করলো।

সূরা শামসে তাকে সামূদ জাতির সবচাইতে বড় হতভাগা বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কেননা, তার কারণেই গোটা সম্প্রদায় আযাবে পতিত হয়েছে।

নাফরমানীর শাস্তি

উটনী হত্যার ঘটনা জানার পর সালেহ 'আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে আল্লাহর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন, এখন থেকে তোমাদের জীবনকাল মাত্র তিনদিন অবশিষ্ট রয়েছে। এই সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বিবরণ হচ্ছে,

تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ

অর্থঃ তোমরা তিনদিন তোমাদের বাড়ি-ঘরে আরাম করে নাও। (এরপরই আযাব নেমে আসবে।) এই ওয়াদা সত্য, এর ব্যতিক্রম হবে না। (সূরা হুদ, আয়াত: ৬৫)

কিন্তু যে জাতির বিবেক ও চেতনা বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাদের জন্য কোন উপদেশ ও হুঁশিয়ারি কাজে আসে না। তাই তো হযরত সালেহ 'আলাইহিস সালামের এই কথা শুনে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে বললো, "এই শাস্তি কীভাবে এবং কোথা থেকে আসবে? এর লক্ষণ কী হবে?"

সালেহ 'আলাইহিস সালাম বললেন, তা হলে আযাবের লক্ষণও শুনে নাও। আগামীকাল বৃহস্পতিবার তোমাদের নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষ সবার মুখমণ্ডল হলোদে ও ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। অতঃপর পরশু শুক্রবার সবার মুখমণ্ডল গাঢ় লালবর্ণ ধারণ করবে। অতঃপর শনিবার সবার মুখমণ্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যাবে। সেটাই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন।

হতভাগা জাতি এই কথা শুনেও আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করার পরিবর্তে খোদ সালেহ 'আলাইহিস সালামকেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা ভাবলো, যদি সে সত্যবাদী হয় এবং আমাদের উপর আযাব আসেই, তবে আমরা নিজেদের আগে তার ভবলীলাই সাঙ্গ করে দিই। পক্ষান্তরে যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে মিথ্যার সাজা ভোগ করুক।

সামূদ জাতির এই সংকল্পের কথা কুরআনুল কারীমের অন্যত্র বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছুলোক রাতের আঁধারে সালেহ 'আলাইহিস সালামকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার ঘরপানে রওয়ানা হলো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পথিমধ্যেই পাথরের বৃষ্টি দিয়ে তাদের ধ্বংস করে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ مَكَرُوْا مَكْرًا وَّ مَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

অর্থঃ তারা গোপন ষড়যন্ত্র করলো। আমি এমন কৌশল অবলম্বন করলাম, তারা তা জানতেই পারলো না। (সূরা নামল, আয়াত: ৫০)

এরপর বৃহস্পতিবার ভোরে দেখা গেল ঠিকই সালেহ 'আলাইহিস সালামের কথা অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল গভীর হলুদ রঙে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

প্রথম লক্ষণ সত্য প্রমাণিত হওয়ার পরেও জালিমরা ঈমানের প্রতি মনোনিবেশ করলো না। বরং তারা সালেহ 'আলাইহিস সালামের প্রতি আরো চটে গেল এবং সমগ্র জাতি তাকে হত্যা করার জন্য ঘোরাফেরা করতে লাগলো। তখন আল্লাহ তা'আলা তার নবী 'আলাইহিস সালামকে তাদের সকল চক্রান্ত থেকে হেফাজত করলেন।

যেভাবে আযাব এলো

মানুষের মন-মস্তিষ্ক যখন ভ্রান্ত হয়ে যায় তখন লাভকে ক্ষতি ও ক্ষতিকে লাভ এবং ভালোকে মন্দ ও মন্দকে ভালো মনে করতে থাকে। সামূদ জাতির বেলায় তা-ই ঘটলো। আল্লাহ তা'আলা আযাব দানের বিভিন্ন পর্যায়ের উদ্ভব ঘটিয়ে তাদের এই অবকাশ দিচ্ছিলেন যে, তারা কুফর ও নাফরমানী ছেড়ে ঈমানের পথে ফিরে আসে কি না। কিন্তু না, সেই হতভাগারা শেষ সুযোগ পর্যন্ত বেদীনী ও অবাধ্যতার উপর অটল অবিচল থাকলো এবং ঈমানের পথে ফিরে এসে আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় অবলম্বন করলো না।

এমনি করেই দ্বিতীয়দিন সালেহ 'আলাইহিস সালামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল লাল এবং তৃতীয়দিন ঘোর কালো হয়ে গেল। তখন সবাই জীবন থেকে নিরাশ হয়ে গেল এবং অপেক্ষা করতে লাগলো, কোন দিক থেকে কীভাবে আযাব এসে তাদের ধ্বংস করবে।

এমতাবস্থায় ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হলো এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ চিৎকার শোনা গেল। ফলে সবাই বসা অবস্থায় অধোমুখী হয়ে যমিনে শুয়ে পরলো।

পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ অর্থাৎ, ভূ-কম্পন তাদের পাকড়াও করলো। অপর আয়াতে বলা হয়েছে, فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ অর্থাৎ, বিকট চিৎকার তাদের আঁকড়ে নিলো।

এতে বুঝা যাচ্ছে তাদের উপর উভয় প্রকার আযাব নাযিল হয়েছিল। নিচের দিক থেকে ভূমিকম্প এবং উপরের দিক থেকে বিকট চিৎকার-এর আযাব তাদের ঘিরে নিয়েছিল। ফলে তাদের কী অবস্থা হয়েছে, সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

فَاَصْبَحُوْا فِیْ دَارِهِمْ جٰثِمِیْنَ

অর্থঃ তারা বাড়ি-ঘরে যে যে অবস্থায় ছিল, সেভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো। (সূরা আনকাবূত, আয়াত: ৩৭)

এই ঘটনার প্রধান অংশগুলো কুরআনে কারীমের বিভিন্ন সূরায় রয়েছে। যথা, সূরা আরাফ, আয়াত ৭৩-৭৬; সূরা হুদ, আয়াত ৬১-৬৮; সূরা শুআরা, আয়াত ১৪১-১৫৯; সূরা নাহলো, আয়াত ৪৫-৪৯; সূরা কমার, আয়াত ২৩-৩১; সূরা শামস, আয়াত ১১-১৫। এ ছাড়াও ঘটনার আরো বিবরণ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, তাবুক যুদ্ধের সফরকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজর নামক সেই স্থানটি অতিক্রম করেন, যেখানে সামূদ জাতির উপর আযাব এসেছিলো। তখন তিনি সাহাবীদের নির্দেশ দেন, “কেউ যেন এই আযাববিধ্বস্ত এলাকার ভিতরে প্রবেশ না করে এবং কেউ যেন এই এলাকার কূপের পানি ব্যবহার না করে।”(তাফসীরে মাযহারী)

কেউ আযাব থেকে রক্ষা পায়নি

অপর হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সামূদ জাতির উপর আপতিত আযাব থেকে সেসময় শুধু “আবু রিগাল” নামক এক ব্যক্তি বেঁচে গিয়েছিল। এ ছাড়া কেউ বাঁচতে পারেনি। এরপর আবু রিগালকেও গযব পাকড়াও করেছিল। সে মরে মাটিতে দেবে যায়। ঘটনাক্রমে গযব নাযিলের সময় এই লোক মক্কায় এসেছিল। মক্কার হেরেমের সম্মানার্থে আল্লাহ তা‘আলা তখন তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। এরপর যখন সে হেরেম শরীফ থেকে

বাইরে যায়, তখন সামূদ জাতির আযাব তার উপরও পতিত হয় এবং সেও তখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়েকেরামকে মক্কার বাইরে আবু রিগালের কবরের চিহ্নও দেখান এবং বলেন, “তার সাথে স্বর্ণের একটি ছড়ি মাটিতে দাফন হয়ে গিয়েছে।”তখন সাহাবায়েকেরাম তার কবর খনন করলে সেই ছড়িটি পাওয়া যায়। এই রেওয়ায়াতে আরো বলা হয়েছে, তায়েফের অধিবাসী সাকিফ গোত্র আবু রিগালেরই বংশধর। (তাফসীরে মাযহরী)

....

হজরত লুত আলাইহিস সালাম

হযরত লুত আলাইহিস সালম এর পরিচয়

লুত ইবনে হারান (لوط, Lūṭ), যিনি সচরাচর হযরত লুত নামে অভিহিত, বাইবেল এবং কুরআনে উল্লেখিত আল্লাহ প্রেরিত একজন পয়গম্বর যাকে সদোম ও গোমোরাহ নামক শহরদ্বয়ের অধিবাসীদের নবী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।[১][২] তিনি ছিলেন নবী ইব্রাহীমের আপন ভাতিজা।[৩] ইব্রাহীমের সঙ্গে তিনি কেনানে চলে আসেন। সেখানেই তার উপর নবুয়াতের দায়িত্ব অবতীর্ণ হয়। [৪]পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর মধ্যে ইসলামের একজন নবী যাকে সমকামিতায় লিপ্ত থাকা স্বীয় জাতির সতর্ককারী হিসেবে আল্লাহ তাআলা নিয়োজিত করেছিলেন। সমকামিতা ত্যাগ না করায় তারা আল্লাহর আযাবে সমূলে ধ্বংস হয়েছিলো।

কওমে লুতের অপকর্ম এবং তাদের ধ্বংস

নবী এবং রাসূলগণের শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি যারা মিথ্যারোপ করেছিল এবং পাপাচারী কাওম বলে খ্যাতি অর্জন করেছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল হযরত ইব্রাহীম আ. ও হযরত লুত আ. এর কাওম। বিশেষ করে হযরত লুত আ.-এর কাওমের লোকেরা ছিল যৌনাচারী। তারা অবাধে শুধু নারী-পুরুষই নয়, বরং পুরুষে পুরুষেও যৌনকর্ম সম্পাদন করত।

ঢালাওভাবে যৌনাচারের প্রবল স্রোতে তারা ছোট-বড় নির্বিশেষে গা ভাসিয়ে দিয়ে ছিল। তারা হযরত ইব্রাহীম আ. ও হযরত লুত আ. কে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার-প্রপাগান্ডা চালিয়ে ছিল। এ প্রসঙ্গে আল কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, 'আর ইব্রাহীমের কাওম ও লুতের কাওম (পাপাচারী ও যৌনাচারীতে) নিমগ্ন ছিল।' (সূরা আল হাজ্জ : আয়াত ৪৩)।

হযরত লুত আ. তার কাওমকে যে সদুপদেশ দিয়েছিল এবং তার কাওমের লোকেরা যে প্রতি উত্তর দিয়েছিল এবং তাদের ওপর যে আযাব নাজিল হয়েছিল তা সবিস্তারে আল কোরআনে বিবৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'এবং লুতকেও আমি নবী রূপে প্রেরণ করেছিলাম। সে তার কাওমকে বলল, তোমরা এমন নিকৃষ্ট কর্ম করে চলেছ যা তোমাদের আগে পৃথিবীতে কেউ করেনি। তোমরা যৌনতৃপ্তি পূরণের জন্য নারীদের ছেড়ে পুরুষদের কাছে গমন করছ, আসলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী কাওমে পরিণত হয়েছে।

লুতের কাওমের লোকদের একথা ছাড়া কোনো উত্তর ছিল না যে, তারা বলল, তাকে তোমাদের আবাসভ‚মি হতে বের করে দাও। তারা পবিত্রতা পছন্দকারী শ্রেণীর মানুষ। সুতরাং আমি লুত ও তার পরিবার পরিজনকে মুক্তি দিলাম তার স্ত্রীকে ছাড়া। কেননা সে ছিল পশ্চাদবর্তী দলের অন্তর্ভূক্ত। আমি তাদের প্রতি পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। তাই, লক্ষ্য কর যে, পাপীদের পরিণাম কি দাঁড়িয়ে ছিল। (সূরা আল আ'রাফ : আয়াত ৮৩-৮৪)।
আল্লাহপাক পাপাচারী ও যৌনচারী কাওমে লুতকে ধ্বংস করার ফায়সালা গ্রহণ করলেন। তিনি একদল ফিরিশতাকে সুন্দর ও মনোহর বালকের আকৃতিতে কাওমে লুতকে ধ্বংস করার জন্য হযরত ইব্রাহীম আ.-এর নিকট প্রেরণ করলেন। এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা আল কোরআনে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে, 'আমার প্রেরিত ফিরিশতারা ইব্রাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল। তারা বলল, সালাম, সে উত্তর করল সালাম। অতিসত্বর সে গো-বৎস ভ‚না গোশত নিয়ে আসল। ফিরিশতারা সে দিকে হাত বাড়ালো না, সে তা অবলোকন করে গর্হিত ভাবল এবং হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হল। তারা বলল, ভয় করবেন না। আমরা লুতের কাওমের প্রতি প্রেরীত হয়েছি।

এ সময়ে ইব্রাহীমের স্ত্রী দাঁড়ানো ছিল, সে হেসে দিল। পরে তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম। ইসহাকের পরে ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম। সে বলল, কী আশ্চর্য, আমি এ বৃদ্ধা বয়সে সন্তানের জননী হব, আমার স্বামীও বৃদ্ধ, এটাতো ভারী তাজ্জবের কথা। ফিরিশতাগণ বলল, আল্লাহর কাজে তুমি অবাক বোধ করছ? হে নবী পরিবার, তোমাদের প্রতি আল্লাহ রহমত ও কল্যাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই তিনি প্রসংশিত, সম্মানীত।

ইব্রাহীমের ভয় তিরোহীত হলে এবং তার কাছে সুসংবাদ আসলে সে আমার সাথে কাওমে লুত সম্পর্কে অনুনয় বাক্য শুরু করল। ইব্রাহীম একান্তই সহনশীল, কোমল হৃদয় বিনীত ছিল। আমি বললাম, হে ইব্রাহীম, এ থেকে দূরে থাক, তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ এসে গেছে এবং তাদের ওপর অনিবার্য আযাব আসবেই। আমার ফিরিশতারা লুতের সমীপে পৌঁছলে সে নাখোশ হল এবং তাদেরকে হেফাজত করতে নিজেকে অসমর্থ ভাবল এবং বলল, তা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দিবস।

তার কাওম তার কাছে দৌঁড়ে উদভ্রান্তের মত ছুটে আসল। তারা পূর্ব হতেই দুস্কর্মচারী ছিল। লুত বলল, হে কাওম, এরা আমার কন্যা, এরা তোমাদের জন্য পরম পবিত্র, আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার মেহমানদের সম্পর্কে আমাকে লজ্জিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি সৎলোক নেই? তারা বলল, তুমি জান তোমার কন্যাগণ আমাদের কোনো দরকার নেই এবং আমাদের ইচ্ছা সম্বন্ধে তুমি পরিজ্ঞাত। সে বলল, আমার তোমাদের বিরুদ্ধে যদি শক্তি থাকত কিংবা কোনো বৃহৎ শক্তির যদি আশ্রয় নিতে পারতাম (তা হলেই) ভালো হত।

ফিরিশতাগণ বলল, হে লুত, আমরা তোমার পরওয়ারদিগার কর্তৃক প্রেরীত। তারা আদৌ তোমার নিকট পৌঁছাতে পারবে না, তাই নিজ স্বজনদেরসহ রাতের কোনো এক সময় বের হয়ে পড় এবং তোমাদের কেউ পেছনে তাকাবে না, কিন্তু তোমার স্ত্রীরও তা-ই ঘটবে, যা তাদের ভাগ্যে রয়েছে। তাদের নির্দিষ্টকাল ভোর বেলা, ভোর বেলা কি নিকটবর্তী নয়? তারপর যখন আযাবের নির্দেশ এসে পৌঁছল, তখন আমি নগরগুলো উল্টে দিলাম ওপরে-নিচে ও বর্ষণ করলাম জমাট বাঁধা প্রস্তর। যা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে নির্দিষ্ট ছিল এবং তা জালিমদের থেকে দূরে নয়।' (সূরা হুদ : আয়াত ৬৯-৮৩)।

....

হজরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম

নবুওত লাভ করে তিনি আল্লাহ তাআলার দ্বীন প্রচারে লেগে গেলেন। নিজ সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা এসব কীসের উপাসনা করছ? তোমরাই তো এগুলো বানিয়েছ। এরা নিজেদেরই কোনো উপকার করতে পারে না। তোমাদের উপকার করবে কীভাবে? বরং তিনিই তোমাদের রব, যিনি তোমাদেরকেসহ এই আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন। তোমরা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়ে

আছ। কুরআন কারীমে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে তাঁর কওমের কথোপকথন বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَ قَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٧٠ قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ۝٧١ قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ
اِذْ تَدْعُوْنَ ۝٧٢ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ۝٧٣ قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَاۤ اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ۝٧٤ قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ
مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۝٧٥ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ۝٧٦ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْۤ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٧٧ الَّذِيْ خَلَقَنِيْ
فَهُوَ يَهْدِيْنِ ۝٧٨ وَ الَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَ يَسْقِيْنِ ۝٧٩ وَ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ۝٨٠ وَ الَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ
ثُمَّ يُحْيِيْنِ ۝٨١ وَ الَّذِيْۤ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓـَٔتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ

যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কীসের ইবাদত কর। তারা বলল, আমরা প্রতিমাদের ইবাদত করি এবং তাদেরই সামনে ধরনা দিয়ে থাকি। ইবরাহীম বলল, তোমরা যখন তাদেরকে ডাক, তখন তারা কি তোমাদের কথা শোনে? কিংবা তারা কি তোমাদের কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে? তারা বলল, আসল কথা হল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এমনই করতে দেখেছি। ইবরাহীম বলল, তোমরা কি কখনও গভীরভাবে লক্ষ করে দেখছ, তোমরা কীসের ইবাদত করছ? তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদাগণ? এরা সব আমার শত্রু, এক রাব্বুল আলামীন ছাড়া। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনিই আমার পথপ্রদর্শন করেন। আমাকে খাওয়ান ও পান করান। আমি যখন পীড়িত হই, তিনিই আমাকে সুস্থতা দান করেন। যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় আমাকে জীবিত করবেন। যার কাছে আমি আশা রাখি, হিসাব-নিকাশের দিন তিনি আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। -সূরা শুআরা (২৬) : ৭০-৮২

আরও ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّ لَا يَضُرُّكُمْ ۝٦٦ اُفٍّ لَّكُمْ وَ لِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

সে বলল, তবে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা করছ, যা তোমাদের কিছু উপকারও করতে পারে না এবং তোমাদের ক্ষতিও করতে পারে না? আফসোস তোমাদের প্রতি এবং আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করছ তাদেরও প্রতি। তোমাদের কি এতটুকু বোধও নেই? -সূরা আম্বিয়া (২১) : ৬৬-৬৭

কুরআন কারীমে আরও বেশ কয়েক জায়গায় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে তাঁর উম্মতের কী কথাবার্তা হয়েছিল, তা বর্ণিত হয়েছে।

ঈমানের দিকে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এমন এক পন্থা অবলম্বন করলেন, যা বেশি প্রভাবক। তিনি তাদেরকে সহজ সাধারণ এবং সুস্পষ্ট ও বাস্তববাদী কিছু প্রশ্ন করে তাদের কাছেই এর জবাব চাইলেন। বললেন, তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা কি শুনতে পারে? তারা কি তোমাদের উপকার করতে পারে? কীভাবে করবে! তারা তো নিজেদেরই উপকার করতে পারে না।

মানুষ উপকার-অপকার ইত্যাদি বাস্তব অনুগ্রহ বেশি মনে রাখে। এ বিষয়টি তিনি দাওয়াতে তুলে ধরলেন। সেইসঙ্গে মূর্তিগুলোর প্রকৃত অবস্থা কী, সেগুলো কতটা অক্ষম এবং সেগুলোর অসারতা তুলে ধরলেন। এটা এমন এক পন্থা, যা মানুষের চিন্তা জগতে আলোড়ন তোলার পাশাপাশি অধিক কার্যকর ও ফলপ্রসূ।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর পিতাকে ঈমানের দিকে দাওয়াত দিতে গিয়ে বললেন-

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَ لَا يُبْصِرُ وَ لَا يُغْنِیْ عَنْكَ شَيْـًٔا۴۲ يٰۤاَبَتِ اِنِّیْ قَدْ جَآءَنِیْ
مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِیْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا۴۳ يٰۤاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ
لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا۴۴ يٰۤاَبَتِ اِنِّیْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا

স্মরণ কর, যখন সে নিজ পিতাকে বলেছিল, বাবা! আপনি এমন জিনিসের ইবাদত কেন করেন, যা কিছু শোনে না, দেখে না এবং আপনার কোনো কাজও করতে পারে না? বাবা! আমার নিকট এমন এক জ্ঞান এসেছে, যা আপনার কাছে আসেনি। কাজেই আপনি আমার কথা শুনুন, আমি আপনাকে সরল পথ বাতলে দেব। বাবা! শয়তানের ইবাদত করবেন না। নিশ্চয়ই শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। বাবা! আমার আশঙ্কা দয়াময়ের পক্ষ থেকে কোনো শাস্তি আপনাকে স্পর্শ করবে। ফলে আপনি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবেন। -সূরা মারইয়াম (১৯) : ৪২-৪৫

মূর্তিপূজার অসারতা তুলে ধরার পর আরও বললেন, বাবা! আমি যা জানি, আপনি তা জানেন না। আমার কাছে সঠিক জ্ঞান এসেছে। আপনি আমার কথা শুনুন, আমি আপনাকে সরল সঠিক পথ দেখাব। হেদায়েত ও মুক্তির পথ দেখাব। কিন্তু পিতা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না। বরং বলল, 'ইবরাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ? তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তাহলে আমি তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করব।' আরও বলল, 'তুমি আমার থেকে দূরে চলে যাও।' পিতা ঈমানের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করায় ইবরাহীম আলাইহিস সালাম রাগ করলেন না। বরং আরও দরদের সাথে বললেন, 'ঠিক আছে, আমি বিদায় নিচ্ছি। তবে আমি আপনাদের জন্য আমার রবের কাছে দুআ করব।'

তাঁর সম্প্রদায়ের যারা তারকারাজি ও চাঁদ-সূর্যের উপাসনা করত, তিনি তাদেরকে এগুলোর উদয়াস্ত দেখিয়ে বললেন, 'যেগুলো নিজেরাই অন্যের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং এক নির্দিষ্ট সময় ও বলয়ে আবদ্ধ সেগুলো কীভাবে উপাস্য হতে পারে! তোমরা যা করছ তা শিরক। আমি তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত। যিনি এই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁরই অভিমুখী।'

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিজ সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলার দিকে দাওয়াত দেওয়ার পাশাপাশি একথাও ঘোষণা করেছিলেন, আল্লাহকে ছাড়া তোমরা যাদের উপাসনা কর, আমি সেগুলোকে অস্বীকার করি। সেগুলোর সঙ্গে আমার শত্রুতা। আমি শুধু তাঁরই ইবাদত করব, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং হেদায়েত দান করেছেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও এক আল্লাহর ইবাদত না করবে, ততক্ষণ তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো সখ্য নেই।' কুরআনে এক জায়গায় বলা হয়েছে, ইবরাহীমের সঙ্গে সম্পর্কের তারাই বেশি হকদার, যারা ইবরাহীম এবং এই শেষ নবীর অনুসরণ করে ঈমান আনবে।

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কওম প্রথমে তার কথা অস্বীকার করে বলল, 'তুমি কি আমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছ, না পরিহাস করছ?' কিন্তু পরে তারা তাঁর কথার সত্যতা ও বাস্তবতা বুঝতে পেরে নির্বাক হতে বাধ্য হল।

একপর্যায়ে বাদশাহর কানেও ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দাওয়াতের কথা পৌঁছল। তখন বাদশাহর সাথে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যে কথা হয়েছিল, কুরআনে তা ইরশাদ হয়েছে এভাবে-

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهِمَ فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَ يُمِيْتُ
قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَ اُمِيْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهِمُ فَاِنَّ اللهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ۜ
فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ؕ وَ اللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

তোমরা কি সেই ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করেছ, যাকে আল্লাহ রাজত্ব দান করার কারণে সে নিজ প্রতিপালকের (অস্তিত্ব) সম্পর্কে ইবরাহীমের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়? যখন ইবরাহীম বলল, আমার প্রতিপালক তিনিই, যিনি জীবনও দান করেন এবং মৃত্যুও! তখন সে বলতে লাগল, আমিও জীবন দিই এবং মৃত্যু ঘটাই! ইবরাহীম বলল, আচ্ছা! তাহলে আল্লাহ তো সূর্যকে পূর্ব থেকে উদিত করেন, তুমি তা পশ্চিম থেকে উদিত কর তো! এ কথায় সে কাফির নিরুত্তর হয়ে গেল। আর আল্লাহ (এরূপ) জালিমদেরকে হেদায়েত করেন না। -সূরা বাকারা (২) : ২৫৮

বাদশাহ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে বলল, তুমি যে মাবুদের কথা বলছ, তার পক্ষে প্রমাণ পেশ কর। তিনি বললেন, আমার রব জীবন ও মৃত্যু দান করেন। বাদশাহ বলল, আমিও জীবন ও মৃত্যু দান করতে পারি। এই বলে সে দুজনকে ডেকে তাদের একজনকে হত্যা করল, আর অপরজনকে ছেড়ে দিল। যদিও বাদশাহর এ কাজ জীবন ও মৃত্যু দান নয়। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার অযৌক্তিক দাবি ও প্রমাণ খণ্ডন করে এখানেই তাকে লা-জবাব করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি এ নিয়ে কথা না বলে বরং এমন একটি বিষয় পেশ করলেন, যাতে সে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যায়। তিনি বললেন, আমার রব পূর্ব দিক থেকে সূর্য উদিত করেন, তুমি পশ্চিম দিক থেকে উদিত করে দেখাও। এবার বাদশাহ পুরোপুরি নিরুত্তর ও সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে গেল।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় যদিও তাঁর দাওয়াতের পদ্ধতির কাছে পরাস্ত ও নিরুত্তর হল, কিন্তু তারা ঈমান গ্রহণে ইচ্ছুক ছিল না। বরং নিজেদের ভ্রষ্টতায় অটল থেকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। নিজেদের এবং উপাস্যদের লজ্জা ও অন্তসারশূন্যতা ঢাকার জন্য ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে অগ্নিকুণ্ডকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্য ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক বানিয়ে দিলেন। তিনি আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েও নিরাপদে বের হয়ে এলেন।

এভাবেই কুরআনে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দাওয়াতের পদ্ধতি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পদ্ধতি এক অনন্য আদর্শ। একজন নিতান্ত সাধারণ মানুষও তাঁর দাওয়াত থেকে আসল সত্যতা অনায়াসেই বুঝতে পারবে।

তিনি সাধারণ কথাবার্তায় এমন বাস্তব ও পরিস্ফুট বিষয়গুলো উপস্থাপন করলেন, যা তাদের জন্য অধিক বোধগম্য এবং বেশি প্রভাবক।

যদিও তাঁর সম্প্রদায় ঈমান গ্রহণ করেনি, সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। কারণ তারা বাপ-দাদার মতবাদ ছেড়ে ঈমান গ্রহণ করতে ইচ্ছুকই ছিল না। এটা তাদের নেতিবাচক মানসিকতা এবং দুর্ভাগ্য।

আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচে ফলপ্রসূ উপায় এটাই; এমন পন্থায় উপস্থাপন করা, যা অধিক বোধগম্য এবং বেশি প্রভাবক। দাঈদের জন্য ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দাওয়াতের পদ্ধতিতে এটি অন্যতম বড় শিক্ষা।

আরেকটি বড় শিক্ষা হল, তিনি কখনো নিজ সম্প্রদায়ের উপর অভিসম্পাত করেননি। তাঁর সম্প্রদায় নিজেদের উপাস্যদের অক্ষমতা স্বীকার করেও ঈমান আনবে না বলে গোঁ ধরেছিল। উপরন্তু তাঁরা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়ার ন্যক্কারজনক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। তবুও তিনি তাদের বিরুদ্ধে কোনো বদদুআ করলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেও এ বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। আরবের কাফেররা তাঁকে যারপরনাই কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু একবারের জন্য তিনি তাদেরকে অভিশাপ দেননি।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দাওয়াতে আরেকটি শিক্ষা হল, তাঁর ধৈর্য। দীর্ঘ সময়ব্যাপী তিনি নিজ সম্প্রদায়কে এক আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিলেন, কিন্তু প্রায় সকলেই তাঁর দাওয়াত কবুল করল না। তবুও তিনি ধৈর্য ধরে দাওয়াত দিয়ে গেছেন। বিরক্ত হননি। দাওয়াত এমনই এক কাজ, যাতে প্রচ- ধৈর্য এবং আপন কাজে নিরন্তর অবিচলতা আবশ্যক।

চতুর্থ আরেকটি বিষয় হল, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভাষা ও ব্যবহারের শালিনতা ও শিষ্টতা। পিতাকে দাওয়াত দেওয়ার সময় তাঁর উপস্থাপনা দেখুন। কী মধুর সম্ভাষণ! কতই না কল্যাণকামিতার প্রকাশ! ওদিকে তাঁর সম্প্রদায় নিজেদের কুফুরিতে অটল। উপরন্তু তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তবুও তাঁর কোনো কটূক্তি নেই। ক্ষোভ নেই। কেমন দরদমাখা ভাষায় তাদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন। দাঈদের এ এক অত্যাবশ্যকীয় গুণ।

এ ছাড়া ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দাওয়াতে দাঈদের জন্য আরও অনেক শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা সবিস্তারে কুরআন কারীমে তাঁর দাওয়াতের কথা তুলে ধরেছেন। যার অনুসরণ আমাদের দাওয়াতকে আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ করবে। সেইসঙ্গে কুরআন কারীমে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যেসব গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে, তাও নিজেদের মধ্যে ধারণ করা জরুরি।

তিনি ছিলেন সর্বদা আল্লাহ অভিমুখী। কুরআন কারীমে তাঁর বহু দুআ বর্ণিত হয়েছে। তাঁর ছিল সবধরনের শিরকমুক্ত বিশুদ্ধ অন্তর। স্বভাবে অতিশয় সহনশীল এবং অধিক আল্লাহভীত ছিলেন। দাঈদের মধ্যে এসকল গুণ থাকা অত্যন্ত জরুরি।

সর্বোপরি সকল মুসলমানের জন্যই মুসলিম মিল্লাতের পিতা খলীলুল্লাহ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ব্যক্তিসত্তায় রয়েছে অনন্য আদর্শ। আল্লাহ তাআলার হুকুমের সম্মুখে তিনি থাকতেন সদা অনুগত ও সর্বোচ্চ সমর্পিত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হযরত ইবরাহীম আলাআহিস সালাম তাঁর বংশধরের মধ্যে যেমন আত্মসমর্পিত এক উম্মত প্রেরনের দোয়া করেছিলেন এমন উম্মাত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম

হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম এর জন্ম

হজরত ইব্রাহিম আ. অনেক দিন পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন।তিনি আল্লাহর কাছে সন্তানের জন্য দোয়া করতে থাকলেন। আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল করলেন এবং তাকে সন্তান দিলেন। হজরত ইব্রাহিম আ.দ্বিতীয় স্ত্রী হজরত হাজেরা রা.গর্ভবতী হলেন।হযরত সারা রা.যখন এটা জানতে পারলেন তখন তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হলেন। তিনি হজরত হাজেরাকে নানা ভাবে উত্ত্যক্ত করলেন।হজরত হাজেরা বাধ্য হয়ে তার কাছ থেকে চলে গেলেন। ফেরেস্তারা হজরত হাজেরাকে এক ঝর্ণার কাছে পেলেন। ফেরেস্তারা তাকে ফিরে যেতে বললেন এবং সারার খেদমতগারে থাকতে বললেন। এবং তাকে একজন পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলেন। তার নাম রাখতে বললেন ইসমাইল। (কিতাব কাসাসুল কুরআন)

হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম এর কুরবানির ঘটনা

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দোয়ার ফসল হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম। তিনি আল্লাহর কাছে নেক সন্তানের দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর এ দোয়া কবুল করে সহনশীল এক ছেলে সন্তান দান করেছিলেন। যিনি হলেন হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম।

– হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের প্রার্থনা

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

’হে আমার প্রভু! আমাকে এক সৎ ছেলে সন্তান দান করুন।’ (সুরা সাফফাত : আয়াত ১০০)

– সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

'সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম।' (সুরা সাফফাত : আয়াত ১০১)
আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামকে সহনশীল হিসেবে উল্লেখ করেন। সত্যিই হজরত ইসমাইল ছিলেন সহনশীল। কেননা তিনি তার কথা ও কাজে আল্লাহর দেয়া গুনে নিজেকে রাঙিয়ে ছিলেন। সে ঘটনাও বর্ণনা করা হয়েছে কুরআনে।

কুরবানির নির্দেশ ও বাস্তবায়নের ঘটনার বর্ণনা

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

অতপর যখন সে পিতার সঙ্গে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহিম তাকে বলল, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে জবেহ করছি। এখন তোমার অভিমত কি? সে (ইসমাইল) বলল, হে পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে সবরকারী (সহনশীল) পাবেন।' (সুরা সাফফাত : আয়াত ১০২)

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ

'যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহিম তাকে জবেহ করার জন্যে শায়িত করল।' (সুরা সাফফাত : আয়াত ১০৩)

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ

'তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, হে ইবরাহিম!' (সুরা সাফফাত : আয়াত ১০৪)

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম স্বপ্নে কুরবানির নির্দেশ পেয়ে যখন বাস্তবায়ন করলেন তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন-

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে! আমি এভাবেই সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।' (সুরা সাফফাত : আয়াত ১০৫)

আল্লাহ তাআলা কর্তৃক কুরবানির এ নির্দেশ ছিল হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্য তাঁর নৈকট্য অর্জনের এক মহাপরীক্ষা। আল্লাহ তাআলা বলেন-

اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِينُ

নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা।' (সুরা সাফফাত : আয়াত ১০৬)

কুরবানির পশু মহান আল্লাহর অপূর্ব দান। হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের পরিবর্তে তিনি জবেহের জন্য তাৎক্ষনিক এক জন্তু পাঠিয়ে তা জবেহ করার ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

আমি তার (ইসমাইল আলাইহিস সালামের) পরিবর্তে দিলাম জবেহ করার জন্যে এক মহান জন্তু।' (সুরা সাফফাত : আয়াত ১০৭)

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের প্রতি শান্তি

কুরবানির ঘটনায় উত্তীর্ণ হওয়ায় হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের প্রতি শান্তির ঘোষণা দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ - سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ - كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

'আমি তার জন্যে এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিয়েছি যে, ইবরাহিমের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।' (সুরা সাফফাত : আয়াত ১০৮-১১০)

সুতরাং মুমিন মুসলমানের কুরবানি হবে শুধু আল্লাহর জন্য। এটি তাকওয়া সমৃদ্ধ অনন্য ইবাদত। পরিশুদ্ধ নিয়ত ছাড়া মানুষের এ কুরবানি গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা কুরবানির পশু রক্ত, গোশত কোনো কিছুই মহান আল্লাহর কাছে পৌঁছে না। মহান আল্লাহ বলেন-

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, কিন্তু পৌঁছে তাঁর কাছে তোমাদের মনের তাকওয়া। এমনিভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা কর এ কারণে যে, তিনি তোমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।' (সুরা হজ : আয়াত ৩৭)

....

হজরত ইসহাক আলাইহিস সালাম

পরিচয়ঃ হযরত ইসহাক ছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী সারাহ-এর গর্ভজাত একমাত্র পুত্র। তিনি ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর চৌদ্দ বছরের ছোট। এই সময় সারাহর বয়স ছিল ৯০ এবং ইবরাহীমের বয়স ছিল ১০০। অতি বার্ধ্যক্যের হতাশ বয়সে বন্ধ্যা নারী সারাহ্-কে ইসহাক জন্মের সুসংবাদ নিয়ে ফেরেশতা আগমনে করে। পবিত্র কুরআনে আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে এ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে সূরা হূদ ৭১-৭৩ আয়াতে, হিজর ৫১-৫৬ আয়াতে এবং যারিয়াত ২৪-৩০ আয়াতে। আল্লাহ ইসমাঈলকে দিয়ে যেমন মক্কার জনপদকে তাওহীদের আলোকে উদ্ভাসিত করেছিলেন, তেমনি ইসহাক্বকে নবুঅত দান করে তার মাধ্যমে শাম-এর বিস্তীর্ণ এলাকা আবাদ করেছিলেন।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় পুত্র ইসহাক্বকে বিয়ে দিয়েছিলেন রাফক্বা বিনতে বাতওয়াঈল -এর সাথে। কিন্তু তিনিও বন্ধ্যা ছিলেন। পরে ইবরাহীমের খাছ দো'আর বরকতে তিনি সন্তান লাভ করেন এবং তাঁর গর্ভে ঈছ ও ইয়াকূব নামে পরপর দু'টি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে। তার মধ্যে ইয়াকূব নবী হন। পরে ইয়াকূবের বংশধর হিসাবে বনু ইস্রাঈলের হাজার হাজার নবী পৃথিবীকে তাওহীদের আলোকে আলোকিত করেন। কিন্তু ইহুদী নেতাদের হঠকারিতার কারণে তারা আল্লাহর গযবে পতিত হয় এবং অভিশপ্ত জাতি হিসাবে নিন্দিত হয়। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

সন্তানঃ ইয়াকুব আঃ

বিশেষ ঘটনাঃ আল্লাহর হুকুমে কয়েকজন ফেরেশতা মানুষের রূপ ধারণ করে প্রথমে হযরত ইবরাহীমের বাড়ীতে পদার্পণ করলেন। তিনি তাদেরকে মেহমানদারীর জন্য একটা আস্ত বাছুর গরু যবেহ করে ভুনা করে তাদের সামনে পরিবেশন করলেন। কিন্তু তারা তাতে হাত দিলেন না। এতে ইবরাহীম (আঃ) ভয় পেয়ে গেলেন (হূদ ১১/৬৯-৭০)। কেননা এটা ঐ সময়কার দস্যু-ডাকাতদেরই স্বভাব ছিল যে, তারা যে বাড়ীতে ডাকাতি করত বা যাকে খুন করতে চাইত, তার বাড়ীতে খেত না। ফেরেশতাগণ নবীকে অভয় দিয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমরা এসেছি অমুক শহরগুলি ধ্বংস করে দিতে। ইবরাহীম একথা শুনে তাদের সাথে 'তর্ক

জুড়ে দিলেন’ (হূদ ১১/৭৪) এবং বললেন, ‘সেখানে যে লূত আছে। তারা বললেন, সেখানে কারা আছে, আমরা তা ভালভাবেই জানি। আমরা অবশ্যই তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করব, তবে তাঁর স্ত্রী ব্যতীত। সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ (আনকাবূত ২৯/৩১-৩২)। অতঃপর তারা ইবরাহীম দম্পতিকে ইসহাক-এর জন্মের সুসংবাদ শুনালেন।

বিবি সারা ছিলেন নিঃসন্তান। অতি বৃদ্ধ বয়সে এই সময় তাঁকে হযরত ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হয়। শুধু তাই নয় ইসহাকের পরে তার ঔরসে যে ইয়াকূবের জন্ম হবে সেটাও জানিয়ে দেওয়া হ’ল (হূদ ১১/৭১-৭২)। উল্লেখ্য যে, ইয়াকূবের অপর নাম ছিল ‘ইস্রাঈল’ এবং তাঁর বংশধরগণকে বনু ইস্রাঈল বলা হয়। যে বংশে হাজার হাজার নবীর আগমন ঘটে।

মৃত্যুঃ ইসহাক্ব (আঃ) ১৮০ বছর বয়স পান। তিনি কেন‘আনে মৃত্যুবরণ করেন এবং পুত্র ঈছ ও ইয়াকূবের মাধ্যমে হেবরনে পিতা ইবরাহীমের কবরের পাশে সমাহিত হন। স্থানটি এখন ‘আল-খালীল’ নামে পরিচিত’।

…………………

হজরত ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)

হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালম এর পরিচয়

হযরত ঈসা আলাই সালাম এর দুই যমজ পুত্র ইস ও ইয়াকুব। এর মধ্যে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ছোট ছিলেন আর তিনি নবী হন। ইয়াকুবের অপর নাম 'ইসরাইল'। যার অর্থ আল্লাহর বান্দা। নবীর কোণের মধ্যে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ও মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুটি করে নাম ছিল। মোহাম্মদ (সাঃ) এর অপর নাম 'আহমদ'।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন -
وَاِذْ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًۢا
بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ
স্মরণ কর, যখন মারইয়ামের পুত্র ‘ঈসা বলেছিল, ‘হে বানী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর রসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি একজন রসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম আহমাদ।’ অতঃপর সে [অর্থাৎ ‘ঈসা (আঃ) যাঁর সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে ছিলেন সেই নবী] যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসল, তখন তারা বলল, ‘এটা তো স্পষ্ট যাদু।’(সুরা সফ,আয়াত:৬)

হযরত ইয়াকুব আ. এর সন্তান-সন্ততি

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বারো জন পুত্র সন্তানের কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। বাইবেলে বারো জন পুত্র সন্তান এবং কয়েকজন কন্যা সন্তানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মেয়েদের মধ্যে শুধু একজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকেরই সন্তান-সন্ততি হয় এবং বংশ বিস্তার লাভ করে।

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের উপাধি ছিল 'ইসরাইল'। তাই বারোটি পরিবার সবাই 'বনি ইসরাঈল' নামে খ্যাত হয়.বারো পুত্রের মধ্যে দশ জন জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের প্রথম স্ত্রী লাইয়া বিনতু লাইয়ানের গর্ভে জন্ম লাভ করেন। তার মৃত্যুর পর হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম লাইয়ার ভগিনী রাহিলাকে বিবাহ করেন। রাহীলের গর্ভে দুই পুত্র ইউসুফ ও বিনয়ামিন জন্মগ্রহণ করেন। তাই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর একমাত্র সহোদর ভাই ছিলেন বিনয়ামিন। ইউসুফ আ.এর মা বিনয়ামিনের জন্মের পর মৃত্যু বরন করেন।

হযরত ইয়াকুব আ. এর স্বপ্ন

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁর মামার বাড়ি ইরাকের হারান যাওয়ার পথে রাত হয়ে গেলে কিনআনের অদূরে এক স্থানেবএকটি পাথরের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন । সে অবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখেন, একদল ফেরেশতা সেখান থেকে আসমানে উঠানামা করছেন। এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন -

space, page-83

অতিসত্বর আমি তোমার উপর বরকত নাযিল করব, তোমার সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে দেবো,তোমাকে ও তোমার উপর তোমার উত্তরসূরিদের এই মাটির মালিক করে দেব।

তিনি ঘুম থেকে উঠে খুশি মনে মানুষ করলেন, যদি নিরাপদে নিজ পরিবারের কাছে ফিরে আসতে পারেন তাহলে এই স্থানে তিনি একটি ইবাদত খানা প্রতিষ্ঠা করবেন এবং আল্লাহ তাকে যে রুজি দেবেন তার এক দশমাংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করবেন। অতঃপর তিনি ওি স্থানে পাথরটির উপর একটি চিহ্ন একে দিলেন, যাতে তিনি ফিরে এসে সেটাকে চিনতে পারেন। তিনি স্থানটির নাম রাখলেন بيت ايل অর্থাৎ আল্লাহর ঘর। এই স্থানেই বর্তমানে বায়তুল মুকাদ্দাস অবস্থিত,যা পরবর্তীতে প্রায় এক হাজার বছর পর হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম পুনর্নির্মাণ করেন।

মূলত এটাই ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস এর মূল ভিত্তি ভূমি,যা কাবাগৃহের চল্লিশ বছর পর ফেরেশতাদের দ্বারা কিংবা আদমপুত্র দের হাতে কিংবা হযরত ইসহাক আ. কর্তৃক নির্মিত হয়।

নিশ্চহ্ন হওয়ার কারণে আল্লাহ হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে স্বপ্নে দেখান এবং তার হাতে সেখানে পুনরায় ইবাদত খানা তৈরি হয়।

তাওয়াক্কুলের পরীক্ষায় হযরত ইয়াকুব আ. এর সফলতা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে সবচেয়ে নিকটবর্তী মানুষ হচ্ছেন নবী-রাসূলগণ। তারা আল্লাহ তা'আলার মনোনীত বান্দা। আল্লাহর নিকট যে বেশি প্রিয় আল্লাহ তাকে বেশি পরীক্ষা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রশ্ন করা হলো, মানুষের মাঝে কার বিপদের পরীক্ষা সবচেয়ে বেশি কঠিন হয়?নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন বললেন, নবীদের বিপদের পরীক্ষা। তারপর নেককারদের পরীক্ষা। এরপর যারা নেককার তাদের বিপদের পরীক্ষা। মানুষকে তার ধর্মানুরাগের অনুপাত অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। (তিরমিজি শরিফ,মিশকাতুল মাসাবিহ,হাদিস -২৪৫৪)

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে থাকেন।আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামও আল্লাহর এই পরীক্ষার বাহিরে ছিলেন না। পরীক্ষায় তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন এবং মহান আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা রেখে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ ও পুরস্কৃত হয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের পরীক্ষা ও সাফল্যের পূর্ণ ঘটনা বিবৃত হয়েছে। তার ঔরসে মোট ১২ জন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে প্রচন্ড ভালোবাসতেন। তবে হিংসা পরায়ণ বৈমাত্রিক ভাইগণ সেটা মেনে নিতে না পেরে পিতাকে কৌশলে রাজি করে ইউসুফকে হত্যার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে নিয়ে যায়।সন্ধ্যায় ভাইয়েরা প্রমাণস্বরূপ রক্তমাখা জামা পিতা কে দেখিয়ে বলল, ইউসুফকে বাঘে খেয়েছে। কিন্তু অক্ষত জামা দেখে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বললেন

بَلۡ سَوَّلَتۡ لَـكُمۡ اَنۡفُسُكُمۡ اَمۡرًا‌ؕ فَصَبۡرٌ جَمِيۡلٌ‌ؕ وَاللّٰهُ الۡمُسۡتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوۡنَ ‏ ١٨ َ-

এটা কখনোই নয়; বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং, এখন ধৈর্য ধরাই আমার জন্য উত্তম। তোমরা যা বর্ণনা করছ সে সম্পর্কে আল্লাহ আমার সাহায্য স্থল। (সুরা ইউসুফ, আয়াত:১৮)

তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, ইউসুফকে কোথাও রেখে আসা হয়েছে। পুত্রদের সঙ্গে কোনরূপ খারাপ প্রতিক্রিয়া না করে পিতৃসুলভ আচরণ করেছিলেন এবং ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।

পিতা পুত্রের বিচ্ছেদের সময়কাল দীর্ঘ ৪০ বছরের মতো ছিল। পরের দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের অসহনীয় যাতনা সহ্য করতে হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে হারানো পুত্র ইউসুফ মিশরের বাদশা হন। কিন্তু হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বাদশা হওয়ার সত্ত্বেও পিতাকে নিজের অবস্থার কথা জানাননি। সম্ভবত এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে, যাতে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর পরীক্ষা দৃঢ় হয়।

এক সময় মিশরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে হযরত ইয়াকুব আলাইহি সালাম খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করার জন্য পুত্রদের মিশর পাঠালেন। তবে তিনি কনিষ্ঠপুত্র বিনয়ামিনকে নিজের কাছে রেখে ছিলেন।কেননা ইউসুফ নিখোঁজের পর বিনয়ামিন তার ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।
প্রথম যাত্রায় তারা মিশর পৌঁছালে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার বাইরের চিনতে পারেন। নিজের পরিচয় গোপন রেখে পরবর্তীতে বিনয়ামিনকে সঙ্গে আনতে বলেন। নিজ ভাইদের এত কাছে পেয়েও তিনি পিতার নিকট তার খবর পৌঁছাননি। হয়তো এখানে হযরত আলাইহিস সালামের পরীক্ষার পূর্ণতা দেওয়াই মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল।
বিস্তারিত ঘটনা প্রকাশ করে পরের বছর মিশর ভ্রমণের সময় তারা পিতার নিকট আবেদন করলেন, বিনয়ামিনকে সঙ্গে নিতে। কিন্তু হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ছেলেদের বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কেননা এভাবেই একদিন তারা ইউসুফ কে তার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। বাহ্যিকভাবে তিনি পুত্রদের অঙ্গীকার নিলেন, তারা বিনীয়ামিনকে নিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু তিনি সন্তানদের শপথের উপর নির্ভর করেননি;বরং আল্লাহর উপরে ভরসা করেছেন এবং মানুষের কুদৃষ্টি থেকে সন্তানদের রক্ষা করতে না পারার অপারগতা স্বীকার করে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম পুত্রদের কে বললেন-
وَمَآ اُغۡنِیۡ عَنۡکُمۡ مِّنَ اللّٰہِ مِنۡ شَیۡءٍ ؕ اِنِ الۡحُکۡمُ اِلَّا لِلّٰہِ ؕ عَلَیۡہِ تَوَکَّلۡتُ ۚ وَعَلَیۡہِ فَلۡیَتَوَکَّلِ الۡمُتَوَکِّلُوۡنَ ٦٧
আল্লাহর কোন বিধান থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। নির্দেশ আল্লাহরই চলে। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি আর ভরসা কারীদের উচিত তাঁর ওপর ভরসা করা। (সুরা ইউসুফ,আয়াত:৬৭)

অতঃপর তারা পিতার উপদেশ মতো নগরে প্রবেশ করল।কিন্তু রসদ- সামগ্রী নিয়ে ফেরার মুহূর্তে চুরির অভিযোগে বিনয়ামিন নাটক হন। মুফাসসির গণ বলেন, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের খাতিরে আল্লাহ বিনয়ামিনকে নাটকের কৌশল করেন ;যাতে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের পরীক্ষার বিভিন্ন স্তর গুলোর পূর্ণতা পায়। বিনয়ামিনকে আটকের কাজটি মহান আল্লাহর নির্দেশে তাঁরই অপার রহস্যের বহিঃপ্রকাশ।

অনেক চেষ্টা করেও বিনয়ামিনকে নিতে ব্যর্থ হয়ে পিতার নিকট ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেন। ঘটনা শুনে তিনি বলেন -

قَلَ بَلۡ سَوَّلَتۡ لَـكُمۡ اَنۡفُسُكُمۡ اَمۡرًا‌ؕ فَصَبۡرٌ جَمِيۡل

কিছুই না, তোমরা মনগড়া একটি কথা নিয়েই এসেছ। এখন ধৈর্যধারণই উত্তম। (সুরা ইউসুফ আয়াত:৮৩)

এ পর্যায়ও হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিজের পরিচয় প্রকাশ করেননি। অধিকন্ত বিনয়ামিনকে আটকে রেখেছেন। ফলের দ্বিতীয় বারের মতো হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের পুত্র বিচ্ছেদের ব্যথায় মোহ্যমান হয়ে পড়েন। সম্ভবত এখানে আল্লাহ তাআলা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে অনেক বেশি কল্যাণ দিতে চেয়েছিলেন। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বিপদ যখন মারাত্মক হবে প্রতিদান তত মহান হবে। (ইবনু মাজাহ,সহিহুল জামি:২১১)

অতঃপর তিনি পুত্রদের সঙ্গে বাক্য আলাপ পরিত্যাগ করে সৃষ্টিকর্তার কাছে ফরিয়াদ জানাতে লাগলেন। কুরআনে এরশাদ হয়েছে -

وَابۡيَـضَّتۡ عَيۡنٰهُ مِنَ الۡحُـزۡنِ فَهُوَ كَظِيۡمٌ-

আর তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল এবং অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট।(সুরা ইউসুফ,আয়াত :৮৪)

দুঃখ ও বিষাদে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নির্বাক হয়ে যান। নিজের মনোবেদনা কারো কাছে প্রকাশ করতেন না। ক্রোধে পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি সংবরণ করেছেন।

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এতদিন পর ছেলেদের আদেশ করলেন, ইউসুফ ও তাঁর ভাইয়ের সন্ধান করতে। উভয়কে খোঁজ করার জন্য মিশরই সাব্যস্ত হলো। মিশর পৌঁছে ভাইয়েরা ইউসুফের সামনে আতর ভাবে কথা বলা শুরু করলো। তাঁরা তাদের দরিদ্র ও নিঃয়স্বতার কথা প্রকাশ করল। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদের অবস্থা শুনে নিজেকে রোধ করতে না পেরে পরিচয় প্রকাশ করে দেন। ভাইয়েরা লজ্জিত হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চান। অতঃপর ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন -

اِذۡهَبُوۡا بِقَمِيۡصِىۡ هٰذَا فَاَلۡقُوۡهُ عَلٰى وَجۡهِ اَبِىۡ يَاۡتِ بَصِيۡرًا‌ ۚ وَاۡتُوۡنِىۡ بِاَهۡلِكُمۡ اَجۡمَعِيۡنَ

তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও আর তা আমার পিতার মুখমন্ডলে রাখ, তিনি দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠবেন, আর তোমাদের পরিবারের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো।’(সুরা ইউসুফ আয়াত :৯৩)

পবিত্র কুরআনে আরও এরশাদ হয়েছে -

فَلَمَّآ اَنۡ جَآءَ الۡبَشِيۡرُ اَلۡقٰىهُ عَلٰى وَجۡهِهٖ فَارۡتَدَّ بَصِيۡرًا ۚ
অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা পৌঁছালো, সে জামাটি তার মুখে রাখল। অমনি তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। (সুরা ইউসুফ, আয়াত:৯৬)

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম আওলাদ ও তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রস্তুত হয়ে মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন -

وَرَفَعَ اَبَوَيۡهِ عَلَى الۡعَرۡشِ وَخَرُّوۡا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ

আর তিনি পিতা-মাতাকে সিংহাসনের ওপর বসালেন এবং তাঁরা সবাই তাঁর সামনে সিজদাবনত হলো। (সুরা ইউসুফ, আয়াত:১০০)

আর এভাবেই হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিনিয়ত তিনি আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। সুতরাং আমাদেরও উচিত হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম থেকে ধৈর্যের শিক্ষা নেওয়া এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা রাখা।

হজরত ইয়াকুব আ.এর অসিয়ত

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম কিনআন থেকে মিশরে আসার সতেরো বছর মতান্তরে ২৩ বছরের অধিক কাল পর তার মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তিনি সন্তানদের কাছে ডেকে কিছু অসিয়ত করেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের অসিয়ত ছিলো তার সন্তানদের প্রতি ইসলামের।ইয়াকুব আলাইহিস সালামেরও স্বীয় পুত্রের প্রতি অসিয়ত ছিলো ইসলামের । এজন্য ইব্রাহিম তার অনুসারীদের নাম রেখেছিলেন মুসলিম বা আত্মসমর্পিত।

وَجَاهِدُوۡا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجۡتَبٰىكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِى الدِّيۡنِ مِنۡ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيۡكُمۡ اِبۡرٰهِيۡمَ
هُوَ سَمّٰىكُمُ الۡمُسۡلِمِيۡنَ ۙ مِنۡ قَبۡلُ وَفِىۡ هٰذَا لِيَكُوۡنَ الرَّسُوۡلُ شَهِيۡدًا عَلَيۡكُمۡ وَتَكُوۡنُوۡا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۖ
فَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعۡتَصِمُوۡا بِاللّٰهِ هُوَ مَوۡلٰٮكُمۡ ۚ فَنِعۡمَ الۡمَوۡلٰى وَنِعۡمَ النَّصِيۡرُ

আর আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে বেছে নিয়েছেন। দ্বীনের ভিতর তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা চাপিয়ে দেননি। এটাই তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন, আল্লাহ তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' পূর্বেও, আর এ কিতাবেও (ঐ নামই দেয়া হয়েছে) যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা সাক্ষী হও মানব জাতির জন্য। কাজেই তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত দাও আর আল্লাহকে আঁকড়ে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। কতই না উত্তম অভিভাবক আর কতই না উত্তম সাহায্যকারী!(সুরা হজ,আয়াত:৭৮)

হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার অপর প্রার্থনায় মুসলিম এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে -

فَمَنۡ تَبِعَنِىۡ فَاِنَّهٗ مِنِّىۡ ۚ وَمَنۡ عَصَانِىۡ فَاِنَّكَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ

যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য করল, তার বিষয়ে আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা ইব্রাহীম, আয়াত :৩৬)

বোঝা গেল হযরত ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক ও ইয়াকুব আলাইহিমুস সালাম নবীগনপর ধর্ম ছিল ইসলাম।তাদের মূল দাওয়াত ছিল তাওহীদ তথা আল্লাহর ইবাদতে একত্ব।শুধুমাত্র আল্লাহর স্বীকৃতির মধ্যে তার সীমাবদ্ধ ছিল না ; বরং তার বিধানের প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ এর মধ্যেই তার যথার্থতা নিহিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের অনুসারী হওয়ার দাবিদার ইহুদী-নাছারা গন তাদের নবীগণের সেই ওসিয়ত ভুলে যায় এবং অবাধ্যতা ও হঠকারিতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়ে তারা আল্লাহর অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট জাতিতে পরিণত হয়।

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ওসিয়তে এটা প্রমাণিত হয়, সন্তানদের জন্য দুনিয়াবি ধন- সম্পদ রেখে যাওয়ার চাইতে তাদেরকে ঈমানের সম্পদে সম্পদশালী হওয়ার অসিয়ত করে যাওয়াই হল দূরদর্শী পিতার প্রধানতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(বিতাব:কাসাসুল আম্বিয়া)

হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম

হজরত ইউসুফ আ. এর ঘটনা-

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের নামে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা একটি সূরার নাম করণ করেছেন।সম্পূর্ণ সূরায় আল্লাহ তায়ালা নবী ইউসুফ আলাইসিস সালাম এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এই ঘটনাকে আল্লাহ তায়ালা চমৎকার ঘটনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুরাই বর্ণিত হিকমা, ওয়াজ, আদব সবকিছু এক অনন্য আভায় আলোকিত।

পবিত্র কুরআনে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা এভাবে শুরু হয়েছে -

قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ٤ قَالَ
يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ٥ وَكَذٰلِكَ
يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى
اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

স্মরণ করো, ইউসুফ তার পিতাকে বলেছিল, হে আমার পিতা, আমি তো দেখেছি একাদশ নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্রকে। দেখেছি এদেরকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়।

সে বলল হে আমার বৎস, আমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা করো না ;করলে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে।শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। এভাবে প্রতিপালক

তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন এবং তোমার প্রতি ও ইয়াকুবের পরিবার পরিজনের প্রতি তার অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন,যেভাবে তিনি এটা পূর্বে পূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম ও ইসহাকের প্রতি । নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। (সূরা ইউসুফ, আয়াত :৪-৬)

ইউসুফ আলাইহিস সালাম ছিলেন ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ১২ জন পুত্রের মধ্যে সবচেয়ে নম্র ভদ্র, শ্রেষ্ঠ ও সম্মানি।একই সাথে ছিলেন একজন উঁচু তবকার নবী। তিনি ছাড়া ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আর কোন সন্তান নবী হওয়া প্রমাণিত নয়। নবুওয়াতের মহান মর্যাদা একমাত্র তিনিই লাভ করেন।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর স্বপ্ন ব্যাখ্যা ও পরিণতি

ইউসুফ আলাইহিস সালাম তখন খুব ছোট। তিনি স্বপ্ন দেখলেন এগারোটি তারকা ও চন্দ্র সূর্য তাকে সেজদা করছে।তারকা ছিল অন্য ভাইদের প্রতি আর চাঁদ সুরুজ তার পিতা-মাতা। ঘুম থেকে জেগে কিশোর ইউসুফ তার স্বপ্ন পিতা ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে জানালেন। এটা বুঝতে পারলেন তার আদরে ইউসুফ ভবিষ্যতে আলাদা রকম কিছু হতে চলেছে;যা দুনিয়া আখেরাতে তাকে খ্যাতিমান করে তুলবে। তিনি বললেন, দেখো বাবা তোমার এই স্বপ্ন কারো কাছে প্রকাশ করো না। কেননা, এতে তারা তোমার প্রতি হিংসুক হয়ে উঠতে পারে। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বললেন, তোমার রব তোমাকে এই স্বপ্নের মতোই আরো অনেক সূক্ষ্ম বিষয়াদি শেখাবেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা দান করবেন। তোমার ওপর তার পরিপূর্ণ নিয়ামত নাজিল করবেন ইতিপূর্বে যেমন তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম ও ইসহাকের ওপর করেছেন। অর্থাৎ তোমাকে আল্লাহ তায়ালা ভবিষ্যতের নবী নির্বাচিত করবেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস পাওয়া যায় এমন তাকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, শ্রেষ্ঠ মানুষ কে? নবীজির জবাব দিলেন, ইউসুফ ;যিনি নবী ছিলেন তার পিতাও নবী ছিলেন, তার পিতা ও নবী ছিলেন এবং তারও পিতা নবী ছিলেন। অর্থাৎ সে নবী, তার বাবা নবী, তার দাদা নবী, দাদার বাবা ও নবী।

ইবনে জারির ও ইবনু আবি হাতিম তারকা দেখা আয়াতের তাফসীরে, আবু ইয়ালা ও তাদের মুসনাদু জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে একটি জয়িফ বর্ণনা নকল করেন। একবার একজন ইহুদী পন্ডিত নবীজির কাছে এসে বললেন, আপনি কি বলতে পারেন ইউসুফ আলাইহিস সালামকে সেজদা করতে দেখা তারকা গুলোর নাম কি ? নবীজির কিছু সময় চুপ থেকে বললেন, বলে দিতে পারলে তুমি কি মুসলিম হয়ে যাবে? সে বললো, জ্বি। নবীজি বললেন, সেগুলো হলো -জারউয়ান,তারিক,জাইয়াল,জুল-কাতফাইন, কাবিস, ওয়াসসাব, উমুদান,ফালিক,মিসবাহ,দারুহ,জুল-ফার্গ,জিয়া, নুর ইত্যাদি। ইহুদী তখন আল্লাহর কসম খেয়ে

বললেন, তারকা গুলোর নাম এগুলোই। আবু ইয়ালা বলে বলেন, সূর্য দিয়ে পিতা আর চাঁদ দিয়ে মায়ের তাবির করা হয়েছে।

স্বপ্ন দিয়ে শুরু হওয়া ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনাকে কুরআন এভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে -

اۨقۡتُلُوۡا يُوۡسُفَ اَوِ اطۡرَحُوۡهُ اَرۡضًا يَّخۡلُ لَـكُمۡ وَجۡهُ اَبِيۡكُمۡ وَ تَكُوۡنُوۡا مِنۡۢ بَعۡدِهٖ قَوۡمًا صٰلِحِيۡنَ ٩ قَالَ
قَآئِلٌ مِّنۡهُمۡ لَا تَقۡتُلُوۡا يُوۡسُفَ وَاَلۡقُوۡهُ فِىۡ غَيٰبَتِ الۡجُبِّ يَلۡتَقِطۡهُ بَعۡضُ السَّيَّارَةِ اِنۡ كُنۡتُمۡ فٰعِلِيۡنَ ١٠ قَالُوۡا
يٰۤاَبَانَا مَا لَـكَ لَا تَاۡمَنَّا عَلٰى يُوۡسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوۡنَ ١١ اَرۡسِلۡهُ مَعَنَا غَدًا يَّرۡتَعۡ وَيَلۡعَبۡ وَاِنَّا لَهٗ
لَحٰـفِظُوۡنَ ١٢ قَالَ اِنِّىۡ لَيَحۡزُنُنِىۡۤ اَنۡ تَذۡهَبُوۡا بِهٖ وَاَخَافُ اَنۡ يَّاۡكُلَهُ الذِّئۡبُ وَاَنۡـتُمۡ عَنۡهُ غٰفِلُوۡنَ ١٣ قَالُوۡا
لَئِنۡ اَكَلَهُ الذِّئۡبُ وَنَحۡنُ عُصۡبَةٌ اِنَّاۤ اِذًا لَّخٰسِرُوۡنَ

ইউসুফ এবং তার বাইরের ঘটনায় জিজ্ঞাসুদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। স্মরণ করো, তারা বলেছিল, আমাদের পিতার নিকট ইউসুফ এবং তার ভাই আমাদের অপেক্ষা অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একটি সংহত দল;আমাদের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছেন।তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো বা তাকে কোন স্থানে ফেলে আসো,ফলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতি নিবিষ্ট হবে এবং তার পর তোমরা ভাল লোক হয়ে যাবে । এদের মধ্যে একজন বলল, তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না এবং যদি কিছু করতে চাও তবে তাকে কোন কূপের গভীরে নিক্ষেপ করো, যাত্রী দলের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে। তারা বলল, হে আমাদের পিতা, ইউসুফের ব্যাপারে তুমি আমাদেরকে বিশ্বাস করছো না কেন, অথচ আমরা তো তার শুভাকাঙ্ক্ষী? তারা বলল হে আমাদের পিতা, ইউসুফের ব্যাপারে তুমি আমাদের বিশ্বাস করছো না কেন, অথচ আমরা তো তার শুভাকাঙ্ক্ষী? তুমি আগামীকাল তাকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ কর, সে তৃপ্তি সহকারে খাবে ও খেলাধুলা করবে। আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো।সে বলল, এটা আমাকে অবশ্যই কষ্ট দেবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি, তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে, আর তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী থাকবে। তারা বলল, আমরা একটি সংহত দল হওয়ার সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে, তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব। (সূরা ইউসুফ, আয়াত :৭-১৪)

ইউসুফ আ. এর সাথে তাঁর ভাইদের ষড়যন্ত্র

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম পুত্র ইউসুফ ও বিনয়ামিনকে অন্যদের থেকে দেশে মুহাব্বাত করত। মূলত এটি ছিল তার অন্য ভাইদের ভুল ধারণা। এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে বৈমাত্রিক দশ ভাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয়, ইউসুফকে তার পিতার চোখের আড়াল করে ফেলবে। এজন্য তারা সবাই মিলে পরিকল্পনা করে কিভাবে কি করা যায়। এদের মধ্যে প্রথমে একজন প্রস্তাব করে ইউসুফকে হত্যা করার। পরে তাদের একজন পরামর্শ প্রদান করে,যেহেতু

তোমাদের উদ্দেশ্য তাকে বাবার চোখের আড়াল করা -সুতরাং তাকে দূরে কোথাও ফেলে আসো ফিরতে না পারে। এতে সে বেঁচেও থাকলো আবার বাবার চোখের আড়ালও হলো। এরপর তারা জঙ্গলের পাশের কুয়ায় তাকে ফেলে আসার সিটি নিলোে।এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর সবাই মিলে বাবার কাছে গিয়ে ইউসুফকে তাদের সাথে খেলতে দিতে আবদার করে বলল, আমরা অবশ্যই ইউসুফকে কল্যাণ কামনা করি। সুতরাং আগামীকাল আপনি তাকে আমাদের সাথে খেলতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিন। আমরা অবশ্যই তাকে দেখে শুনে রাখবো। প্রত্যুত্তরে নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বললেন, আমি আসলে তাকে আমার চোখের আড়াল করতে আশঙ্কাবোধ করি। পাছে তোমরা তার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ো,আর কোন বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে। জবাবে তারা বলল, এটি কেবলই আপনার একটা অনুমান। আমরা হলাম শক্তিমত্তার পরিপূর্ণ একটি দল ;আমাদের রেখে বাঘ যদি তাকে খেয়ে ফেলে তাহলে আমরা তো কোন কাজেরই নই। আমরা তাহলে ধ্বংস হয়ে যাব। এভাবে বলে কয়ে তারা ইউসুফকে পিতার থেকে নিয়ে গেল। কুরআনে বলেছে -

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِۦ وَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِى غَيَٰبَتِ ٱلْجُبِّ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا
يَشْعُرُونَ ١٥ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ ١٦ قَالُواْ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَٰعِنَا
فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَٰدِقِينَ ١٧ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ
بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ١٨ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ
فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُۥ ۖ قَالَ يَٰبُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَٰمٌ ۚ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ دَرَٰهِمَ مَعْدُودَةٍ
وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ

٢٠وَأَسَرُّوهُ بِضَٰعَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ

এরপর তারা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে একমত হলো, তুমি তাদেরকে তাদের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলে দেবে, যখন তারা তোমাকে চিনবে না।তারা রাত্রে প্রথম প্রহরে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার নিকট এলো। তারা বলল, হে আমাদের পিতা, আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মার পত্রেনকাছে রেখে গিয়েছিলাম , এরপর ন নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে ;কিন্তু তুমি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবে না, যদিও আমরা সত্যবাদী। এরা তার জামাই মিথ্যা রক্ত লেপন করে এনেছিলো।সে বলল, না,তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যেই শ্রেয়,তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য স্থাল।এক যাত্রীদল এলো, তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করলো। সে তার পানির ডোল নামিয়ে দিলো।সে বলে উঠল, কি সুখবর! এই যে এক কিশোর। এরপর তারা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখল। তারা যা করেছিল সেই বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত ছিলেন।এবং তারা তাকে বিক্রি করল স্বল্পমূল্যে -মাত্র কয়েক দিরহাম এর বিনিময়ে ;তারা ছিল তার ব্যাপারে নির্লোভ।(সূরা ইউসুফ, আয়াত :১৫-২০)

পেস্তা আনারস, টার্পিক (এক প্রকার সবুজ সুস্বাদু ফল)অন্য সামগ্রী নিয়ে মিশরগামী একটি বাণিজ্য কাফেলা এ পথে আসলো। তারা নিজেদের পানির প্রয়োজনে একজনকে কূপের কাছে পাঠালো। সে এসে কুপের বালতি ফেলে তখন পানি উঠাতে লাগলো, বালতির সাথে ভেসে উঠল একটি বালক। পানি সংগ্রাহক তখন চিৎকার করে বলে উঠলো, হায়,এ কী চমৎকার বালক ;এবং মূল্যবান পণ্য পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এসব কিছু দেখিয়েছেন। কিছু করছেন না। কারণ, এই না করার মধ্যে লুকিয়ে আছে বিশাল এক রহস্য- যা মিশরের জন্য কল্যাণকর বার্তা নিয়ে বিকশিত হবে।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আজকের এই বালককে গোলাম হিসেবে মিশরের প্রবেশ করিয়ে একদিন সেখানকার কর্মকর্তা বানিয়ে দেবেন। আজকের এই বালক একদিন হয়ে উঠবে মিশরের আশা-ভরসার কেন্দ্রবিন্দু। অপরদিকে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাই রুবাইল গোপনে কূপের কাছে এলো,উদ্দেশ্য সবার অগোচরে ইউসুফ কে তুলে নিয়ে পিতার কাছে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু এসে দেখলো কূপে ইউসুফ নেই;হলে সে চিৎকার করতে লাগলো। এতে অন্য ভাইয়েরাও এসে হাজির হলো। এমন সময় তারা দেখলো, একটি বাণিজ্যিক কাফেলা তাকে পণ্য হিসেবে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। তারা কাফেলাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, সে আমাদের পলাতক গোলাম। তবে চাইলে একে ক্রয় করে নিয়ে যেতে পারো।

হযরত ইবনু মাসউদ, ইবনু আব্বাস, নাওফাল বিক্কালি এবং সুদ্দি ও কাতাদা আতিয়া আউফি রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ বলেন, ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা ইউসুফ কে মাত্র ২০ দিরহাম মূল্যে কাফেলার কাছে বিক্রি করে দিয়ে জনপ্রতি দুই দিরহাম করে ভাগ করে নিলো।মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, বাইশ দিরহামে বিক্রি হয়েছে। ইকরামা ও মোহাম্মদ ইবনু ইসহাক বলেন, ৪০ দিরহাম এ বিক্রি হয়েছিল।বণিকরা নিয়ে বিক্রি করল আজিজের মিশর মিশরের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ২০ দিনার মূল্যে বিক্রি করে। অন্য মতে ইউসুফের ওজন সমপরিমাণ কস্তুরির বিনিময়ে, অন্য আরেক বর্ণনায় ওজন সমপরিমাণ রেশমি কাপড়ের বিনিময়ে,আরো একটি বর্ণনায় ওজন সমপরিমাণ রুপার বিনিময়ে বিক্রি করেছিল।

ইবনে ইসহাক বলেন, মিশরের ওই মন্ত্রীর নাম ইতফির ইবনু রুহাইব তখনকার শাসকের নাম রাইয়ান ইবনু ওয়ালিদ। সে ছিল আমালিকা সম্প্রদায়ের লোক। মন্ত্রীর স্ত্রী নাম রাইল বিনতু রুআইল।কেউ বললেন জুলাইখা, মূলত জুলাইখা ছিল তার উপনাম। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু বলেন, ইউসুফ আলাইহিস সালামের বিক্রেতার নাম মালিক ইবনু জার ইবনু নুওয়াইব ইবনু মাদইয়ান ইবনু ইবরাহিম আ.(আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন)

ইউসুফ আলাইহিস সালামের পরবর্তী অবস্থার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَقَالَ الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖۤ اَكْرِمِىْ مَثْوٰىهُ عَسٰۤى اَنْ يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ؕ وَكَذٰلِكَ
مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِؕ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰۤى اَمْرِهٖ وَلٰـكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُوْنَ ٢١ وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗۤ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ٢٢

মিসরের যে লোক তাকে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বলল, 'তার থাকার সুব্যবস্থা কর, সম্ভবতঃ সে আমাদের উপকারে আসবে কিংবা তাকে আমরা পুত্র হিসেবেও গ্রহণ করে নিতে পারি।' এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম তাকে স্বপ্ন ব্যাখ্যার কিছু জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্য। আল্লাহ তাঁর কাজের ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্বশীল। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।যখন সে তার পরিপূর্ণ যৌবনে পৌঁছল, তখন তাকে বিচার-বুদ্ধি ও জ্ঞান দান করলাম, আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি।

(সুরা ইউসুফ, আয়াত :২১-২২)

উপরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ক্রয় বিক্রয়ের পথ ধরে ইউসুফ কে আমি মিশরে প্রতিষ্ঠিত করলাম একটি সম্মানিত জায়গা মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে। আল্লাহ তার কাজে সর্বদা বিজয়ী ;কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা অনুধাবন করতে পারে না। মন্ত্রী ইউসুফকে ক্রয় করে নিয়ে তার স্ত্রী কে বলল, তাকে তুমি সম্মানজনকভাবে থাকার ব্যবস্থা কর, তাকে আমরা নিজেদের ছেলে বানিয়ে নেব, অথবা অন্য কোনোভাবে সে আমাদের উপকার করবে। অতঃপর ইউসুফ আলাইহিস সালাম তখন তারুণ্যে পদার্পণ করলেন আল্লাহ তা'আলা তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা, প্রজ্ঞা ও ইলম দান করলেন।

তরুণ ইউসুফ ও গৃহকর্তী জুলাইখা

ইউসুফ আলাইহিস সালাম তারুণ্যে পদার্পণ করার পর আল্লাহ তাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করলেন। তিনি তখন পূর্ণ যুবক। নজরকাড়া সৌন্দর্যের অধিকারী। এমন সময় দেখা দিল নতুন এক সমস্যা। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তার ভবিষ্যৎ পয়গাম্বারকে সেই সংকট থেকে আপন কুদরতে হেফাজত করলেন। কারণ, ইউসুফ ছিলেন ভবিষ্যতের একজন মর্যাদা নবী;ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে সকল প্রকার অন্যায় অশ্লীলতা থেকে অন্য সকল নবী রাসুলের মতই হেফাজত করলেন। তার সততার সুস্পষ্ট ঘোষণা করলেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর সাথে ঘটে যাওয়া জুলাইখার বিষয়টিকে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা এভাবে তুলে ধরেছেন -

وَرَاوَدَتۡهُ الَّتِیۡ هُوَ فِیۡ بَیۡتِهَا عَنۡ نَّفۡسِهٖ وَغَلَّقَتِ الۡاَبۡوَابَ وَقَالَتۡ هَیۡتَ لَـكَ‌ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّیۡۤ اَحۡسَنَ مَثۡوَایَ‌ؕ اِنَّهٗ لَا یُفۡلِحُ الظّٰلِمُوۡنَ ٢٣ وَلَـقَدۡ هَمَّتۡ بِهٖ‌ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوۡلَاۤ اَنۡ رَّاٰ بُرۡهَانَ رَبِّهٖ‌ؕ كَذٰلِكَ لِنَصۡرِفَ عَنۡهُ السُّوۡۤءَ وَالۡـفَحۡشَآءَ‌ؕ اِنَّهٗ مِنۡ عِبَادِنَا الۡمُخۡلَصِیۡنَ ٢٤

যে মহিলার ঘরে সে ছিল, সে (মহিলাটি) তার থেকে অসৎ কর্ম কামনা করল। সে দরজাগুলো বন্ধ করে দিল আর বলল, 'এসো'। সে (ইউসুফ) বলল, 'আমি আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি। তিনি আমার রব্ব, তিনি আমার থাকার ব্যবস্থা কত উত্তম করেছেন, যালিমরা কক্ষনো সাফল্য লাভ

করতে পারে না।সেই মহিলা তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল আর সে (ইউসুফ)ও তার প্রতি আসক্ত হয়েই যেত যদি সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন না দেখত। আমি তা দেখিয়েছিলাম তাকে অসৎ কর্ম ও নির্লজ্জতা থেকে সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে, সে ছিল বিশুদ্ধ-হৃদয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।(সূরা ইউসুফ, আয়াত :২৩-২৪)

জুলাইখা তখন ইউসুফের প্রতি প্রচন্ড আকর্ষণে উম্মাতাল।সে তার মনোরম পোশাক আর নজর করা অলংকারে সজ্জিত হয়ে ইউসুফের সামনে নিজেকে প্রকাশ করে ধরল এবং আপন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য অনুরোধ করে আহ্বান জানাল।জুলাইখা একে তো ছিল মন্ত্রী পত্নী, তার ওপর মিশরের শাসক রাইয়ান ইবনু ওয়ালিদের ভাগ্নি ;অপরদিকে ইউসুফের গৃহকর্ত্রী। নিজের মনোবাঞ্ছা ও আকাঙ্খা আর প্রভাব খাটিয়ে ইউসুফকে একান্ত আপন করে পাওয়ার আহ্বান করলো। ইউসুফা তখন পূর্ণ যুবক। কিন্তু তিনি যে ভবিষ্যৎ নবী ;তাই তিনি জুলেখার আহ্বান সাড়া না দিয়ে তাকে বরং বোঝানোর চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন -

তোমার এমন প্রস্তাব থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। নিশ্চয় আমার রসদার (জুলাইখার স্বামী)আমার উপর ইহসান করেছেন সম্মানজনক অবস্থান দিয়ে। সুতরাং আমি তার আমানতের খেয়ানত করতে পারি না।

মূলত এটি ছিল আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিশেষ অনুগ্রহ যে তিনি ইউসুফ কে এমন পরিস্থিতিতেও টলে যাওয়া থেকে হেফাজত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন -

আমি তাকে মন্দকর্ম ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকার জন্য এভাবে নির্দেশ দিয়েছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধ চিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

ফলের তিনি এহেন নাজুক পরিস্থিতি থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য দরজার দিকে ছুটতে লাগলেন। ঘর থেকে বেরোতে যাবেন এমন সময় দরজার সামনে গৃহকর্তাকে দেখতে পেলেন। তখন জুলাইখা ইউসুফ এর কোন কথা বলতে না দিয়ে স্বামীর কাছে সরাসরি ইউসুফের নামে নালিশ করে বসল। কুরআনুল কারীমে বিষয়টি এভাবে আলোচিত হয়েছে -

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِؕ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا
اِلَّآ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ٢٥ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ كَانَ
قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ٢٦ وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ
الصّٰدِقِيْنَ ٢٧ فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّؕ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ٢٨ يُوْسُفُ
اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۖ ۚ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ ٢٩

তারা উভয়ে দরজার দিকে দৌড় দিল আর স্ত্রীলোকটি পিছন হতে তার জামা ছিঁড়ে ফেলল। এ সময় স্ত্রীলোকটির স্বামীকে তারা দু’জনে দরজার কাছে পেল। মহিলাটি বলল, ‘যে তোমার

পরিবারের সাথে অপকর্ম করতে চায় তাকে জেলে পাঠানো অথবা ভয়াবহ শাস্তি ছাড়া উপযুক্ত দন্ড কী আর দেয়া যেতে পারে?'সে (ইউসুফ) বলল, 'সে-ই আমা হতে অসৎ কর্ম কামনা করেছে'। তখন মহিলাটির পরিবারের এক সাক্ষী সাক্ষ্য দিল- 'যদি তার জামা সম্মুখ দিক থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে, তবে মহিলাটি সত্য বলেছে আর সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি তার জামা পেছন হতে ছেঁড়া হয়ে থাকে, তবে মহিলাটি মিথ্যে বলেছে আর সে সত্যবাদীদের অন্তুর্ভক্ত।'আর যদি তার জামা পেছন হতে ছেঁড়া হয়ে থাকে, তবে মহিলাটি মিথ্যে বলেছে আর সে সত্যবাদীদের অন্তুর্ভক্ত।আর যদি তার জামা পেছন হতে ছেঁড়া হয়ে থাকে, তবে মহিলাটি মিথ্যে বলেছে আর সে সত্যবাদীদের অন্তুর্ভক্ত।'স্বামী যখন ইউসুফের জামাটি পেছন হতে ছেঁড়া দেখতে পেল, তখন সে বলল, 'এ সব হল তোমাদের নারীদের ছলনা, তোমাদের কূট কৌশল বড়ই কঠিন।ওহে ইউসুফ! তুমি ব্যাপারটা উপেক্ষা কর, আর ওহে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও, প্রকৃতপক্ষে তুমিই অপরাধী।'(সূরা ইউসুফ, আয়াত :২৫-২৯)

উদ্ধৃত আয়াতে দোষীকে ইউসুফ নাকি জুলাইখা এটা যাচাইয়ের জন্য ইউসুফের জামার দিকে দেখতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, যদি ইউসুফের জামার সামনের দিকথেকে ছিন্ন হয়ে থাকে তাহলে দোষী ইউসুফ ;এতে বুঝা যাবে, সে আগ্রহী ছিল, আরে জুলাইখা বাধা দিতে গিয়ে জামা ছিড়ে ফেলেছে। আর যদি জামার পিছনে দিকে ছেঁড়া হয় তাহলে দোষী জুলাইখা;এতে বোঝা যাবে ইউসুফ যখন পালাচ্ছিল তখন পেছন থেকে ইউসুফ কে ধরতে গিয়ে জুলাইখা জামা ছিঁড়ে ফেলেছে। মন্ত্রী তখন তাকিয়ে দেখলো, জামা পিছনের দিকে ছেঁড়া ;ফলে সে জুলাইখাকে শাসিয়ে বলল, নিশ্চয়ই এটি তোমার ষড়যন্ত্র । তোমাদের নারীদের ষড়যন্ত্র ভীষণ ভয়ানক। তুমি তোমার অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে তওবা করো। যদিও তারা ছিল মূর্তি পূজক;কিন্তু এতটুকু তারা বুঝ বুঝত যে, কেউ গুনাহ করলে ক্ষমা করে একমাত্র লা শারীক আল্লাহ। তাই সে জুলাইখাকে তার অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করতে বলেছে। আর ইউসুফকে বলল, তুমি বিষয়টি নিয়ে আর কথা বলোনা -কেননা, এসব বিষয়ে ফাস করা ভালো নয়।

কিন্তু ঘটনা শেষ পর্যন্ত গোপন থাকেনি,শহরময় ছড়িয়ে পড়েছে। শহরের নারীরা বিষয়টি নিয়ে পুরোদমে আলোচনা সমালোচনা শুরু করে দিয়েছে যে,জুলাইখা এক যুবকের প্রেমে মজে আছে। জুলাইখাকে নিয়ে এমন আলাপ আলোচনা তার আত্মসম্মানে লাগলো। ফলে এসে অবস্থার রাজুকতা বুঝানোর জন্য শহরের মহিলাদের ডেকে পাঠাল।কুরআনুল কারিমের বিষয়টি এভাবে আলোচিত হয়েছে যে -

وَقَالَ نِسۡوَةٌ فِى الۡمَدِيۡنَةِ امۡرَاَتُ الۡعَزِيۡزِ تُرَاوِدُ فَتٰهَا عَنۡ نَّفۡسِهٖ‌ۚ قَدۡ شَغَفَهَا حُبًّا‌ ؕ اِنَّا لَـنَرٰٮهَا ۞
فِىۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ ٣٠ فَلَمَّا سَمِعَتۡ بِمَكۡرِهِنَّ اَرۡسَلَتۡ اِلَيۡهِنَّ وَاَعۡتَدَتۡ لَهُنَّ مُتَّكَـاً وَّاٰتَتۡ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنۡهُنَّ
سِكِّيۡنًا وَّقَالَتِ اخۡرُجۡ عَلَيۡهِنَّ‌ ۚ فَلَمَّا رَاَيۡنَهٗۤ اَكۡبَرۡنَهٗ وَقَطَّعۡنَ اَيۡدِيَهُنَّ وَقُلۡنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ
اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيۡمٌ ٣١ قَالَتۡ فَذٰلِكُنَّ الَّذِىۡ لُمۡتُنَّنِىۡ فِيۡهِ‌ؕ وَ لَـقَدۡ رَاوَدْتُّهٗ عَنۡ نَّـفۡسِهٖ فَاسۡتَعۡصَمَ‌ؕ

وَلَىِٕنۡ لَّمۡ يَفۡعَلۡ مَاۤ اٰمُرُهٗ لَيُسۡجَنَنَّ وَلَيَكُوۡنًا مِّنَ الصّٰغِرِيۡنَ ٣٢ قَالَ رَبِّ السِّجۡنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا يَدۡعُوۡنَنِىۡۤ
اِلَيۡهِ‌ۚ وَاِلَّا تَصۡرِفۡ عَنِّىۡ كَيۡدَهُنَّ اَصۡبُ اِلَيۡهِنَّ وَاَكُنۡ مِّنَ الۡجٰهِلِيۡنَ ٣٣ فَاسۡتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنۡهُ
كَيۡدَهُنَّ‌ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ ٣٤

নগরীর কতক মহিলা বলল, ‘আযীযের স্ত্রী তার যুবক ক্রীতদাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে, ভালবাসা তাকে উন্মাদ করে ফেলেছে, আমরা নিশ্চিতই তাকে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে নিপতিত দেখছি।’মহিলাটি যখন তাদের চক্রান্তের কথা জানতে পারল, তখন তাদেরকে ডেকে পাঠাল আর তাদের জন্য হেলান দিয়ে বসার ব্যবস্থা করল, আর তাদের প্রত্যেককে একটা করে ছুরি দিল। অতঃপর ইউসুফকে বলল, ‘ওদের সামনে বেরিয়ে এসো।’ যখন তারা তাকে দেখল, বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল আর নিজেদের হাত কেটে ফেলল, আর বলল, ‘আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন, এ তো মানুষ নয়, এতো এক সম্মানিত ফেরেশতা।’মহিলাটি বলল, ‘এ হল সেই যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করছ, আমিই তো তাকে ভুলাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে নিজেকে নিষ্পাপ রেখেছে, আমি তাকে যে আদেশ করি তা যদি সে না করে, তাহলে তাকে অবশ্যই কয়েদ করা হবে, আর সে হীন লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’সে (ইউসুফ) বলল, ‘হে আমার রব্ব! তারা আমাকে যে দিকে ডাকছে তার চেয়ে জেলখানা আমার কাছে অধিক প্রিয়। তুমি যদি আমা হতে তাদের অপকৌশল সরিয়ে না দাও তা হলে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব, আর অজ্ঞদের দলে শামিল হয়ে যাব।’তখন তার প্রতিপালক তার ডাকে সাড়া দিলেন আর তার থেকে তাদের কূট কৌশল অপসারিত করলেন, তিনি সব কিছু শুনেন, সব কিছু জানেন।(সূরা ইউসুফ, আয়াত ;৩০-৩৪)

হজরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম

পরিচয়

হযরত আইয়ূব (আঃ) ছবরকারী নবীগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এবং অনন্য দৃষ্টান্ত ছিলেন। ইবনু কাছীরের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ইসহাক (আঃ)-এর দুই যমজ পুত্র ঈছ ও ইয়াকূবের মধ্যেকার প্রথম পুত্র ঈছ-এর প্রপৌত্র ছিলেন। আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইয়াকূব-পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর পৌত্রী ‘লাইয়া’ বিনতে ইফরাঈম বিন ইউসুফ। কেউ বলেছেন, ‘রাহমাহ’। তিনি ছিলেন স্বামী ভক্তি ও পতিপরায়ণতায় বিশ্বের এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশে তিনি ‘বিবি রহীমা’ নামে পরিচিত। তাঁর পতিভক্তি বিষয়ে উক্ত নামে জনপ্রিয় উপন্যাস সমূহ বাজারে চালু রয়েছে। অথচ এ নামটির উৎপত্তি কাহিনী নিতান্তই হাস্যকর। পবিত্র কুরআনে সূরা আম্বিয়া ৮৪ আয়াতে رَحۡمَةً مِّنۡ عِنۡدِنَا (‘আমরা আইয়ূবকে.... আরও দিলাম আমার পক্ষ হ’তে দয়া পরবশে’) বাক্যাংশের ‘রাহমাতান’ বা ‘রাহ্মাহ’ (رَحۡمَةً) শব্দটিকে ‘রহীমা’ করে এটিকে আইয়ূবের স্ত্রীর

নাম হিসাবে একদল লোক সমাজে চালু করে দিয়েছে। ইহুদী-নাছারাগণ যেমন তাদের ধর্মগ্রন্থের শাব্দিক পরিবর্তন ঘটাতো, এখানেও ঠিক ঐরূপ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ যেন বলছেন যে, আইয়ূবের স্ত্রী রহীমা তার স্বামীকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। পরে আমরা তাকে আইয়ূবের কাছে ফিরিয়ে দিলাম'। বস্ত্ততঃ এটি একটি উদ্ভট ব্যাখ্যা বৈ কিছু নয়। মূলতঃ আইয়ূবের স্ত্রীর নাম কি ছিল, সে বিষয়ে সঠিক তথ্য কুরআন বা হাদীছে নেই। এ বিষয়ের ভিত্তি হ'ল ইহুদী ধর্মনেতাদের রচিত কাহিনী সমূহ। যার উপরে পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করাটা নিতান্তই ভুল। তাফসীরবিদ ও ঐতিহাসিকগণ আইয়ূবের জনপদের নাম বলেছেন 'হূরান' অঞ্চলের 'বাছানিয়াহ' এলাকা। যা ফিলিস্তীনের দক্ষিণ সীমান্ত বরাবর দামেষ্ক ও আযরূ'আত-এর মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত।[1]

পবিত্র কুরআনে ৪টি সূরার ৮টি আয়াতে আইয়ূব (আঃ)-এর কথা এসেছে। যথা- নিসা ১৬৩, আন'আম ৮৪, আম্বিয়া ৮৩-৮৪ এবং ছোয়াদ ৪১-৪৪।

আল্লাহ বলেন,

وَأَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ- فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَّآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِيْنَ-

'আর স্মরণ কর আইয়ূবের কথা, যখন তিনি তার পালনকর্তাকে আহবান করে বলেছিলেন, আমি কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি সর্বোচ্চ দয়াশীল'। 'অতঃপর আমরা তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম। তার পরিবারবর্গকে ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমাদের পক্ষ হ'তে দয়া পরবশে। আর এটা হ'ল ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ' (আম্বিয়া ২১/৮৩-৮৪)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِب بِّهِ وَلاَ تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ-(ص ৪১-৪৪)-

'আর তুমি বর্ণনা কর আমাদের বান্দা আইয়ূবের কথা। যখন সে তার পালনকর্তাকে আহবান করে বলল, শয়তান আমাকে (রোগের) কষ্ট এবং (সম্পদ ও সন্তান হারানোর) যন্ত্রণা পৌঁছিয়েছে' (ছোয়াদ ৩৮/৪১)। '(আমরা তাকে বললাম,) তুমি তোমার পা দিয়ে (ভূমিতে)

আঘাত কর। (ফলে পানি নির্গত হ’ল এবং দেখা গেল যে,) এটি গোসলের জন্য ঠান্ডা পানি ও (পানের জন্য উত্তম) পানীয়’ (৪২)। ‘আর আমরা তাকে দিয়ে দিলাম তার পরিবারবর্গ এবং তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আমাদের পক্ষ হ’তে রহমত স্বরূপ এবং জ্ঞানীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ’ (৪৩)। ‘(আমরা তাকে বললাম,) তুমি তোমার হাতে একমুঠো তৃণশলা নাও। অতঃপর তা দিয়ে (স্ত্রীকে) আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করো না (বরং শপথ পূর্ণ কর)। এভাবে আমরা তাকে পেলাম ধৈর্যশীল রূপে। কতই না চমৎকার বানদা সে। নিশ্চয়ই সে ছিল (আমার দিকে) অধিক প্রত্যাবর্তনশীল’ (ছোয়াদ ৩৮/৪১-৪৪)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ‘আর এভাবেই আমরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি’ (আন‘আম ৬/৮৪)।

অতঃপর আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আইয়ূব একদিন নগ্নাবস্থায় গোসল করছিলেন (অর্থাৎ বাথরুম ছাড়াই খোলা স্থানে)। এমন সময় তাঁর উপরে সোনার টিড্ডি পাখি সমূহ এসে পড়ে। তখন আইয়ূব সেগুলিকে ধরে কাপড়ে ভরতে থাকেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাকে ডেকে বলেন, হে আইয়ূব! أَلَمْ اَكُنْ أُغْنِيَنَّكَ عَمَّا تَرَى؟ আমি কি তোমাকে এসব থেকে মুখাপেক্ষীহীন করিনি? আইয়ূব বললেন, بَلَى وَعِزَّتِكَ ولكن لاغِنَى بِى عَنْ بَرَكَتِكَ তোমার ইযযতের কসম! অবশ্যই তুমি আমাকে তা দিয়েছ। কিন্তু তোমার বরকত থেকে আমি মুখাপেক্ষীহীন নই’।[2]

[1]. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১/২০৬-১০ পৃঃ; কুরতুবী, ছোয়াদ ৪১।
[2]. বুখারী, মিশকাত হা/৫৭০৭ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায় ‘সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা’ অনুচ্ছেদ।

আইয়ূবের ঘটনাবলী

আইয়ূব (আঃ) সম্পর্কে কুরআনে ও হাদীছে উপরোক্ত বক্তব্যগুলির বাইরে আর কোন বক্তব্য বা ইঙ্গিত নেই। কুরআন থেকে মূল যে বিষয়টি প্রতিভাত হয়, তা এই যে, আল্লাহ আইয়ূবকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। সে পরীক্ষায় আইয়ূব উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। যার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাকে হারানো নে‘মত সমূহের দ্বিগুণ ফেরৎ দিয়েছিলেন। আল্লাহ এখানে ইবরাহীম, মূসা, দাঊদ, সুলায়মান, আইয়ূব, ইউনুস প্রমুখ নবীগণের কষ্ট ভোগের কাহিনী শুনিয়ে শেষনবীকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং সেই সাথে উম্মতে মুহাম্মাদীকে যেকোন বিপাদপদে দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকার উপদেশ দিয়েছেন।

বিপদে ধৈর্য ধারণ করায় এবং আল্লাহর পরীক্ষাকে হাসিমুখে বরণ করে নেওয়ায় আল্লাহ আইয়ূবকে ‘ছবরকারী’ হিসাবে ও ‘সুন্দর বান্দা’ হিসাবে প্রশংসা করেছেন (ছোয়াদ ৪৪)।

প্রত্যেক নবীকেই কঠিন পরীক্ষাসমূহ দিতে হয়েছে। তারা সকলেই সে সব পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করেছেন ও উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু আইয়ূবের আলোচনায় বিশেষ ভাবে إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً 'আমরা তাকে ধৈর্যশীল হিসাবে পেলাম' (ছোয়াদ ৪৪) বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তাঁকে কঠিনতম কোন পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। তবে সে পরীক্ষা এমন হ'তে পারে না, যা নবীর মর্যাদার খেলাফ ও স্বাভাবিক ভদ্রতার বিপরীত এবং যা ফাসেকদের হাসি-ঠাট্টার খোরাক হয়। যেমন তাকে কঠিন রোগে ফেলে দেহে পোকা ধরানো, দেহের সব গোশত খসে পড়া, পচে-গলে দুর্গন্ধময় হয়ে যাওয়ায় ঘর থেকে বের করে জঙ্গলে ফেলে আসা, ১৮ বা ৩০ বছর ধরে রোগ ভোগ করা, আত্মীয়-স্বজন সবাই তাকে ঘৃণাভরে ছেড়ে চলে যাওয়া ইত্যাদি সবই নবীবিদ্বেষী ও নবী হত্যাকারী ইহুদী গল্পকারদের বানোয়াট মিথ্যাচার বৈ কিছুই নয়। ইহুদী নেতাদের কুকীর্তির বিরুদ্ধে যখনই নবীগণ কথা বলেছেন, তখনই তারা তাদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছে এবং যা খুশী তাই লিখে কেতাব ভরেছে। ধর্ম ও সমাজ নেতারা তাদের অনুসারীদের বুঝাতে চেয়েছে যে, নবীরা সব পথভ্রষ্ট। সেজন্য তাদের উপর আল্লাহর গযব এসেছে। তোমরা যদি তাদের অনুসারী হও, তাহ'লে তোমরাও অনুরূপ গযবে পড়বে। এ ব্যাপারে মুসলিম মুফাসসিরগণও ধোঁকায় পড়েছেন এবং ঐসব ভিত্তিহীন কাল্পনিক গল্প ছাহাবী ও তাবেঈগণের নামে নিজেদের তাফসীরের কেতাবে জমা করেছেন। এ ব্যাপারে ছাহাবী ইবনু আববাস ও তাবেঈ ইবনু শিহাব যুহরীর নামেই বেশী বর্ণনা করা হয়েছে। যে সবের কোন ছহীহ ভিত্তি নেই।

এক্ষণে আমরা আইয়ূব (আঃ)-এর বিষয়ে কুরআনী বক্তব্যগুলির ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করব। (১) সূরা আম্বিয়া ও সূরা ছোয়াদের দু'স্থানেই আইয়ূবের আলোচনার শুরুতে আল্লাহর নিকটে আইয়ূবের আহবানের (إِذْ نَادَى) কথা আনা হয়েছে। তাতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আইয়ূব নিঃসন্দেহে কঠিন বিপদে পড়েছিলেন। যেজন্য তিনি আকুতিভরে আল্লাহকে ডেকেছিলেন। আর বিপদে পড়ে আল্লাহকে ডাকা ও তার নিকটে বিপদ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা নবুঅতের শানের খেলাফ নয়। বরং এটাই যেকোন অনুগত বান্দার কর্তব্য। তিনি বিপদে ধৈর্য হারিয়ে এটা করেননি, বরং বিপদ দূর করে দেবার জন্য আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করেছিলেন। তবে সেই বিপদ কি ধরনের ছিল, সে বিষয়ে কিছুই উল্লেখিত হয়নি। অতএব আল্লাহ এ বিষয়ে সর্বাধিক অবগত।

(২) কষ্টে পড়ার বিষয়টিকে তিনি শয়তানের দিকে সম্বন্ধ করেছেন (مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ) (ছোয়াদ ৪১), আল্লাহর দিকে নয়। এটা তিনি করেছেন আল্লাহর প্রতি শিষ্টাচারের দিকে লক্ষ্য রেখে। কেননা শয়তান নবীদের উপর কোন ক্ষমতা রাখে না। এমনকি কোন নেককার বান্দাকেও শয়তান পথভ্রষ্ট করতে পারে না। তবে সে ধোঁকা দিতে পারে, বিপদে ফেলতে

পারে, যা আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কার্যকর হয় না। যেমন মূসা (আঃ)-এর সাথী যুবক থলে থেকে মাছ বেরিয়ে যাবার কথা মূসাকে বলতে ভুলে গিয়েছিল। সে কথাটি মূসাকে বলার সময় তিনি বলেছিলেন, وَمَا أَنْسَانِيْهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ 'আমাকে ওটা শয়তান ভুলিয়ে দিয়েছিল' (কাহফ ৬৩)। আসলে শয়তানের ধোঁকা আল্লাহ কার্যকর হ'তে দিয়ে ছিলেন বিশেষ উদ্দেশ্যে, যা মূসা ও খিযিরের কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে। এখানেও তেমনি শয়তানের ধোঁকার কারণে আইয়ূব তাকেই দায়ী করেছেন। কিন্তু ঐ ধোঁকা কার্যকর করা এবং তা থেকে মুক্তি দানের ক্ষমতা যেহেতু আল্লাহর হাতে, সেকারণ তিনি আল্লাহর নিকটেই প্রার্থনা করেছেন।

এক্ষণে শয়তান তাকে কী ধরনের বিপদে ফেলেছিল, কেমন রোগে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন, দেহের সর্বত্র কেমন পোকা ধরেছিল, জিহবা ও কলিজা ব্যতীত দেহের সব গোশত তার খসে পড়েছিল, পচা দুর্গন্ধে সবাই তাকে নির্জন স্থানে ফেলে পালিয়েছিল, ইত্যাকার ১৭ রকমের কাল্পনিক কাহিনী যা কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে জমা করেছেন (কুরতুবী, আম্বিয়া ৮৪) এবং অন্যান্য মুফাসসিরগণ আরও যেসব কাহিনী বর্ণনা করেছেন, সে সবের কোন ভিত্তি নেই। বরং স্রেফ ইস্রাঈলী উপকথা মাত্র।

(৩) আল্লাহ বলেন, 'আমরা তার দো'আ কবুল করেছিলাম এবং তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিয়েছিলাম' (আম্বিয়া ৮৪)। কীভাবে দূর করা হয়েছিল, সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন যে, তিনি তাকে ভূমিতে পদাঘাত করতে বলেন। অতঃপর সেখান থেকে স্বচ্ছ পানির ঝর্ণা ধারা বেরিয়ে আসে। যাতে গোসল করায় তার দেহের উপরের কষ্ট দূর হয় এবং উক্ত পানি পান করায় তার ভিতরের কষ্ট দূর হয়ে যায় (ছোয়াদ ৪২)। এটি অলৌকিক মনে হলেও বিস্ময়কর নয়। ইতিপূর্বে শিশু ইসমাঈলের ক্ষেত্রে এটা ঘটেছে। পরবর্তীকালে হোদায়বিয়ার সফরে রাসূলের হাতের বরকতে সেখানকার শুষ্ক পুকুরে পানির ফোয়ারা ছুটেছিল, যা তাঁর সাথী ১৪০০ ছাহাবীর পানির কষ্ট নিবারণে যথেষ্ট হয়। বস্ত্ততঃ এগুলি নবীগণের মু'জেযা। নবী আইয়ূবের জন্য তাই এটা হতেই পারে আল্লাহর হুকুমে।

এক্ষণে কতদিন তিনি রোগভোগ করেন সে বিষয়ে ৩ বছর, ৭ বছর, সাড়ে ৭ বছর, ৭ বছর ৭ মাস ৭ দিন ৭ রাত, ১৮ বছর, ৩০ বছর, ৪০ বছর ইত্যাদি যা কিছু বর্ণিত হয়েছে[3], সবই ইস্রাঈলী উপকথা মাত্র। যার কোন ভিত্তি নেই। বরং নবীগণের প্রতি ইহুদী নেতাদের বিদ্বেষ থেকে কল্পিত।

(৪) আল্লাহ বলেন, 'আমরা তার পরিবার বর্গকে ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সাথে সমপরিমাণ আরও দিলাম আমাদের পক্ষ হ'তে দয়া পরবশে (আম্বিয়া ৮৪; ছোয়াদ ৪৩)। এখানে

পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তার বিপদে ধৈর্য ধারণের পুরস্কার দ্বিগুণভাবে পেয়েছিলেন দুনিয়াতে এবং আখেরাতে। বিপদে পড়ে যা কিছু তিনি হারিয়েছিলেন, সবকিছুই তিনি বিপুলভাবে ফেরত পেয়েছিলেন। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ 'এভাবেই আমরা আমাদের সৎকর্মশীল বান্দাদের পুরস্কৃত করে থাকি' (আন'আম ৮৪)। এক্ষণে তাঁর মৃত সন্তানাদি পুনর্জীবিত হয়েছিল, না-কি হারানো গবাদি পশু সব ফেরৎ এসেছিল, এসব কষ্ট কল্পনার কোন প্রয়োজন নেই। এতটুকুই বিশ্বাস রাখা যথেষ্ট যে, তিনি তাঁর ধৈর্য ধারণের পুরস্কার ইহকালে ও পরকালে বহুগুণ বেশী পরিমাণে পেয়েছিলেন। যুগে যুগে সকল ধৈর্যশীল ঈমানদার নর-নারীকে আল্লাহ এভাবে পুরস্কৃত করে থাকেন। তাঁর রহমতের দরিয়া কখনো খালি হয় না।

(৫) উপরোক্ত পুরস্কার দানের পর আল্লাহ বলেন, رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا 'আমাদের পক্ষ হতে দয়া পরবশে' (আম্বিয়া ৮৪)। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ কারু প্রতি অনুগ্রহ করতে বাধ্য নয়। তিনি যা খুশী তাই করেন, যাকে খুশী যথেচ্ছ দান করেন। তিনি সবকিছুতে একক কর্তৃত্বশীল। কেউ কেউ অত্র আয়াতে বর্ণিত 'রাহমাতান' (رَحْمَةً) থেকে আইয়ূব (আঃ)-এর স্ত্রীর নাম 'রহীমা' কল্পনা করেছেন। যা নিতান্তই মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়'।[4]

(৬) ছহীহ বুখারীতে আইয়ূবের উপর এক ঝাঁক সোনার টিড্ডি পাখি এসে পড়ার যে কথা বর্ণিত হয়েছে, সেটা হ'ল আউয়ূবের সুস্থতা লাভের পরের ঘটনা। এর দ্বারা আল্লাহ বিপদমুক্ত আইয়ূবের উচ্ছ্বল আনন্দ পরখ করতে চেয়েছেন। আল্লাহর অনুগ্রহ পেয়ে বান্দা কত খুশী হ'তে পারে, তা দেখে যেন আল্লাহ নিজেই খুশী হন। এজন্য আইয়ূবকে খোঁচা দিয়ে কথা বললে অনুগ্রহ বিগলিত আইয়ূব বলে ওঠেন, 'আল্লাহর বরকত থেকে আমি মুখাপেক্ষীহীন নই'। অর্থাৎ বান্দা সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহর রহমত ও বরকতের মুখাপেক্ষী। নিঃসন্দেহে উক্ত ঘটনাটিও একটি মু'জেযা। কেননা কোন প্রাণীই স্বর্ণ নির্মিত হয় না।

(৭) আল্লাহ আইয়ূবকে বলেন, وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِّهِ وَلاَ تَحْنَثْ 'আর তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা নাও। অতঃপর তা দিয়ে (স্ত্রীকে) আঘাত কর এবং তোমার শপথ ভঙ্গ করো না' (ছোয়াদ ৪৪)। অত্র আয়াতে আরেকটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, রোগ অবস্থায় আইয়ূব শপথ করেছিলেন যে, সুস্থ হ'লে তিনি স্ত্রীকে একশ' বেত্রাঘাত করবেন। রোগ তাড়িত স্বামী কোন কারণে স্ত্রীর উপর ক্রোধবশে এরূপ শপথ করেও থাকতে পারেন। কিন্তু কেন তিনি এ শপথ করলেন, তার স্পষ্ট কোন কারণ কুরআন বা হাদীছে বলা হয়নি। ফলে তাফসীরের কেতাব সমূহে নানা কল্পনার ফানুস উড়ানো হয়েছে, যা আইয়ূব নবীর পুণ্যশীলা স্ত্রীর উচ্চ মর্যাদার একেবারেই বিপরীত। নবী আইয়ূবের স্ত্রী ছিলেন আল্লাহর প্রিয় বান্দীদের অন্যতম।

তাকে কোনরূপ কষ্টদান আল্লাহ পসন্দ করেননি। অন্য দিকে শপথ ভঙ্গ করাটাও ছিল নবীর মর্যাদার খেলাফ। তাই আল্লাহ একটি সুন্দর পথ বাৎলে দিলেন, যাতে উভয়ের সম্মান বজায় থাকে এবং যা যুগে যুগে সকল নেককার নর-নারীর জন্য অনুসরণীয় হয়। তা এই যে, স্ত্রীকে শিষ্টাচারের নিরিখে প্রহার করা যাবে। কিন্তু তা কোন অবস্থায় শিষ্টাচারের সীমা লংঘন করবে না। আর সেকারণেই এখানে বেত্রাঘাতের বদলে তৃণশলা নিতে বলা হয়েছে, যার আঘাত মোটেই কষ্টদায়ক নয়' (কুরতুবী, ছোয়াদ ৪৪)।

(৮) আইয়ূবের ঘটনা বর্ণনার পর সূরা আম্বিয়া ও সূরা ছোয়াদে আল্লাহ কাছাকাছি একইরূপ বক্তব্য রেখেছেন যে, এটা হ'ল وَذِكْرَى لِلْعَابِدِيْنَ 'ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ' (আম্বিয়া ৮৪) এবং وَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ 'জ্ঞানীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ' (ছোয়াদ ৪৪)। এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর দাসত্বকারী ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী এবং প্রকৃত জ্ঞানী তিনিই যিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্বকারী। অবিশ্বাসী কাফের-নাস্তিক এবং আল্লাহর অবাধ্যতাকারী ফাসেক-মুনাফিক কখনোই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান নয়। যদিও তারা সর্বদা জ্ঞানের বড়াই করে থাকে।

ক্বাযী আবুবকর ইবনুল 'আরাবী বলেন, আইয়ূব সম্পর্কে অত্র দু'টি আয়াতে (আম্বিয়া ৮৩ ও ছোয়াদ ৪১) আল্লাহ আমাদেরকে যা খবর দিয়েছেন, তার বাইরে কিছুই বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়। অনুরূপভাবে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) হ'তে (উপরে বর্ণিত) হাদীছটি ব্যতীত একটি হরফও বিশুদ্ধভাবে জানা যায়নি। তাহ'লে কে আমাদেরকে আইয়ূব সম্পর্কে খবর দিবে? অন্য আর কার যবানে আমরা এগুলো শ্রবণ করব? আর বিদ্বানগণের নিকটে ইস্রাঈলী উপকথা সমূহ একেবারেই পরিত্যক্ত। অতএব তাদের লেখা পাঠ করা থেকে তোমার চোখ বন্ধ রাখো। তাদের কথা শোনা থেকে তোমার কানকে বধির করো' (কুরতুবী, ছোয়াদ ৪১-৪২)।

আইয়ূব (আঃ) ৭০ বছর বয়সে পরীক্ষায় পতিত হন। পরীক্ষা থেকে মুক্ত হবার অনেক পরে ৯৩ বছর বা তার কিছু বেশী বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাবেঈ বিদ্বান মুজাহিদ হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, ক্বিয়ামতের দিন ধনীদের সম্মুখে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হবে হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে(২) ক্রীতদাসদের সামনে পেশ করা হবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে এবং (৩) বিপদগ্রস্তদের সামনে পেশ করা হবে হযরত আইয়ূব (আঃ)-কে।[5]

[3]. কুরতুবী, আম্বিয়া ৮৪; ছোয়াদ ৪২; ইবনু কাছীর, আম্বিয়া ৮৩-৮৪।

[4]. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/২০৯ পৃঃ।

[5]. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২০৭, ২১০ পৃঃ।

হজরত ইউনুস আ.

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা

পূর্ববর্তী নবী 'আলাইহিমুস সালামগণের ঘটনাবলিতে রয়েছে শিক্ষা ও উপদেশ। তারা আমাদের আলোকবর্তিকা ও আলোর মিছিল। আল্লাহ বলেন: "তাদের এ কাহিনীগুলোতে অবশ্যই বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে শিক্ষা, এটা কোনো বানানো গল্প নয়, বরং তাদের পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী এবং প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ। আর হিদায়াত ও রহমত ঐ কওমের জন্য যারা ঈমান আনে।" {সূরা ইউসূফ, আয়াত: ১১১}

মক্কায় যখন ঈমানদারের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, পথ যখন দুর্গম অথচ দীর্ঘ- মুসলিমরা যখন এর শেষের দেখা পাচ্ছিল না, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এসব বৃত্তান্ত নাযিল হত। এসব বৃত্তান্ত তাদের পথের শেষ উন্মোচিত করত। গন্তব্যের শেষ রেখা উদ্ভাসিত করত। তাদের সঙ্গে পথ চলত এবং তাদের হাত ধরত। এসব ছিল রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয় স্থির করার অভিপ্রায়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আর রাসূলদের এসব সংবাদ আমরা তোমার কাছে বর্ণনা করছি যার দ্বারা আমরা তোমার মনকে স্থির করি আর এতে তোমার কাছে এসেছে সত্য এবং মুমিনদের জন্য উপদেশ ও স্মরণ। " {সূরা হূদ, আয়াত : ১২০}

আল্লাহ যেন তাঁর নবীকে বুঝাতে চান, আপনি দুর্গম পথে একা নন। আল্লাহর ভাষ্য যেমন বলছে: "অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রাসূলগণ।" {সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ৩৫}

আজ আমরা নবীদের মধ্যে একজনের ঘটনা শুনব, যে ঘটনা আমাদের নবীকে বলছিল- সাবধান তুমি যেন দাওয়াতের দায়িত্ব ও রেসালতের গুরুভার ফেলে যেও না। যেন বলছিল: "অতএব তুমি তোমার রবের হুকুমের জন্য ধৈর্যধারণ কর। আর তুমি মাছওয়ালার মত হয়ো না, যখন সে দুঃখে কাতর হয়ে ডেকেছিল।" {সূরা আল-কলম, আয়াত: ৪৮}

এ হলো ইউনুস 'আলাইহিস সালামের ঘটনা। আল্লাহ তাকে মসুলের নাইনাওয়াবাসীর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর তাওহীদ ও ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানান। তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং নিজেদের কুফরী ও অবাধ্যতায় অটল থাকে। তাদের এ অবস্থা দীর্ঘায়িত হলে ইউনুস 'আলাইহিস সালাম রাগে-ক্ষোভে তাদের ছেড়ে চলে আসেন। তিনি তাদেরকে তিনদিন পর আযাব নাযিলের সতর্কবার্তা ঘোষণা করেন। রাগত অবস্থায় ইউনুস 'আলাইহিস সালাম তাদের ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন এ কথা ভেবে যে পৃথিবীর ব্যাপ্তি অনেক, গ্রামের সংখ্যা বহু ও জাতির ধরন বিভিন্ন। ফলে আল্লাহ একে সংকীর্ণ করবেন না। আর এরা যেহেতু দাওয়াতের অবাধ্যতায় অপরিবর্তিত, সেহেতু আল্লাহ হয়তো অন্য জাতিকে তাঁর প্রতি ঝুঁকে দেবেন। আর এটাই আল্লাহর বাণীর মর্ম: "আর স্মরণ কর যুন-নূনের কথা, যখন সে রাগান্বিত অবস্থায় চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল যে, আমি তার ওপর সংকীর্ণ করব না।" {সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৮৭}

অর্থাৎ তার জন্য দুনিয়াকে সংকীর্ণ করব না। এদিকে ইউনুস 'আলাইহিস সালামের উম্মত যখন দেখল নবী চলে গেছেন এবং তাদের ওপর আযাব অবতরণ অবধারিত, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরে তাওবা ও অনুশোচনা ঢেলে দিলেন। নবীর সঙ্গে কৃত আচরণের জন্য তারা অনুতপ্ত হলো। আল্লাহর প্রতি বিনত হলো এবং তাঁর সামনে বিগলিত হলো। এ ছিল এক বড় মুহূর্ত। ফলে নিজ শক্তি ও সামর্থ্য এবং দয়া ও করুণায় আল্লাহ তাদের পরিত্রাণ দিলেন। তাদের আযাব উঠিয়ে নিলেন যার কারণ ও অনুঘটক কেবল তাদের সঙ্গেই মিলে গিয়েছিল, তারা ছাড়া অন্য কারও ছিলো না। যখনই কোনো উম্মত তাদের নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে অতঃপর তাদের ওপর আযাব নাযিল হয়েছে, তখন তারা ঈমান এনেছে আর সে ঈমান তাদের কাজে এসেছে এমনটি দৃশ্যমান হয় না, তবে ইউনুসের কাওম এর ব্যতিক্রম। আল্লাহ তা'আলা সূরা ইউনুসে বলেন: "সুতরাং কেন হল না এমন এক জনপদ, যে ঈমান এনেছে এবং তার ঈমান তার উপকারে এসেছে? তবে ইউনুসের কওম ছাড়া যখন তারা ঈমান আনল, তখন আমরা তাদের থেকে দুনিয়ার জীবনের লাঞ্ছনাকর আযাব সরিয়ে দিলাম এবং আমরা তাদেরকে একটি সময় পর্যন্ত ভোগ করতে দিলাম।" {সূরা ইউনুস, আয়াত : ৯৮}

অসন্তুষ্টি ইউনুস 'আলাইহিস সালামকে সমুদ্রতীরে নিয়ে উপনীত করল। সেখানে তিনি যাত্রী ও মাল বোঝাই এক জাহাজে চড়লেন। মাঝ দরিয়ায় ঢেউ ও বাতাস জাহাজটিকে ঝুঁকিয়ে ফেলল। সহযাত্রীরা এ থেকে ইঙ্গিত খুঁজে পেল যে যাত্রীদের মধ্যে কেউ একজন রয়েছে যার ওপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট। তিনি কোনো অনুচিত কাজ করে এসেছেন। সেহেতু জাহাজটিকে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচাতে তাকে পানি ফেলে দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। অথবা ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচাতে জাহাজের বোঝা হাল্কা করতে চাইল। এ লক্ষ্যে তারা যাত্রীদের নামে লটারি দিল। দেখা

গেল ইউনুস 'আলাইহিস সালামের নামই বেরিয়ে এলো। তাদের অন্তর তাঁকে ফেলে দিলে সায় দিচ্ছিল না। কিন্তু বারবার লটারি দিলেও একের পর এক শুধু তার নামই বেরিয়ে আসতে থাকল। আল্লাহ বলেন: "আর নিশ্চয় ইউনুসও ছিল রাসূলদের একজন। যখন সে একটি বোঝাই নৌযানের দিকে পালিয়ে গিয়েছিল।" {সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ১২৯-১৪০}

আল্লাহ তাঁর বেরিয়ে যাওয়াকে পালানো বলেছেন যেভাবে গোলাম তার মুনিবকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। কারণ তিনি আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই জনপদ থেকে বেরিয়েছিলেন। পরের আয়াতে আল্লাহ বলেন: "অতঃপর সে লটারিতে অংশগ্রহণ করল এবং তাতে সে হেরে গেল।" {সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ১৪১}

এরপর তাকে সাগরে নিক্ষেপ করা হলো। আল্লাহ বলেন: "তারপর বড় মাছ তাকে গিলে ফেলল। আর সে (নিজেকে) ধিক্কার দিচ্ছিল।" {সূরা সাফফাত, আয়াত: ১৪২}

তিনি ধিক্কারযোগ্য হয়ে যান। কারণ তিনি সে মহান দায়িত্ব ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন আল্লাহ যা দিয়ে তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহ তাঁকে অনুমতি না দিতেই তিনি স্বজাতিকে ত্যাগ করে যাচ্ছিলেন অসন্তুষ্টিবশত। মাছ তাঁকে আহার বানাল অথচ তাঁর এতটুকু গোশত খেল না কিংবা তার কোনো হাড্ডিতে ঠোকর দিল না। মেছের পেটে তিনি থাকলেন যতক্ষণ আল্লাহ তাঁকে রাখতে চাইলেন। মাছের অন্ধকার, সাগরের অন্ধকার ও রাতের অন্ধকার- অন্ধকারের পর অন্ধকারে তিনি নিজের রবকে কাতরভাবে ডাকলেন: "আপনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয় আমি ছিলাম যালিম।" {সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৮৭}

বর্ণিত হয়েছে যে ফেরেশতারা তাঁর এ কাতর প্রার্থনা শুনে বললেন, হে রব, এ দেখি অচেনা দেশ থেকে আসা চেনা মানুষের ক্ষীণ কণ্ঠ! আল্লাহ তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করলেন। আল্লাহর ভাষায়: "অতঃপর আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং দুশ্চিন্তা থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলাম। আর এভাবেই আমরা মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।" {সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৮৮}

এমন ঘনঘোর বিপদে ইউনুস 'আলাইহিস সালাম মাছের পেটে আল্লাহর তাছবীহ পড়তে লাগলেন এবং দো'আ করতে থাকলেন। মাছ তাঁকে সমুদ্রতীরে উগড়ে দিল। এমন স্থানে যেখানে কোনো উদ্ভিদ বা ছায়া ছিল না। তিনি তখন শারীরিকভাবে একেবারে দুর্বল। আল্লাহ বলেন: "অতঃপর আমরা তাকে তৃণলতাহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম এবং সে ছিল অসুস্থ। আর আমরা একটি ইয়াকতীন (লাউজাতীয়) গাছ তার ওপর উদগত করলাম।" {সূরা আস-সাফফাত, আয়াত : ১৪৫-১৪৬}

এটি এমন গাছ যা তাকে বড় পাতা দিয়ে ছায়া দেয় এবং তার গায়ে মাছি বসতে বাধা দেয়। নবী ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে তিনি লাউ পছন্দ করতেন এবং বাসনের পাশ থেকে খুঁজে নিয়ে খেতেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে উম্মতের কাছে ফিরে যেতে নির্দেশ দেন। তারা তাঁকে সত্য বলে গ্রহণ করে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনে। তাদের সংখ্যা ছিল অন্যূন এক লাখ। এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবীকে সম্মানিত করা ও শ্রেষ্ঠত্ব দানের নমুনা। আর আমাদের নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন উম্মতের সংখ্যার দিক দিয়ে সব নবীর সেরা। যেমন আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'প্রত্যেক নবীকেই এমন কিছু (অলৌকিক নিদর্শন) প্রদান করা হয়েছে যার অনুযায়ী তাঁর ওপর মানুষ ঈমান এনেছে। আর আমাকে যে নিদর্শন দেওয়া হয়েছে তা হলো অহী, যা আল্লাহ আমার ওপর প্রত্যাদেশ হিসেবে প্রেরণ করেছেন। (যা কিয়ামত পর্যন্ত অবিকল টিকে থাকবে)। সেহেতু আমি আশা করি আমি কিয়ামতের দিন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুসারীর অধিকারী হব।' [বুখারী : ৪৯৮১]

এ হলেন ইউনুস 'আলাইহিস সালাম। আল্লাহর একজন সম্মানিত নবী। আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'কারও জন্য এমন বলা সমীচীন নয় যে আমি ইউনুস ইবন মাত্তা থেকে উত্তম।' [বুখারী : ৪৬০৩; মুসলিম : ২৩৭৬]

এমন সম্মানিত নবী সূরা নিসা ও আন'আমে উল্লেখিত সম্মানিত নবীদের কাতারে যাকে রাখা হয়েছে আর যাদের সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অনুসরণের। আল্লাহর ভাষায়: "এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত করেছেন। অতএব তাদের হিদায়াত তুমি অনুসরণ কর।" {সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৯০}

আর ইউনুস 'আলাইহিম সালামের এ ঘটনায় মহান অনুসরণ হলো ওই হিদায়াত বা পথনির্দেশ যার কথা আল্লাহ বলেছেন নিম্নোক্ত আয়াতে। আল্লাহ বলেছেন: "অতএব তুমি তোমার রবের হুকুমের জন্য ধৈর্যধারণ কর। আর তুমি মাছওয়ালার মত হয়ো না, যখন সে দুঃখে কাতর হয়ে ডেকেছিল।" {সূরা কলম, আয়াত: ৪৮}

অতএব দাওয়াতপ্রচারকদের কাজ হবে যে কোনো মূল্যে নিজের দায়িত্ব পালন করে যাওয়া এবং এ পথে পাওয়া কষ্ট ও মিথ্যা অভিযোগে ধৈর্য ধরা। অটল অবিচল থাকা এবং বারবার সুপথে আহ্বান অব্যাহত রাখা।। মানুষ যতই বিমুখতা দেখাক তাদের সংশোধন থেকে নিরাশ

না হওয়া। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদেরও অবশ্য কর্তব্য হবে, ধৈর্যধারণ করা এবং সহ্য করা। অবিচল থাকা এবং অধ্যবসায় চালিয়ে যাওয়া। সর্বোপরি বারবার দাওয়াতের পুনরাবৃত্তি করতে থাকা। তেমনি তার জন্য বৈধ নয় মানুষের অন্তর সংশোধিত হওয়া বা হৃদয় সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে হতাশ হওয়া। যতই তারা অস্বীকার বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক কিংবা অবাধ্যতা ও বিমুখতা দেখাক না কেন।

ডাকে সাড়া না দেওয়ায় মানুষের ওপর রাগ করা তো সংশোধন প্রত্যাশীদের জন্য সহজ বৈ কি। কিন্তু এটা তো সত্যকে সাহায্য করবে না। মুমিন তাই নিজের ক্রোধ হজম করে এবং চলমান থাকে। তার জন্য সবরই শ্রেয়। আর শেষ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য। আল্লাহর ভাষায়: "আর অবশ্যই আমরা জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়। সুতরাং তুমি তোমার রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ কর এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর ইয়াকীন (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর।" {সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৯৭-৯৯}

হে বিপন্ন ব্যথিত চিন্তিত ব্যক্তি, নবীদের দোয়ায় তোমার জন্য রয়েছে আদর্শ। ইমাম আহমদ ও তিরমিযী রহিমাহুমাল্লাহ সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাছ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'মাছের পেটে করা জুন্নুনের (মাছওয়ালা অর্থাৎ ইউনুস 'আলাইহিস সালামের) দো'আ 'আপনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, আপনি সপ্রশংস মহান, নিশ্চয় আমি জুলুমকারীদের অন্তর্ভুক্ত।' (উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লা আনতা ছুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনায যোলিমীন) এটি যে কোনো মুসলিম কোনো সময় পড়বে, আল্লাহ অবশ্যই তার দো'আ কবুল করবেন।' [তিরমিযী : ৩৫০৫; মুসনাদ আহমাদ : ১৪৬২]

আমাদেরকে অবশ্যই অমূল্য এ দো'আটি ভেবে দেখা দরকার। এতে রয়েছে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা, অংশীদারিত্বের অস্বীকৃতি ও নিজের যাবতীয় ভুলের স্বীকারোক্তি। (অতএব নিজের দো'আ কবুলের জন্য এ তিন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে করা দরকার।)

ইমাম আহমদ (রা:) আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো বিপদ বা দুশ্চিন্তায় পড়ে বলবে (দু'আর উচ্চারণ), আল্লাহুম্মা ইন্নী 'আব্দুকা অবনু 'আব্দিকা অবনু 'আমাতিকা, না-সিয়াতী বিয়য়াদিকা, মা-দ্বিন ফিইয়্যা হুকমুকা, আদলুন ফিইয়্যা ক্বাদ্বা-উকা, আসআলুকা বিকুল্লিস্মিন হুয়া লাকা, সাম্মাইতা বিহী নাফসাকা আউ আনযালতাহূ ফী কিতা-বিকা, আউ আল্লামতাহূ আহাদাম মিন

খালক্বিকা, আও ইস্তা’’সারতা বিহী ফী ‘ইলমিল গাইবি ‘ইন্দাক; আন তাজ‘আলাল ক্বুরআ-না রাবী‘আ ক্বালবী অনূরা সাদরী অজালা-আ হুযনী অযাহা-বা হাম্মী।

অর্থ: ‘হে আল্লাহ, নিঃসন্দেহে আমি তোমার দাস, তোমার দাসের পুত্র ও তোমার দাসীর পুত্র, আমার ললাটের কেশগুচ্ছ তোমার হাতে। তোমার বিচার আমার জীবনে বহাল। তোমার মীমাংসা আমার ভাগ্যলিপিতে ন্যায়সঙ্গত। আমি তোমার নিকট তোমার প্রত্যেক সেই নামের অসীলায় প্রার্থনা করছি- যে নাম তুমি নিজে নিয়েছ। অথবা তুমি তোমার গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টির মধ্যে কাউকে তা শিখিয়েছ, অথবা তুমি তোমার গায়বী ইলমে নিজের নিকট গোপন রেখেছ, তুমি কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত কর, আমার বক্ষের জ্যোতি কর, আমার দুশ্চিন্তা দূর করার এবং আমার উদ্বেগ চলে যাওয়ার কারণ বানিয়ে দাও। আল্লাহ তার দুশ্চিন্তা দূর করবেন এবং তার বিষাদকে হর্ষে বা আনন্দে পরিণত করে দেবেন।’ [মুসনাদ আহমাদ : ৪৩১৮]

একইভাবে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপদের সময় বলতেন: উচ্চারণ: লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল আলীমুল হালীম, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুল ‘আরশিল আযীম, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুস সামা-ওয়া-তি ওয়ারাব্বুল আরদি ওয়ারাব্বুল আরশিল কারীম।
অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই; যিনি সর্বজ্ঞ, সহিষ্ণু। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই; যিনি মহান ‘আরশের প্রতিপালক। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য আরাধ্য নেই; যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও সম্মানিত ‘আরশের অধিপতি। [বুখারী : ৭৪২৬]

এ হলো দুশ্চিন্তা-টেনশনের নববী চিকিৎসা। যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সঙ্গে এসব পড়বে, আল্লাহ তার অন্তর উন্মোচন করে দেবেন ফলে তার কষ্টের কারণ দূর হয়ে যাবে।

সুত্রঃ শেইখ ড. সালেহ আলে তালেবের খুতবা হতে অনুদিত

হজরত জুলকিফল আ.

হযরত জুলকিফল আঃ এর ঘটনা -

ইবনু জারির ও আবু মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, জুলকিফল নবী নয় ছিলেন একজন সৎ মানুষ। তিনি তার সম্প্রদায়ের কফিল বা জিম্মাদার ছিলেন। তাদের প্রতি সুবিচার

করতেন সৎকাজের আদেশ করতেন। ফলে তার নামে হয়ে যায় কফিল -জিম্মাদার বা অভিভাবক।

মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ থেকে ইবনু জারির ও ইবনু আবি হাকিম বর্ণনা করেনি, আল ইয়াসা আলাইহিস সালাম যখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েন তখন তিনি বলেন, আমি যদি এমন কাউকে আমার স্থলাভিষিক্ত করে যেতে পারতাম যাকে আমি জীবিত থাকতেই দেখে যাব যে সে কিভাবে তার জিম্মাদারি আদায় করে। এই চিন্তা থেকে তিনি মানুষজনকে ডেকে এক জায়গায় জামায়াত করলেন এবং বললেন,কে আছো এমন, যে আমার পক্ষ থেকে তিনটি বিষয়ে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে? বিষয়গুলো হচ্ছে, দিনে রোজা রাখবে রাতে কিয়াম তথা ইবাদত বন্দেগীতে মশকুল থাকবে আর রাগ দমন করে চলবে। অশ্রুসিক্ত নয়নে এক লোক দাঁড়িয়ে বলল আমি! তিনি বললেন তুমি! দিনে রোজা রাখবে রাতে কিয়াম করবে এবং অমন করে চলতে পারবে? বলল জি হ্যাঁ। তিনি সেদিনের মতো বৈঠক শেষ করলেন। পরের দিন আবার মানুষ জড়ো হলো।তিনি একই প্রশ্ন করেন এবং মানুষ চুপ থাকলো। ওই ব্যক্তি আজও দাঁড়ালো এবং বলল, আমি আপনার স্থলাভিষিক্ত হব।

ইবলিস তখন তার শয়তান গ্রুপ কে বলল, তোমাদের কাজ হল তাকে বিভ্রান্ত করা। যে কোন মূল্যে প্রতিনিধি হওয়ার থেকে ঠকাতে হবে ।এক শয়তান বলল, তাকে আমার জন্য ছেড়ে দিন। সে একজন বয়স্ক গরিব মানুষের বেশে জুলকিফলের বাড়িতে তার ঘুমানোর নির্ধারিত সময়ে এসে হাজির হলো। তিনি মূলত রাত দিনের এই একটা সময়ে সামান্য ঘুমাতেন। মানুষরূপী শয়তান এসে তার দরজায় কড়া নাড়ল।উনি জিজ্ঞেস করলেন -কে?জবাব আসলো, আমি একজন মজলুমবৃদ্ধ। তিনি উঠে দরজা খুললেন এবং তার ঘটনা শুনলেন।সে ইনিয়ে বিনিয়ে ঘটনা এত দীর্ঘ করে বলল যে জুলকিফলের ঘুমের সময়টুকুই খেয়ে ফেলল।তিনি বললেন, ঠিক আছে বিকেলে যখন বিচারালয় বসবে তখন আমি তোমার হক আদায় করে দেবো।বিকেলে যখন বৈঠক বসলো তিনি মনে মনে লোকটাকে খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু মজলিসে লোকটির কোন দেখা পাওয়া গেল না। পরের দিন আবারো তাকে খুজলেন। কিন্তু না, আজও তাকে পাওয়া গেল না। এর পরের দিন ঠিক ঘুমের সময় তিনি প্রস্তুতি নিয়ে বিছানায় কেবল গা ছাড়লেন, লোকটা আবার এসে দরজায় কড়াঘাত করলো, তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুলে দেখেন সেদিনের লোকটি ধরা যায় দাঁড়ানো। তিনি বললেন, তোমাকে না বললাম বিচার বসলে আসবে, তখন আসলে না কেন? মানুষরূপী শয়তান জবাব দিল, আমার প্রতিপক্ষের লোকেরা মারাত্মক খারাপ তারা যখন আপনাকে দেখলো বলল,তারা আমার হক দিয়ে দেবে, যখনই আপনি মজলিস ছেড়ে চলে আসলেন তারা আবার অস্বীকার করে বসলো। তিনি বললেন, ঠিক আছে এখন যাও বিকেলে এসো যখন বৈঠক বসবে। কিন্তু লোকটি এটা সেটা বলে

জুলকিফলের পুরো ঘুমের সময়টাই শেষ করে ফেলল। তিনি এ দিনও ঘুমাতে পারলেন না। বিকেলে লোকটির অপেক্ষা করলেন। কিন্তু তাকে আজকেও পাওয়া গেল না। ফলে তিনি ঘরের লোকজনকে বলে রাখলেন আমার ঘুমানোর সময় হলে কেউ যেন দরজায় করাঘাত না করতে পারে নজর রেখো। আমার প্রচন্ড ঘুম পেয়েছে। যখন ঘুমের নির্ধারিত সময় এল তিনি ঘুমাতে গেলেন। তখন এক লোক জুলকিফলের দরজায় প্রহরীকে বলল, আমাকে একটু সময় দিন - একটু সময়। আমি গতকাল তার কাছে এসেছিলাম আমার বিষয়টি তাকে অবগত করেছিলাম। প্রহরী বলল, অসম্ভব আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, এ সময় কাউকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। প্রহরী কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়লে হঠাৎ দেখতে পায় ঘরের বেড়া ফাঁকা এবং লোকটি ঘরের ভেতর থেকে দরজায় কড়া নাড়ছে। তিনি জেগে উঠে প্রহরীকে বললেন - তোমাকে তো কাউকে আসতে না দিতে বললাম। তিনি বললেন, খোদার কসম আমি তাকে যেতে দেইনি।দেখুন সে কিভাবে ঘরে ডুকেছে!তিনি চেয়ে দেখেন দরজাটা তো ঠিকই ভেতর থেকে লাগানো আবার এই লোকটার তার সাথে ঘরের ভেতরে- কিভাবে কি ? তিনি বুঝে গেলেন বিষয়টি। বললেন, তুই আল্লাহর দুশমন শয়তান? লোকটির জবাব দিল, হ্যাঁ। আমি এসেছি আপনাকে রাগিয়ে দিতে। এই ঘটনার পর থেকে তাকে জুলকিফল বা জিম্মাদার বলা হয়। কেননা, তিনি নিজ জিম্মাদারী পালন করেছিলেন।

উক্ত ঘটনার কারণেই তাঁকে ‘যুল-কিফল’ (ذو الكفل)। উপাধি দেওয়া হয়। যার অর্থ, দায়িত্ব পূর্ণকারী ব্যক্তি।[1]

শিক্ষণীয় বিষয় :

(১) নবীদের প্রতিনিধি হওয়ার জন্য রক্ত, বর্ণ ও গোত্রীয় মর্যাদা শর্ত নয়। বরং মৌলিক শর্ত হ’ল- তাক্বওয়া ও আনুগত্যশীলতা।

(২) শয়তান বিশেষ করে পরহেযগার মুমিনের প্রকাশ্য দুশমন। কিন্তু ঈমানী দৃঢ়তার কাছে সে পরাজিত হয়।

(৩) ধৈর্যগুণ হ’ল সফলতার মাপকাঠি। তাক্বওয়া ও ছবর একত্রিত হ’লে মুমিন সর্বদা বিজয়ী থাকে।

(৪) শুধু নিজস্ব ইবাদতই যথেষ্ট নয়। বরং জনগণের খেদমতে সময় ব্যয় করাই হল প্রকৃত মুমিনের কর্তব্য।

(৫) শয়তানের শয়তানী ধরে ফেলাটা মুমিনের সুক্ষ্মদর্শিতার অন্যতম লক্ষণ। অতএব কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন চিন্তা ও পরামর্শ সম্মুখে উপস্থিত হ'লেই বুঝে নিতে হবে যে, এটি শয়তানী ধোঁকা মাত্র।

সংশয় নিরসন :

যুল-কিফল একজন নবী ও একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি ছিলেন। পবিত্র কুরআনে তাঁকে নবীদের সাথেই দু'স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন,

সূরা আম্বিয়া ৮৫-৮৬ আয়াতে বলা হয়েছে,

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ-)الأنبياء ৮৫-৮৬)-

'আর ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল-কিফল, সকলেই ছিল ধৈর্যশীলগণের অন্তর্ভুক্ত'। 'আর আমরা তাদেরকে আমাদের অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই তারা ছিল সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত' (আম্বিয়া ২১/৮৫-৮৬)। (ক) উক্ত আয়াত দ্বয়ের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي- 'পূর্বাপর সম্পর্কে এটা স্পষ্ট যে, নবীগণের তালিকায় নবী ব্যতীত অন্যদের নাম যুক্ত হয় না। তবে অন্যেরা কেউ বলেছেন, তিনি একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি ছিলেন, কেউ বলেছেন, তিনি একজন ন্যায়পরায়ন শাসক ছিলেন। ইবনু জারীর এ ব্যাপারে চুপ থেকেছেন'।

হযরত হারুন আলাইহিস সালাম

হযরত হারুন আলাইহিস সালামের পরিচয়

হযরত হারুন আলাইহিস সালাম প্রাচীন মিশরে বনী ইসরাঈল বংশের ইমরানের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধরের একজন। তার ভাই হযরত মুসা আলাইহি সালামও একজন নবী ছিলেন।

হারুন আলাইহিস সালাম তিনি আল্লাহর একজন রাসূল ছিলেন। হযরত মুসা কালিমুল্লাহ আলাইহিস সালাম এর বড় ভাই। তিনি হযরত মূসা আলাইহি সালামের তিন বছরের বড়। আল্লাহ যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে রাসুল নিয়োগ করেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন, যেন তার ভাই হারুনকেও রাসূল নিয়োগ করে তার হাত শক্ত করেন। আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন এবং হারুনকে মুসার সহযোগী রাসূল নিয়োগ করেন। হযরত হারুন ছিলেন বনি ইসরাইলের শ্রেষ্ঠ রাসূলদের একজন।তিনি ছিলেন সুবক্তা।

হযরত হারুন আলাইহিস সালাম এর দাওয়াতী ও সাংগঠনিক জীবন

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ١١٤ وَنَجَّيْنَٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١١٥ وَنَصَرْنَٰهُمْ
فَكَانُوا۟ هُمُ ٱلْغَٰلِبِينَ وَنَصَرْنَٰهُمْ فَكَانُوا۟ هُمُ ٱلْغَٰلِبِينَ ١١٦ وَءَاتَيْنَٰهُمَا ٱلْكِتَٰبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١١٧ وَهَدَيْنَٰهُمَا
ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١١٨ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى ٱلْءَاخِرِينَ ١١٩ سَلَٰمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ١٢٠ إِنَّا
كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٢١ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ

আমি মুসা ও হারুন এর প্রতি অনুগ্রহ করেছি।তাঁদের উভয়কে আমি উদ্ধার করেছি মহাকষ্ট থেকে। আমি তাদের সাহায্য করেছি। পলে তারা বিজয়ী হয়েছে। তাঁদের আমি সঠিক পথ দেখিয়েছি। তাদের উভয়কে আমি সুস্পষ্ট কিতাব দান করেছি। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তাদের উভয়ের সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছি। মুসাও হারুনের প্রতি বর্ষিত হোক সালাম। এভাবে আমি উপকারী লোকদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। আসলে ওরা দুজনই ছিল আমার প্রতি বিশ্বস্ত দাস।(সূরা সাফফাত, আয়াত ১১৪ - ১২২)

আল্লাহর এই বাণী থেকে হযরত হারুন আলাইহি সালামের সঠিক মর্যাদা বুঝা যায়। তিনি তার ভাই হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর সাথে ফেরাউনের দরবারে উপস্থিত হন। ফিরআউনকে দাওয়াত প্রদান করুন।ফিরআউন তাদের দুজনকেই মিথ্যাবাদী বলে অস্বীকার করে। সে বলে, এরা দুই ভাই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার জন্য এসেছে। অতঃপর ফেরাউন হযরত মুসা ও হারুন আলাইহিস সালাম এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে।অতঃপর মুসা ও হারুনের সাথে ফেরাউনের যে দ্বন্দ্ব সংঘাত হয়, তারঁ পরিণতিতে আল্লাহ তাআলা ফেরাউন কে ধ্বংস ও নির্মূল করে

দেন।ফেরাউন ডুবে মরার পর সিনাই উপত্যকায় থাকাকালে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম হযরত হারুন আলাইহি সালামকে নিজের খলিফা বা ভারপ্রাপ্ত নেতা মনোনীত করে ৪০ দিনের জন্য তুর পাহাড়ে নির্জনবাসে যান। হযরত হারুন আলাইহিস সালাম ভারপ্রাপ্ত নেতা থাকাকালেই সামেরি বাছুর বানিয়ে সেটার পূজা করতে বলে সকলকে।হযরত হারুন আলাইহিস সালাম তাকে বারণ করেন। এ ব্যাপারে তিনি কঠোর পদক্ষেপ নিতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু জাতির দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ায় তিনি সেই পদক্ষেপ নেননি। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ৪০ দিন পর তাওরাত নিয়ে ফেরত এসে হযরত হারুন আলাইহিস সালামের উপর রাগান্বিত হয়। কুরআনে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে -
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ ٩٠
قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ٩١ قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ۙ
٩٢ اَلَّا تَتَّبِعَنِۜ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ٩٣ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ
فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ

(বাছুর পূজা করতে নিষেধ করে) হারুন তাঁদের বলেছিল, সে আমার জাতি, তোমরা তো পরীক্ষায় পড়েছ। তোমাদের প্রভু বড় করুণাময়। কাজেই তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার নির্দেশ মানো। কিন্তু তারা তাকে বলে দিলো,মুসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজা করব। মুসা ফিরে এসে বলল,এ হারুন, তুমি যখন দেখলে এরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন এদেরকে আমার অনুসরণের পথে আনতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে ? তুমি কি আমার হুকুম অমান্য করলে? হারুন বলল, হে আমার সহোদর ভাই, আমার দাড়ি ও চুল ধরে টেনো না।আমার ভয় হচ্ছিল তুমি এসে বলবে, হারুন, তুমি কেন বনি ইসরাইলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করলে? কেন আমার কথা রক্ষা করলে না? (সূরা তাহা, আয়াত:৯০-৯৪)

অন্যস্থানে ইরশাদ হয়েছে -
মূসা নিজের ভাইয়ের চুল ধরে টানলো। হারুন বলল, হে আমার সহোদর,এই লোকগুলো আমায় কোন ঠাসা করে ফেলেছিল এবং আমাকে হত্যার জন্য উদ্যত হয়েছিল। কাজেই তুমি শত্রুদের কাছে আমায় হেয় করো না এবং আমাকে জালিম গণ্য করো না। তখন মুসা দোয়া করলো হে প্রভু, আমাকে আর আমার ভাইকে ক্ষমা করে দাও। আর আমাদেরকে প্রবেশ করাও তোমার অনুগ্রহের মধ্যে। তুমি তো সব দয়াবানের বড় দয়াবান। (সূরা আরাফ, আয়াত :১৫০-১৫১)
এ থেকে বুঝা যায়, হযরত হারুন আলাইহিস সালাম জীবনের ঝুঁকি নিয়েও নিজ কওমকে সত্য পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হোক এটা তিনি চাননি। আসলে তিনি ছিলেন বড়ই প্রজ্ঞাবান ও মহান রাসূল।

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মৃত্যুর ১১ মাস পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেন। ভাই মুসা আলাইহিস সালামের মতোই তিনি ছিলেন একজন বলিষ্ঠ সংগ্রামী পুরুষ। তারা দুই ভাই নেতৃত্ব প্রদান করেন এক বিশাল জাতির।

হযরত হারুন আলাইহিস সালামের সমাধি

ইসলামী ইতিহাস অনুযায়ী হযরত হারুন আলাইহি সালামের সমাধি জর্ডানের পেত্রার নিকটবর্তী 'জাবালে হারুন 'নামক পাহাড়ে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৩৫০.০মি উপরে অবস্থিত এই স্থানটি এই অঞ্চলের উচ্চতম স্থান। সেখানকার স্থানীয় জনগণের কাছে এটি একটি পবিত্র স্থান হিসেবে পরিণত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে মামলুকরা সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে। মসজিদটির সাদা গম্বুজ পেত্রার আশেপাশের বেশিরভাগ অঞ্চল থেকে দৃশ্যমান। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

হজরত মুসা আলাইহিস সালাম

মূসা (আঃ)-এর পরিচয়

-موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوى بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم السلام

মূসা ইবনে ইমরান বিন ক্বাহেছ বিন ‘আযের বিন লাভী বিন ইয়াকূব বিন ইসহাক্ব বিন ইবরাহীম (আঃ)।[৪] অর্থাৎ মূসা হ’লেন ইবরাহীম (আঃ)-এর ৮ম অধঃস্তন পুরুষ। মূসা (আঃ)-এর পিতার নাম ছিল ‘ইমরান’ ও মাতার নাম ছিল ‘ইউহানিব’। তবে মায়ের নামের ব্যাপারে মতভেদ আছে।[9] উল্লেখ্য যে, মারিয়াম (আঃ)-এর পিতার নামও ছিল ‘ইমরান’। যিনি ছিলেন হযরত ঈসা (আঃ)-এর নানা। মূসা ও ঈসা উভয় নবীই ছিলেন বনু ইস্রাঈল বংশীয় এবং উভয়ে বনু ইস্রাঈলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন (সাজদাহ ৩২/২৩, ছফ ৬১/৬)। মূসার জন্ম হয় মিসরে এবং লালিত-পালিত হন মিসর সম্রাট ফেরাঊনের ঘরে। তাঁর সহোদর ভাই হারূণ (আঃ) ছিলেন তাঁর চেয়ে তিন বছরের বড় এবং তিনি মূসা (আঃ)-এর তিন বছর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। উভয়ের মৃত্যু হয় মিসর ও শাম-এর মধ্যবর্তী তীহ্ প্রান্তরে বনু ইস্রাঈলের ৪০ বছর আটক থাকাকালীন সময়ে। মাওলানা মওদূদী বলেন, মূসা (আঃ) পঞ্চাশ বছর বয়সে নবী হয়ে ফেরাঊনের দরবারে পৌঁছেন। অতঃপর তেইশ বছর দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের পর ফেরাঊন ডুবে মরে এবং বনু ইস্রাঈল মিসর থেকে বেরিয়ে যায়। এ সময় মূসা (আঃ)-এর বয়স ছিল সম্ভবতঃ আশি বছর।[10] তবে মুফতী মুহাম্মাদ শফী বলেন, ফেরাঊনের জাদুকরদের সাথে

মুকাবিলার ঘটনার পর ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী মূসা (আঃ) বিশ বছর যাবত মিসরে অবস্থান করেন। এ সময় আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে নয়টি মু'জেযা দান করেন।

উল্লেখ্য যে, আদম, ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আঃ) ব্যতীত প্রায় সকল নবীই চল্লিশ বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেছিলেন। মূসাও চল্লিশ বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেছিলেন বলে অধিকাংশ বিদ্বান মত পোষণ করেছেন।[11] সেমতে আমরা মূসা (আঃ)-এর বয়সকে নিম্নরূপে ভাগ করতে পারি। যেমন, প্রথম ৩০ বছর মিসরে, তারপর ১০ বছর মাদিয়ানে, তারপর মিসরে ফেরার পথে তূর পাহাড়ের নিকটে 'তুবা' (طُوًى) উপত্যকায় ৪০ বছর বয়সে নবুঅত লাভ। অতঃপর ২০ বছর মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদেরকে তাওহীদের দাওয়াত প্রদান। তারপর ৬০ বছর বয়সে বনু ইস্রাঈলদের নিয়ে মিসর হ'তে প্রস্থান এবং ফেরাঊনের সলিল সমাধি। অতঃপর আদি বাসস্থান কেন'আন অধিকারী আমালেক্বাদের বিরুদ্ধে জিহাদের হুকুম অমান্য করায় অবাধ্য ইস্রাঈলীদের নিয়ে ৪০ বছর যাবত তীহ্ প্রান্তরে উন্মুক্ত কারাগারে অবস্থান ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের সন্নিকটে মৃত্যু সম্ভবতঃ ৮০ থেকে ১০০ বছর বয়সের মধ্যে। মূসা (আঃ)-এর কবর হয় বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উপকণ্ঠে। আমাদের নবী (ছাঃ) সেখানে একটি লাল টিবির দিকে ইশারা করে সেস্থানেই মূসা (আঃ)-এর কবর হয়েছে বলে জানিয়েছেন।[12]

উল্লেখ্য যে, আদম (আঃ) থেকে ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত ১০/১২ জন নবী বাদে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীতে আগত সর্বমোট এক লক্ষ চবিবশ হাযার নবী-রাসূলের[13] প্রায় সবাই ইস্রাঈল বংশের ছিলেন এবং তাঁরা ছিলেন সেমেটিক। কেননা ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন সাম বিন নূহ-এর ৯ম অধঃস্তন পুরুষ। এজন্য ইবরাহীমকে 'আবুল আম্বিয়া' বা নবীদের পিতা বলা হয়।

[৪]. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২২।

মূসা ও ফেরাঊনের কাহিনী

সুদ্দী ও মুররাহ প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস ও আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) এবং বহু সংখ্যক ছাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, ফেরাঊন একদা স্বপ্নে দেখেন যে, বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিক হ'তে একটি আগুন এসে মিসরের ঘর-বাড়ি ও মূল অধিবাসী ক্বিবতীদের জ্বালিয়ে দিচ্ছে। অথচ অভিবাসী বনু ইস্রাঈলদের কিছুই হচ্ছে না। ভীত-চকিত অবস্থায় তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। অতঃপর দেশের বড় বড় জ্যোতিষী ও জাদুকরদের সমবেত করলেন এবং তাদের সম্মুখে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বর্ণনা দিলেন ও এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। জ্যোতিষীগণ

বলল যে, অতি সত্বর বনু ইস্রাঈলের মধ্যে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। যার হাতে মিসরীয়দের ধ্বংস নেমে আসবে'।[14]

মিসর সম্রাট ফেরাঊন জ্যোতিষীদের মাধ্যমে যখন জানতে পারলেন যে, অতি সত্বর ইস্রাঈল বংশে এমন একটা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যে তার সাম্রাজ্যের পতন ঘটাবে। তখন উক্ত সন্তানের জন্ম রোধের কৌশল হিসাবে ফেরাঊন বনু ইস্রাঈলদের ঘরে নবজাত সকল পুত্র সন্তানকে ব্যাপকহারে হত্যার নির্দেশ দিল। উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে হত্যা করতে থাকলে এক সময় বনু ইস্রাঈল কওম যুবক শূন্য হয়ে যাবে। বৃদ্ধরাও মারা যাবে। মহিলারা সব দাসীবৃত্তিতে বাধ্য হবে। অথচ বনু ইস্রাঈলগণ ছিল মিসরের শাসক শ্রেণী এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জাতি। এই দূরদর্শী কপট পরিকল্পনা নিয়ে ফেরাঊন ও তার মন্ত্রীগণ সারা দেশে একদল ধাত্রী মহিলা ও ছুরিধারী জাল্লাদ নিয়োগ করে। মহিলারা বাড়ী বাড়ী গিয়ে বনু ইস্রাঈলের গর্ভবতী মহিলাদের তালিকা করত এবং প্রসবের দিন হাযির হয়ে দেখত, ছেলে না মেয়ে। ছেলে হ'লে পুরুষ জাল্লাদকে খবর দিত। সে এসে ছুরি দিয়ে মায়ের সামনে সন্তানকে যবহ করে ফেলে রেখে চলে যেত।[15] এভাবে বনু ইস্রাঈলের ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়ে গেল। ইবনু কাছীর বলেন, একাধিক মুফাসসির বলেছেন যে, শাসকদল ক্বিবতীরা ফেরাঊনের কাছে গিয়ে অভিযোগ করল যে, এভাবে পুত্র সন্তান হত্যা করায় বনু ইস্রাঈলের কর্মজীবী ও শ্রমিক শ্রেণীর ঘাটতি হচ্ছে। যাতে তাদের কর্মী সংকট দেখা দিয়েছে। তখন ফেরাঊন এক বছর অন্তর অন্তর পুত্র হত্যার নির্দেশ দেয়। এতে বাদ পড়া বছরে হারূণের জন্ম হয়। কিন্তু হত্যার বছরে মূসার জন্ম হয়।[16] ফলে পিতা-মাতা তাদের নবজাত সন্তানের নিশ্চিত হত্যার আশংকায় দারুণভাবে ভীত হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ মূসা (আঃ)-এর মায়ের অন্তরে 'ইলহাম' করেন। যেমন আল্লাহ পরবর্তীতে মূসাকে বলেন,

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى- إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى- أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي-
(طه ৩৭-৩৯)-

'আমরা তোমার উপর আরো একবার অনুগ্রহ করেছিলাম'। 'যখন আমরা তোমার মাকে প্রত্যাদেশ করেছিলাম, যা প্রত্যাদেশ করা হয়'। '(এই মর্মে যে,) তোমার নবজাত সন্তানকে সিন্দুকে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দাও'। 'অতঃপর নদী তাকে তীরে ঠেলে দেবে। অতঃপর আমার শত্রু ও তার শত্রু (ফেরাঊন) তাকে উঠিয়ে নেবে এবং আমি তোমার উপর আমার পক্ষ হ'তে বিশেষ মহববত নিক্ষেপ করেছিলাম এবং তা এজন্য যে, তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও' (ত্বোয়াহা ২০/৩৭-৩৯)। বিষয়টি আল্লাহ অন্যত্র বলেন এভাবে,

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيْهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ- (القصص ٩)-

‘আমরা মূসার মায়ের কাছে প্রত্যাদেশ করলাম এই মর্মে যে, তুমি ছেলেকে দুধ পান করাও। অতঃপর তার জীবনের ব্যাপারে যখন শংকিত হবে, তখন তাকে নদীতে নিক্ষেপ করবে। তুমি ভীত হয়ো না ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। আমরা ওকে তোমার কাছেই ফিরিয়ে দেব এবং ওকে নবীদের অন্তর্ভুক্ত করব’ (ক্বাছাছ ২৮/৭)। মূলতঃ শেষের দু’টি ওয়াদাই তাঁর মাকে নিশ্চিন্ত ও উদ্বুদ্ধ করে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوْسَى فَارِغاً إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهِ لَوْلاَ أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ- (القصص ١٥)-

‘মূসা জননীর অন্তর (কেবলি মূসার চিন্তায়) বিভোর হয়ে পড়ল। যদি আমরা তার অন্তরকে সুদৃঢ় করে না দিতাম, তাহ’লে সে মূসার (জন্য অস্থিরতার) বিষয়টি প্রকাশ করেই ফেলত। (আমরা তার অন্তরকে দৃঢ় করেছিলাম এ কারণে যে) সে যেন আল্লাহর উপরে প্রত্যয়শীলদের অন্তর্ভুক্ত থাকে’ (ক্বাছাছ ২৮/১০)।

[14]. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২২ পৃঃ।
[15]. তাফসীর ইবনু কাছীর, ক্বাছাছ ৮, ৯।
[16]. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২৩ পৃঃ।

মূসা নদীতে নিক্ষিপ্ত হ’লেন

ফেরাঊনের সৈন্যদের হাতে নিহত হবার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিলে আল্লাহর প্রত্যাদেশ (ইলহাম) অনুযায়ী পিতা-মাতা তাদের প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকে সিন্দুকে ভরে বাড়ীর পাশের নীল নদীতে ভাসিয়ে দিলেন।[17] অতঃপর স্রোতের সাথে সাথে সিন্দুকটি এগিয়ে চলল। ওদিকে মূসার (বড়) বোন তার মায়ের হুকুমে (ক্বাছাছ ২৮/১১) সিন্দুকটিকে অনুসরণ করে নদীর কিনারা দিয়ে চলতে লাগল (ত্বোয়াহা ২০/৪০)। এক সময় তা ফেরাঊনের প্রাসাদের ঘাটে এসে ভিড়ল। ফেরাঊনের পুণ্যবতী স্ত্রী আসিয়া (آسية) বিনতে মুযাহিম ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চাটিকে দেখে অভিভূত হয়ে পড়লেন। ফেরাঊন তাকে বনু ইস্রাঈল সন্তান ভেবে হত্যা করতে চাইল। কিন্তু সন্তানহীনা স্ত্রীর অপত্য স্নেহের কারণে তা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ফেরাঊন নিজে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। কারণ আল্লাহ মূসার চেহারার মধ্যে বিশেষ একটা মায়াময় কমনীয়তা দান করেছিলেন (ত্বোয়াহা ২০/৩৯)। যাকে দেখলেই মায়া পড়ে যেত। ফেরাঊনের

হৃদয়ের পাষাণ গলতে সেটুকুই যথেষ্ট ছিল। বস্ত্ততঃ এটাও ছিল আল্লাহর মহা পরিকল্পনারই অংশ বিশেষ। ফুটফুটে শিশুটিকে দেখে ফেরাঊনের স্ত্রী তার স্বামীকে বললেন,

-وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لاَ تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَّنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ (القصص ٩)-

‘এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি। একে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি’। আল্লাহ বলেন, ‘অথচ তারা (আমার কৌশল) বুঝতে পারল না’ (ক্বাছাছ ২৮/৯)। মূসা এক্ষণে ফেরাঊনের স্ত্রীর কোলে পুত্রস্নেহ পেতে শুরু করলেন। অতঃপর বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য রাণীর নির্দেশে বাজারে বহু ধাত্রীর কাছে নিয়ে যাওয়া হ’ল। কিন্তু মূসা কারুরই বুকে মুখ দিচ্ছেন না। আল্লাহ বলেন, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ- (القصص ١٢)- ‘আমরা পূর্ব থেকেই অন্যের দুধ খাওয়া থেকে মূসাকে বিরত রেখেছিলাম’ (ক্বাছাছ ২৮/১২)। এমন সময় অপেক্ষারত মূসার ভগিনী বলল, ‘আমি কি আপনাদেরকে এমন এক পরিবারের খবর দিব, যারা আপনাদের জন্য এ শিশু পুত্রের লালন-পালন করবে এবং তারা এর শুভাকাংখী’? (ক্বাছাছ ২৮/১২)। রাণীর সম্মতিক্রমে মূসাকে প্রস্তাবিত ধাত্রীগৃহে প্রেরণ করা হ’ল। মূসা খুশী মনে মায়ের দুধ গ্রহণ করলেন। অতঃপর মায়ের কাছে রাজকীয় ভাতা ও উপঢৌকনাদি প্রেরিত হ’তে থাকল।[18] এভাবে আল্লাহর অপার অনুগ্রহে মূসা তার মায়ের কোলে ফিরে এলেন। এভাবে একদিকে পুত্র হত্যার ভয়ংকর আতংক হ’তে মা-বাবা মুক্তি পেলেন ও নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া সন্তানকে পুনরায় বুকে ফিরে পেয়ে তাদের হৃদয় শীতল হ’ল। অন্যদিকে বহু মূল্যের রাজকীয় ভাতা পেয়ে সংসার যাত্রা নির্বাহের দুশ্চিন্তা হ’তে তারা মুক্ত হ’লেন। সাথে সাথে সম্রাট নিয়োজিত ধাত্রী হিসাবে ও সম্রাট পরিবারের সাথে বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার ফলে তাঁদের পরিবারের সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেল। এভাবেই ফেরাঊনী কৌশলের উপরে আল্লাহর কৌশল বিজয়ী হ’ল। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

আল্লাহ বলেন, وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ- (النمل ٥٠)- ‘তারা চক্রান্ত করেছিল এবং আমরাও কৌশল করেছিলাম। কিন্তু তারা (আমাদের কৌশল) বুঝতে পারেনি’ (নমল ২৭/৫০)।

[17]. তাফসীর ইবনু কাছীর, ক্বাছাছ ৭ আয়াত।
[18]. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১/২২৫; ঐ, তাফসীর সূরা ত্বোয়াহা ৪০ আয়াত, নাসাঈ, ‘হাদীছুল ফুতূন’।

যৌবনে মূসা

দুগ্ধ পানের মেয়াদ শেষে মূসা অতঃপর ফেরাঊন-পুত্র হিসাবে তার গৃহে শান-শওকতের মধ্যে বড় হ’তে থাকেন। আল্লাহর রহমতে ফেরাঊনের স্ত্রীর অপত্য স্নেহ ছিল তাঁর জন্য সবচেয়ে বড় দুনিয়াবী রক্ষাকবচ। এভাবে وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ- (القصص ১৪)- ‘যখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং পূর্ণবয়স্ক মানুষে পরিণত হ’লেন, তখন আল্লাহ তাকে বিশেষ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান সম্পদে ভূষিত করলেন’ (ক্বাছাছ ২৮/১৪)।

মূসা সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্যকভাবে উপলব্ধি করলেন। দেখলেন যে, পুরা মিসরীয় সমাজ ফেরাঊনের একচ্ছত্র রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীনে কঠোরভাবে শাসিত। ‘বিভক্ত কর ও শাসন কর’ এই সুপরিচিত ঘৃণ্য নীতির অনুসরণে ফেরাঊন তার দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল ও একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল (ক্বাছাছ ২৮/৪)। আর সেটি হ’ল বনু ইস্রাঈল। প্রতিদ্বন্দ্বী জন্মাবার ভয়ে সে তাদের নবজাতক পুত্র সন্তানদের হত্যা করত ও কন্যা সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখত। এভাবে একদিকে ফেরাঊন অহংকারে স্ফীত হয়ে নিজেকে ‘সর্বোচ্চ পালনকর্তা ও সর্বাধিপতি’ ভেবে সারা দেশে অনর্থ সৃষ্টি করছিল। এমনকি সে নিজেকে ‘একমাত্র উপাস্য’ مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِىْ- (القصص ৩৮)- (ক্বাছাছ ২৮/৩৮) বলতেও লজ্জাবোধ করেনি। অন্যদিকে মযলূম বনু ইস্রাঈলদের হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাসে বাতাস ভারী হয়ে উঠছিল। অবশেষে আল্লাহ মযলূমদের ডাকে সাড়া দিলেন। আল্লাহ বলেন, ‘দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, আমরা চাইলাম তাদের উপরে অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতা করতে ও দেশের উত্তরাধিকারী করতে’। ‘এবং আমরা চাইলাম তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে এবং ফেরাঊন, হামান ও তাদের সেনাবাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে, যা তারা সেই দুর্বল দলের তরফ থেকে আশংকা করত’ (ক্বাছাছ ২৮/৫-৬)।

যুবক মূসা খুনী হ’লেন

মূসার হৃদয় মযলূমদের প্রতি করুণায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। ওদিকে আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। মূসা একদিন দুপুরের অবসরে শহরে বেড়াতে বেরিয়েছেন। এমন সময় তাঁর সামনে এক কান্ড ঘটে গেল। তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখতে পেলেন। যাদের একজন যালেম সম্রাটের ক্বিবতী বংশের এবং অন্যজন মযলূম বনু ইস্রাঈলের। মূসা তাদের থামাতে গিয়ে যালেম লোকটিকে একটা ঘুষি মারলেন। কি আশ্চর্য লোকটি তাতেই অক্কা পেল। মূসা দারুণভাবে অনুতপ্ত হলেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاَنِ هَذَا مِنْ شِيْعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ- قَالَ رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-)القصص ১৫-১৬)-

‘একদিন দুপুরে তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন অধিবাসীরা ছিল দিবানিদ্রার অবসরে। এ সময় তিনি দু’জন ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখতে পেলেন। এদের একজন ছিল তার নিজ গোত্রের এবং অপরজন ছিল শত্রুদলের। অতঃপর তার নিজ দলের লোকটি তার শত্রুদলের লোকটির বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য চাইল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং তাতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মূসা বললেন, ‘নিশ্চয়ই এটি শয়তানের কাজ। সে মানুষকে বিভ্রান্তকারী প্রকাশ্য শত্রু’। ‘হে আমার প্রভু! আমি নিজের উপরে যুলুম করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। অতঃপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ (ক্বাছাছ ২৮/১৫-১৬)।

পরের দিন ‘জনৈক ব্যক্তি ছুটে এসে মূসাকে বলল, হে মূসা! আমি তোমার শুভাকাংখী। তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, এই মুহূর্তে তুমি এখান থেকে বের হয়ে চলে যাও। কেননা সম্রাটের পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে’ (ক্বাছাছ ২৮/২০)। এই লোকটি মূসার প্রতি আকৃষ্ট ও তাঁর গুণমুগ্ধ ছিল। একথা শুনে ভীত হয়ে মূসা সেখান থেকে বের হয়ে পড়লেন নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ- وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّيْ أَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ- (القصص ২১-২২)-

‘অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন পথ দেখতে দেখতে এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা কর’। ‘এরপর যখন তিনি (পার্শ্ববর্তী রাজ্য) মাদিয়ান অভিমুখে রওয়ানা হ’লেন, তখন (দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে) বলে উঠলেন, ‘নিশ্চয়ই আমার প্রভু আমাকে সরল পথ দেখাবেন’ (ক্বাছাছ ২৮/২১-২২)।

আসলে আল্লাহ চাচ্ছিলেন, ফেরাঊনের রাজপ্রাসাদ থেকে মূসাকে বের করে নিতে এবং সাধারণ মানুষের জীবনাচারের সঙ্গে পরিচিত করতে। সাথে সাথে আল্লাহ তাঁকে তৎকালীন একজন শ্রেষ্ঠ নবীর গৃহে লালিত-পালিত করে তাওহীদের বাস্তব শিক্ষায় আগাম পরিপক্ক করে নিতে চাইলেন।

মূসার পরীক্ষা সমূহ

অন্যান্য নবীদের পরীক্ষা হয়েছে সাধারণতঃ নবুঅত লাভের পরে কিন্তু মূসার পরীক্ষা শুরু হয়েছে তার জন্ম লাভের পর থেকেই। বস্ততঃ নবুঅত প্রাপ্তির পূর্বে ও পরে তাঁর জীবনে বহু পরীক্ষা হয়েছে। যেমন আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে শুনিয়ে বলেন, وَفَتَنَّاكَ فُتُوْنًا 'আর আমরা তোমাকে অনেক পরীক্ষায় ফেলেছি' (ত্বোয়াহা ২০/৪০)।

নবুঅত লাভের পূর্বে তাঁর প্রধান পরীক্ষা ছিল তিনটি। যথাঃ (১) হত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া (২) মাদিয়ানে হিজরত (৩) মাদিয়ান থেকে মিসর যাত্রা।

অতঃপর নবুঅত লাভের পর তাঁর পরীক্ষা হয় প্রধানতঃ চারটিঃ (১) জাদুকরদের মুকাবিলা (২) ফেরাঊনের যুলুমসমূহ মুকাবিলা (৩) সাগরডুবির পরীক্ষা (৪) বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযান।

নবুঅত-পূর্ব ১ম পরীক্ষা : হত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া

মূসার জন্ম হয়েছিল তাঁর কওমের উপরে আপতিত রাষ্ট্রীয় হত্যাযজ্ঞের ভয়ংকর বিভীষিকার মধ্যে। আল্লাহ তাঁকে অপূর্ব কৌশলের মাধ্যমে বাঁচিয়ে নেন। অতঃপর তাঁর জানী দুশমনের ঘরেই তাঁকে নিরাপদে ও সসম্মানে লালন-পালন করালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মা ও পরিবারকে করলেন উচ্চতর সামাজিক মর্যাদায় উন্নীত। অথচ মূসার জন্মকে ঠেকানোর জন্যই ফেরাঊন তার পশুশক্তির মাধ্যমে বনু ইস্রাঈলের শত শত শিশু পুত্রকে হত্যা করে চলছিল। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

২য় পরীক্ষা : মাদিয়ানে হিজরত

অতঃপর যৌবনকালে তাঁর দ্বিতীয় পরীক্ষা হ'ল- হিজরতের পরীক্ষা। মূলতঃ এটাই ছিল তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি হবার পরে ১ম পরীক্ষা। শেষনবী সহ অন্যান্য নবীর জীবনে সাধারণতঃ নবুঅতপ্রাপ্তির পরে হিজরতের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। কিন্তু মূসা (আঃ)-এর জীবনে নবুঅত প্রাপ্তির আগেই এই কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হয়। অনাকাংখিত ও আকস্মিক হত্যাকান্ডের আসামী হয়ে জীবনের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত্র মূসা ফেরাঊনের রাজ্যসীমা ছেড়ে কপর্দকহীন অবস্থায় পার্শ্ববর্তী রাজ্য মাদিয়ানে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় কাতর মূসা এই ভীতিকর দীর্ঘ সফরে কিভাবে চলেছেন, কি খেয়েছেন সেসব বিষয়ে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন চমকপ্রদ ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুরআন এসব বিষয়ে চুপ থেকেছে বিধায় আমরাও চুপ থাকছি। তবে রওয়ানা হবার সময় যেহেতু মূসা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহর উপরে সমর্পণ

করেছিলেন এবং প্রত্যাশা করেছিলেন ‘নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন’ (ক্বাছাছ ২৮/২২), অতএব তাঁকে মাদিয়ানের মত অপরিচিত রাজ্যে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া ও সসম্মানে সেখানে বসবাস করার যাবতীয় দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছিলেন। এর মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যে, সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপরে নিজেকে সঁপে দিলে আল্লাহ তাঁর নেককার বান্দাদের সব দায়িত্ব নিজে নিয়ে থাকেন। উল্লেখ্য যে, বর্তমান পূর্ব জর্দানের মো‘আন (معان) সামুদ্রিক বন্দরের অনতিদূরেই ‘মাদইয়ান’ অবস্থিত।

মাদিয়ানের জীবন : বিবাহ ও সংসার পালন

মাদিয়ানে প্রবেশ করে তিনি পানির আশায় একটা কূপের দিকে গেলেন। সেখানে পানি প্রার্থী লোকদের ভিড়ের অদূরে দু’টি মেয়েকে তাদের তৃষ্ণার্ত পশুগুলি সহ অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর হৃদয় উথলে উঠলো। কেউ তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপই করছে না। মূসা নিজে মযলূম। তিনি মযলূমের ব্যথা বুঝেন। তাই কিছুক্ষণ ইতঃস্তত করে মেয়ে দু’টির দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি তাদের সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, ‘আমরা আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ না রাখালরা তাদের পশুগুলিকে পানি পান করিয়ে চলে যায়। অথচ আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ’ (যিনি ঘরে বসে আমাদের অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে আছেন)। ‘অতঃপর তাদের পশুগুলি এনে মূসা পানি পান করালেন’ (তারপর মেয়ে দু’টি পশুগুলি নিয়ে বাড়ী চলে গেল)। মূসা একটি গাছের ছায়ায় বসে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন,

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ- (القصص ২৪)-

‘হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার উপর যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী’ (ক্বাছাছ ২৮/২৪)। হঠাৎ দেখা গেল যে ‘বালিকাদ্বয়ের একজন সলজ্জ পদক্ষেপে তাঁর দিকে আসছে’। মেয়েটি এসে ধীর কণ্ঠে তাকে বলল, ‘আমার পিতা আপনাকে ডেকেছেন, যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন, তার বিনিময় স্বরূপ আপনাকে পুরস্কার দিতে পারেন’ (ক্বাছাছ ২৮/২৩-২৫)।

উল্লেখ্য যে, বালিকাদ্বয়ের পিতা ছিলেন মাদইয়ান বাসীদের নিকটে প্রেরিত বিখ্যাত নবী হযরত শু‘আয়েব (আঃ)। মূসা ইতিপূর্বে কখনো তাঁর নাম শোনেননি বা তাঁকে চিনতেন না। তাঁর কাছে পৌঁছে মূসা তাঁর বৃত্তান্ত সব বর্ণনা করলেন। শু‘আয়েব (আঃ) সবকিছু শুনে বললেন, لَاتَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ، ‘ভয় করো না। তুমি যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছ’। ‘এমন সময় বালিকাদ্বয়ের একজন বলল, আববা! এঁকে বাড়ীতে কর্মচারী হিসাবে রেখে দিন। কেননা إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

আপনার কর্ম সহায়ক হিসাবে সেই-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত' (ক্বাছাছ ২৮/২৬)। 'তখন তিনি মূসাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার বাড়ীতে কর্মচারী থাকবে। তবে যদি দশ বছর পূর্ণ করো, সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাহেন তো তুমি আমাকে সদাচারী হিসাবে পাবে'। 'মূসা বলল, আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি স্থির হ'ল। দু'টি মেয়াদের মধ্য থেকে যেকোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, আল্লাহ তার উপরে তত্ত্বাবধায়ক' (ক্বাছাছ ২৮/২৫-২৮)। মূলতঃ এটাই ছিল তাদের বিয়ের মোহরানা। সেযুগে এ ধরনের রেওয়াজ অনেকের মধ্যে চালু ছিল। যেমন ইতিপূর্বে ইয়াকূব (আঃ) তাঁর স্ত্রীর মোহরানা বাবদ সাত বছর শ্বশুর বাড়ীতে মেষ চরিয়েছেন। এভাবে অচেনা-অজানা দেশে এসে মূসা (আঃ) অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এবং অন্যান্য নিরাপত্তাসহ অত্যন্ত মর্যাদাবান ও নির্ভরযোগ্য একজন অভিভাবক পেয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে পেলেন জীবন সাথী একজন পতি-পরায়ণা বুদ্ধিমতী স্ত্রী। অতঃপর সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে মূসার দিনগুলি অতিবাহিত হ'তে থাকলো। সময় গড়িয়ে এক সময় মেয়াদ পূর্ণ হ'য়ে গেল। আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, তিনি চাকুরীর বাধ্যতামূলক আট বছর এবং ঐচ্ছিক দু'বছর মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন। কেননা এটাই নবী চরিত্রের জন্য শোভনীয় যে, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ঐচ্ছিক দু'বছরও তিনি পূর্ণ করবেন'।[19]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন,

أفرسُ الناس ثلاثةٌ :صاحبُ يوسفَ حين قال لإمرأته أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا، وصاحبةُ موسى حين قالت يا ابت استأجره إن خير من استأجرت القوىُّ الامين، وابوبكر الصديق حين استخلف عمرَ رضى الله عنه-

'সর্বাধিক দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন তিনজন: ১- ইউসুফকে ক্রয়কারী মিসরের আযীয (রাজস্বমন্ত্রী), যখন তিনি তার স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'একে সম্মানের সাথে রাখ, হয়তবা সে আমাদের কল্যাণে আসবে' ২- মূসার স্ত্রী, যখন (বিবাহের পূর্বে) তিনি স্বীয় পিতাকে বলেছিলেন, 'হে পিতা, এঁকে কর্মচারী নিয়োগ করুন। নিশ্চয়ই আপনার শ্রেষ্ঠ সহযোগী তিনিই হ'তে পারেন, যিনি শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত' এবং ৩- আবুবকর ছিদ্দীক, যখন তিনি ওমরকে তাঁর পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেন'।[20]

৩য় পরীক্ষা: মিসর অভিমুখে যাত্রা ও পথিমধ্যে নবুঅত লাভ

মোহরানার চুক্তির মেয়াদ শেষ। এখন যাবার পালা। পুনরায় স্বদেশে ফেরা। দুরু দুরু বক্ষ। ভীত-সন্ত্রস্ত্র মন। চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ। তবুও যেতে হবে। পিতা-মাতা, ভাই-বোন সবাই রয়েছেন মিসরে। আল্লাহর উপরে ভরসা করে স্ত্রী-পরিবার নিয়ে বের হ'লেন পুনরায় মিসরের পথে। শুরু হ'ল তৃতীয় পরীক্ষার পালা।

উল্লেখ্য, দশ বছরে তিনি দু'টি পুত্র সন্তান লাভ করেন এবং শ্বশুরের কাছ থেকে পান এক পাল দুম্বা। এছাড়া তাক্বওয়া ও পরহেযগারীর আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ তো তিনি লাভ করেছিলেন বিপুলভাবে।

পরিবারের কাফেলা নিয়ে মূসা রওয়ানা হ'লেন স্বদেশ অভিমুখে। পথিমধ্যে মিসর সীমান্তে অবস্থিত সিনাই পর্বতমালার তূর পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছলে হঠাৎ স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হ'ল। এখুনি প্রয়োজন আগুনের। কিন্তু কোথায় পাবেন আগুন। পাথরে পাথরে ঘষে বৃথা চেষ্টা করলেন কতক্ষণ। প্রচন্ড শীতে ও তুষারপাতের কারণে পাথর ঘষায় কাজ হ'ল না। দিশেহারা হয়ে চারিদিকে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ অনতিদূরে আগুনের হলকা নজরে পড়ল। আশায় বুক বাঁধলেন। স্ত্রী ও পরিবারকে বললেন, 'তোমরা এখানে অবস্থান কর। আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারব অথবা সেখানে পৌঁছে পথের সন্ধান পাব' (ত্বোয়াহা ২০/১০)। একথা দৃষ্টে মনে হয়, মূসা পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন।[21] পথিমধ্যে শাম অঞ্চলের শাসকদের পক্ষ থেকে প্রধান সড়কে বিপদাশংকা ছিল। তাই শ্বশুরের উপদেশ মোতাবেক তিনি পরিচিত রাস্তা ছেড়ে অপরিচিত রাস্তায় চলতে গিয়ে মরুভূমির মধ্যে পথ হারিয়ে ডান দিকে চলে তূর পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে গেলেন। মূলতঃ এ পথ হারানোটা ছিল আল্লাহর মহা পরিকল্পনারই অংশ।

মূসা আশান্বিত হয়ে যতই আগুনের নিকটবর্তী হন, আগুনের হল্কা ততই পিছাতে থাকে। আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, সবুজ বৃক্ষের উপরে আগুন জ্বলছে। অথচ গাছের পাতা পুড়ছে না; বরং তার উজ্জ্বলতা আরও বেড়ে যাচ্ছে। বিস্ময়ে অভিভূত মূসা এক দৃষ্টে আগুনটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ এক গুরুগম্ভীর আওয়ায কানে এলো তাঁর চার পাশ থেকে। মনে হ'ল পাহাড়ের সকল প্রান্ত থেকে একই সাথে আওয়ায আসছে। মূসা তখন তূর পাহাড়ের ডান দিকে 'তুবা' (طُوًى) উপত্যকায় দন্ডায়মান। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى- إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى- (طه ১১-১২)-

‘অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন, তখন আওয়ায এলো, হে মূসা!’ ‘আমিই তোমার পালনকর্তা। অতএব তুমি তোমার জুতা খুলে ফেল। তুমি পবিত্র উপত্যকা তুবায় রয়েছ’ (ত্বোয়াহা ২০/১১-১২)। এর দ্বারা বিশেষ অবস্থায় পবিত্র স্থানে জুতা খোলার আদব প্রমাণিত হয়। যদিও পাক জুতা পায়ে দিয়ে ছালাত আদায় করা জায়েয।[22] অতঃপর আল্লাহ বলেন,

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى- إِنَّنِي أَنَا اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي- إِنَّ السَّاعَةَ ءاَتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى- فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى- (طه ১৩-১৬)-

‘আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব তোমাকে যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাক’। ‘নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে ছালাত কায়েম কর’। ‘ক্বিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই; যাতে প্রত্যেকে তার কর্মানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে’। ‘সুতরাং যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে (ক্বিয়ামত বিষয়ে সতর্ক থাকা হ’তে) নিবৃত্ত না করে। তাহ’লে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে’ (ত্বোয়াহা ২০/১৩-১৬)।

এ পর্যন্ত আক্বীদা ও ইবাদতগত বিষয়ে নির্দেশ দানের পর এবার কর্মগত নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলছেন,

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى- قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى- قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى- فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى- قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى- (طه ১৭-২১)-

‘হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি?’ ‘মূসা বললেন, এটা আমার লাঠি। এর উপরে আমি ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্য গাছের পাতা ঝেড়ে নামাই। তাছাড়া এর দ্বারা আমার অন্যান্য কাজও চলে’। ‘আল্লাহ বললেন, হে মূসা! তুমি ওটা ফেলে দাও’। ‘অতঃপর তিনি ওটা (মাটিতে) ফেলে দিতেই তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল’। ‘আল্লাহ বললেন, তুমি ওটাকে ধর, ভয় করো না, আমি এখুনি ওকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব’ (ত্বোয়াহা ২০/১৭-২১)।

এটি ছিল মূসাকে দেওয়া ১ম মু‘জেযা। কেননা মিসর ছিল ঐসময় জাদুবিদ্যায় শীর্ষস্থানে অবস্থানকারী দেশ। সেখানকার শ্রেষ্ঠ জাদুকরদের হারিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই নবুঅতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা আবশ্যক ছিল। সেজন্যই আল্লাহ মূসাকে সবদিক দিয়ে প্রস্ত্তত করে দিচ্ছিলেন। এর ফলে মূসা নিজের মধ্যে অনেকটা শক্তি ও স্বস্তি লাভ করলেন।

১ম মু‘জেযা প্রদানের পর আল্লাহ তাকে দ্বিতীয় মু‘জেযা প্রদানের উদ্দেশ্যে বললেন,

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى- لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى-)طه ২২-২৩)-

‘তোমার হাত বগলে রাখ। তারপর দেখবে তা বের হয়ে আসবে উজ্জ্বল ও নির্মল আলো হয়ে, অন্য একটি নিদর্শন রূপে’। ‘এটা এজন্য যে, আমরা তোমাকে আমাদের বিরাট নিদর্শনাবলীর কিছু অংশ দেখাতে চাই’ (ত্বোয়াহা ২০/২২-২৩)।

[19]. বুখারী হা/২৪৮৭ ‘সাক্ষ্য সমূহ’ অধ্যায় ২৮ অনুচ্ছেদ।
[20]. মুস্তাদরাকে হাকেম ২/৩৭৬ পৃঃ হা/৩৩২০, সনদ ছহীহ; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২৮।
[21]. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২৩১।
[22]. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৬৬, ‘ছালাত’ অধ্যায় ‘সতর’ অনুচ্ছেদ-৮।
‘জেযা ও জাদু

মু‘জেযা অর্থ মানুষের বুদ্ধিকে অক্ষমকারী। অর্থাৎ এমন কর্ম সংঘটিত হওয়া যা মানুষের জ্ঞান ও ক্ষমতা বহির্ভূত। (১) ‘মু‘জেযা’ কেবল নবীগণের জন্য খাছ এবং ‘কারামত’ আল্লাহ তাঁর নেককার বান্দাদের মাধ্যমে কখনো কখনো প্রকাশ করে থাকেন। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। (২) মু‘জেযা নবীগণের মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। পক্ষান্তরে জাদু কেবল দুষ্ট জিন ও মানুষের মাধ্যমেই হয়ে থাকে এবং তা হয় অদৃশ্য প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে। (৩) জাদু কেবল পৃথিবীতেই ক্রিয়াশীল হয়, আসমানে নয়। কিন্তু মু‘জেযা আল্লাহর হুকুমে আসমান ও যমীনে সর্বত্র ক্রিয়াশীল থাকে। যেমন শেষনবী (ছাঃ)-এর অঙ্গুলী সংকেতে আকাশের চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়েছিল। (৪) মু‘জেযা মানুষের কল্যাণের জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু জাদু স্রেফ ভেল্কিবাজি ও প্রতারণা মাত্র এবং যা মানুষের কেবল ক্ষতিই করে থাকে।

জাদুতে মানুষের সাময়িক বুদ্ধি বিভ্রম ঘটে। যা মানুষকে প্রতারিত করে। এজন্যে একে ইসলামে হারাম করা হয়েছে। মিসরীয় জাতি তথা ফেরাঊনের সম্প্রদায় ঐ সময় জাদু বিদ্যায় পারদর্শী ছিল এবং জ্যোতিষীদের প্রভাব ছিল তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অত্যধিক। সেকারণ তাদের চিরাচরিত ধারণা অনুযায়ী মূসা (আঃ)-এর মু'জেযাকে তারা বড় ধরনের একটা জাদু ভেবেছিল মাত্র। তবে তারা তাঁকে সাধারণ জাদুকর নয়, বরং 'বিজ্ঞ জাদুকর' (سَاحِرٌ عَلِيْمٌ) বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল (আ'রাফ ৭/১০৯)। কারণ তাদের হিসাব অনুযায়ী মূসার জাদু ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, যা তাদের আয়ত্তাধীন জাদু বিদ্যার বাইরের এবং যা ছিল অনুপম ও অনন্য বৈশিষ্ট্য মন্ডিত।

পরবর্তীকালে সুলায়মান (আঃ)-এর সময়ে ইরাকের বাবেল নগরী তৎকালীন পৃথিবীতে জাদু বিদ্যায় শীর্ষস্থান লাভ করে। তখন আল্লাহ সুলায়মান (আঃ)-কে জিন, ইনসান, বায়ু ও পশুপক্ষীর উপর ক্ষমতা দিয়ে পাঠান। এগুলিকে লোকেরা জাদু ভাবে এবং তার নবুঅতকে অস্বীকার করে। তখন আল্লাহ হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়কে জাদু ও মু'জেযার পার্থক্য বুঝানোর জন্য প্রেরণ করেন। যাতে লোকেরা জাদুকরদের তাবেদারী ছেড়ে নবীর তাবেদার হয়।

মূসার দাওয়াতের পর ফেরাঊনী অবস্থান

মূসার মো'জেযা দেখে ফেরাঊন ও তার পারিষদবর্গ দারুণভাবে ভীত হয়ে পড়েছিল। তাই মূসার বিরুদ্ধে তার সম্মুখে আর টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থ বিবেচনা করে তারা তাদের লোকদের বলতে লাগল যে, 'লোকটা বিজ্ঞ জাদুকর'। 'সে তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিতে চায় (অর্থাৎ সে নিজে দেশের শাসক হ'তে চায়), এক্ষণে এ ব্যাপারে তোমাদের মত কি? 'লোকেরা ফেরাঊনকে বলল, 'আপনি তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দিন এবং শহর ও নগরী সমূহের সর্বত্র খবর পাঠিয়ে দিন লোকদের জমা করার জন্য'। 'যাতে তারা সকল বিজ্ঞ জাদুকরদের সমবেত করে' (আ'রাফ ৭/১০৯-১১২)।

ফেরাঊন মূসা (আঃ)-কে বলল, 'হে মূসা! তুমি কি তোমার জাদুর জোরে আমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেবার জন্য আগমন করেছ'? 'তাহ'লে আমরাও তোমার মুকাবিলায় তোমার নিকট অনুরূপ জাদু উপস্থিত করব। অতএব আমাদের ও তোমার মধ্যে কোন একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে একটা ওয়াদার দিন ধার্য কর, যার খেলাফ আমরাও করব না, তুমিও করবে না'। 'মূসা বললেন, 'তোমাদের ওয়াদার দিন হবে তোমাদের উৎসবের দিন এবং সেদিন পূর্বাহ্নেই লোকজন সমবেত হবে' (ত্বোয়াহা ২০/৫৭-৫৯)।
মূসার পাঁচটি দো'আ

নবুঅতের গুরু দায়িত্ব লাভের পর মূসা (আঃ) এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে তা বহনের ক্ষমতা অর্জনের জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইতিপূর্বে বর্ণিত দীর্ঘ প্রার্থনা সংক্ষেপে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হ'ল, যা নিম্নরূপ:

প্রথম দো'আ : رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِى 'হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ উন্মোচন করে দিন'। অর্থাৎ নবুঅতের বিশাল দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত জ্ঞান ও দূরদর্শিতার উপযোগী করে দিন এবং আমার হৃদয়কে এমন প্রশস্ত করে দিন, যাতে উম্মতের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে প্রাপ্ত অপবাদ ও দুঃখ-কষ্ট বহনে তা সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় দো'আ : وَيَسِّرْلِيْ اَمْرِىْ 'আমার কর্ম সহজ করে দিন'। অর্থাৎ নবুঅতের কঠিন দায়িত্ব বহনের কাজ আমার জন্য সহজ করে দিন। কেননা আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত কারু পক্ষেই কোন কাজ সহজ ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। স্বীয় অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে মূসা (আঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, ফেরাঊনের মত একজন দুর্ধর্ষ, যালেম ও রক্ত পিপাসু সম্রাটের নিকটে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, আল্লাহর একান্ত সাহায্য ব্যতীত।

তৃতীয় দো'আ : وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ 'আমার জিহবার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে'। কেননা রেসালাত ও দাওয়াতের জন্য রাসূল ও দাঈকে স্পষ্টভাষী ও বিশুদ্ধভাষী হওয়া একান্ত আবশ্যক। মূসা (আঃ) নিজের এ ত্রুটি দূর করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর নিকটে বিশেষভাবে প্রার্থনা করেন। পরবর্তী আয়াতে যেহেতু তাঁর সকল প্রার্থনা কবুলের কথা বলা হয়েছে' (ত্বোয়াহা ২০/৩৬), সেহেতু এ প্রার্থনাটিও যে কবুল হয়েছিল এবং তাঁর তোতলামি দূর হয়ে গিয়েছিল, সেকথা বলা যায়।

এ বিষয়ে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে বিভিন্ন চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যেমন শৈশবে তিনি মুখে আগুন পুরেছিলেন বলে তাঁর জিভ পুড়ে গিয়েছিল। কেননা ফেরাঊনের দাড়ি ধরে চপেটাঘাত করার জন্য মূসাকে ফেরাঊন হত্যা করতে চেয়েছিল। তাকে বাঁচানোর জন্য ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার উপস্থিত বুদ্ধির জোরে তিনি বেঁচে যান। সেটি ছিল এই যে, তাকে অবোধ শিশু প্রমাণ করার জন্য ফেরাঊনের স্ত্রী দু'টি পাত্র এনে মূসার সামনে রাখেন। মূসা তখন জিবরাঈলের সাহায্যে মণিমুক্তার পাত্রে হাত না দিয়ে আগুনের পাত্রে হাত দিয়ে একটা স্ফূলিঙ্গ তুলে নিজের গালে পুরে নেন। এতে তার জিভ পুড়ে যায় ও তিনি তোৎলা হয়ে যান। ওদিকে ফেরাঊনও বুঝে নেন যে মূসা নিতান্তই অবোধ। সেকারণ তাকে ক্ষমা করে দেন। যদিও এসব কাহিনী কুরতুবী, মাযহারী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তবুও

এগুলোর কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই। তাই তোৎলামির বিষয়টি স্বাভাবিক ত্রুটি ধরে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

উল্লেখ্য যে, ইবনু আববাস (রাঃ) কর্তৃক নাসাঈতে বর্ণিত ‘হাদীছুল ফুতূনে’ কেবল আগুনের পাত্রে হাত দেওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু আগুন মুখে দেওয়ার কথা নেই। এর ফলে তিনি ফেরাঊনের হাতে নিহত হওয়া থেকে বেঁচে যান। এ জন্য এ ঘটনাকে উক্ত হাদীছে ৩নং ফিৎনা বা পরীক্ষা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[24]

চতুর্থ দো‘আ : وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ أَهْلِي، هَارُوْنَ أَخِيْ ‘আমার পরিবার থেকে আমার জন্য একজন উযীর নিয়োগ করুন’। ‘আমার ভাই হারূণকে’। পূর্বের তিনটি দো‘আ ছিল তাঁর নিজ সত্তা সম্পর্কিত। অতঃপর চতুর্থ দো‘আটি ছিল রেসালাতের দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত। ‘উযীর’ অর্থ বোঝা বহনকারী। মূসা (আঃ) স্বীয় নবুঅতের বোঝা বহনে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপায় হিসাবে একজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত সহযোগী প্রার্থনা করে দায়িত্ব পালনে স্বীয় আন্তরিকতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন এবং নির্দিষ্টভাবে নিজের বড় ভাই হারূণের নাম করে অশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ ভাই হারূণ আজন্ম মিসরেই অবস্থান করার কারণে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল অনেক বেশী। অধিকন্তু তার উপরে ফেরাঊনের কোন ক্রোধ বা ক্ষোভ ছিল না। সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত বিশুদ্ধভাষী ব্যক্তি, দ্বীনের দাওয়াত প্রদানের জন্য যা ছিল সবচাইতে যরূরী।

পঞ্চম দো‘আ : وَأَشْرِكْهُ فِيْ اَمْرِيْ ‘এবং তাকে আমার কাজে শরীক করে দিন’। অর্থাৎ তাকে আমার নবুঅতের কাজে শরীক করে দিন। ‘যাতে আমরা বেশী বেশী আপনার যিকর ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি’ (ত্বোয়াহা ২০/৩৩-৩৪)। এটা অনস্বীকার্য যে, আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে এবং আল্লাহর যিকরে মশগুল থাকার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ যরূরী। একারণেই তিনি সৎ ও নির্ভরযোগ্য সাথী ও সহযোগী হিসাবে বড় ভাই হারূণকে নবুঅতে শরীক করার জন্য আল্লাহর নিকটে দো‘আ করেন। তাছাড়া তিনি একটি আশংকার কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘হে আমার পালনকর্তা, আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম। তাই আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে’। ‘আমার ভাই হারূণ, সে আমার অপেক্ষা প্রাঞ্জলভাষী। অতএব তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন যোগাবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে’ (ক্বাছাছ ২৮/৩৩-৩৪)।

উক্ত পাঁচটি দো‘আ শেষ হবার পর সেগুলি কবুল হওয়ার সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ বলেন, قَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوْسَى ‘হে মূসা! তুমি যা যা চেয়েছ, সবই তোমাকে প্রদান করা হ’ল’ (ত্বোয়াহা

২০/৩৬)। এমনকি মূসার সাহস বৃদ্ধির জন্য سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيْكَ ‘আমরা তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার বাহুকে সবল করব এবং তোমাদের দু’জনকে আধিপত্য দান করব। ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছেই ঘেঁষতে পারবে না। তাছাড়া আমার নিদর্শনাবলীর জোরে তোমরা (দু’ভাই) এবং তোমাদের অনুসারীরা (শত্রুপক্ষের উপরে) বিজয়ী থাকবে’ (ক্বাছাছ ২৮/৩৫)।

[24]. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ত্বোয়াহা ২০/৪০।

মূসা হ’লেন কালীমুল্লাহ

তুবা প্রান্তরের উক্ত ঘটনা থেকে মূসা কেবল নবী হ’লেন না। বরং তিনি হ’লেন ‘কালীমুল্লাহ’ বা আল্লাহর সাথে বাক্যালাপকারী। যদিও শেষনবী (ছাঃ) মে‘রাজে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু দুনিয়াতে এভাবে বাক্যালাপের সৌভাগ্য কেবলমাত্র হযরত মূসা (আঃ)-এর হয়েছিল। আল্লাহ বিভিন্ন নবীকে বিভিন্ন বিষয়ে বিশিষ্টতা দান করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘হে মূসা! আমি আমার বার্তা পাঠানোর মাধ্যমে এবং আমার বাক্যালাপের মাধ্যমে তোমাকে লোকদের উপরে বিশিষ্টতা দান করেছি। অতএব আমি তোমাকে যা কিছু দান করলাম, তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ থাক’ (আ‘রাফ ৭/১৪৪)। এভাবে আল্লাহ পাক মূসা (আঃ)-এর সাথে আরেকবার কথা বলেন, সাগর ডুবি থেকে নাজাত পাবার পরে শামে এসে একই স্থানে ‘তওরাত’ প্রদানের সময় (আ‘রাফ ৭/১৩৮, ১৪৫)। এভাবে মূসা হ’লেন ‘কালীমুল্লাহ’।

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সাথে সরাসরি বাক্যালাপের পর উৎসাহিত ও পুলকিত মূসা এখানে তূর পাহাড়ের পাদদেশ এলাকায় কিছু দিন বিশ্রাম করলেন। অতঃপর মিসর অভিমুখে রওয়ানা হ’লেন। সিনাই থেকে অনতিদূরে মিসর সীমান্তে পৌঁছে গেলে যথারীতি বড় ভাই হারূণ ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এসে তাঁদেরকে সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন (কুরতুবী, ইবনু কাছীর)।

খিজির আলাইহিস সালাম

হজরত উবাই ইবনে কাব (রা.)-র বরাতে এই হাদিসটির বর্ণনা আছে। তিনি নবী (সা.)-এর কাছে নিচের ঘটনাটি শুনেছেন।

একবার মুসা (আ.) বনি ইসরাইলের এক সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী? তিনি বললেন, আমি। মুসা (আ.)-এর এ উত্তরে আল্লাহ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। কেননা তিনি জ্ঞানের উৎস হিসেবে আল্লাহ্‌র কথা বলেননি।

আল্লাহ্ মুসা (আ.)–কে বললেন, দুই নদীর সংযোগস্থলে আমার এক বান্দা আছে। সে তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী। মুসা (আ.) আরজ করলেন, হে আমার রব! তাঁর কাছে পৌঁছাতে কে আমাকে সাহায্য করবে? আল্লাহ্ বললেন, তুমি একটি মাছ ধরে এক থলির মধ্যে রাখো। যেখানে গিয়ে তুমি মাছটা হারিয়ে ফেলবে, সেখানেই তিনি আছেন। মুসা (আ.) একটি মাছ ধরে থলির মধ্যে ভরে রাখলেন। এর পর তিনি ও তাঁর সঙ্গী ইউশা ইবনে নুন যেতে যেতে একটি পাথরের কাছে পৌঁছে সেখানে মাথা রেখে বিশ্রাম বসলেন। মুসা (আ.) ঘুমিয়ে পড়লেন।

মাছটি নড়াচড়া করতে করতে থলি হতে বেরিয়ে নদীতে নেমে গেল। আল্লাহ্ মাছটির চলার পথে পানির গতি স্তব্ধ করে দিলেন। মাছটির চলার পথ সুড়ঙ্গের মতো হয়ে গেল। নবী (সা.) হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন, এভাবে সুড়ঙ্গের মতো হয়েছিল। এর পর মুসা ও ইউশা ইবনে নুন বাকি রাত ও সমস্ত দিন পথ পেরিয়ে গেলেন। পর দিন ভোরে মুসা (আ.) তাঁর যুবক সঙ্গীকে বললেন, আমার সকালের নাশতা নিয়ে এসো। সফরের কারণে আমি খুব ক্লান্ত। আসলে মুসা (আ.) আল্লাহর নির্দেশিত স্থানটি অতিক্রম না করা পর্যন্ত সফরে কোনো ক্লান্তি অনুভব করেননি। সঙ্গীটি বললেন, আপনি কি লক্ষ করেছেন, আমরা যখন সেই পাথরের কাছে বিশ্রাম নিয়েছিলাম, মাছটি চলে যাওয়ার কথা বলতে আমি একেবারেই ভুলে গেছি। আসলে আপনার কাছে সেটা বলতে শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। মাছটি নদীতে আশ্চর্যভাবে নিজের পথ করে নিয়েছে। (রাবী বলেন) পথটি মাছের জন্য ছিল সুড়ঙ্গের মতো, আর তাঁদের জন্য সেটা ছিল অবাক ঘটনা। মুসা (আ.) বললেন, এই সেই জায়গা, যা আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি।

এর পর দুজনই নিজ নিজ পদচিহ্ন ধরে পেছনের দিকে ফিরে চললেন, যে পর্যন্ত না তাঁরা সেই পাথরের কাছে এসে পৌঁছালেন। তাঁরা দেখলেন, সেখানে একজন লোক বসে আছেন।

মুসা (আ.) তাঁকে সালাম করলেন। সালামের জবাব দিয়ে তিনি বললেন, এখানে সালাম এল কী করে? তিনি বললেন, আমি মুসা। লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি বনি ইসরাইলের মুসা? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আপনাকে শেখানো সহজ ও সঠিক জ্ঞানের কথা শেখার জন্য আমি আপনার কাছে এসেছি। তিনি বললেন, হে মুসা, আল্লাহর দেওয়া ও শেখানো কিছু জ্ঞান আমার আছে, আপনি তা জানেন। আল্লাহর দেওয়া ও শেখানো কিছু জ্ঞান আপনারও আছে, আমি তা জানি না।

মুসা (আ.) বললেন, আমি কি আপনার সঙ্গী হতে পারি? খিজির (আ.) বললেন, আমার সঙ্গে থাকলে আপনি ধৈর্য রাখতে পারবেন না। তাছাড়া যার রহস্য আপনার জানা নেই, সেসব ব্যাপারে আপনি ধৈর্য রাখবেন কী করে?

মুসা (আ.) বললেন, ইনশা আল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল হিসেবে দেখতে পাবেন। আমি আপনার কোনো আদেশই অমান্য করব না।

এর পর তাঁরা দুজনে রওনা হয়ে নদীতীর দিয়ে এগিয়ে চললেন। এমন সময় একটি নৌকা তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তাঁরা তাঁদেরও নৌকায় উঠিয়ে নিতে অনুরোধ করলেন। ওঁরা খিজির (আ.)-কে চিনে ফেললেন, সঙ্গীসহ তাঁকে পারিশ্রমিক ছাড়াই নৌকায় তুলে নিলেন। তাঁরা নৌকায় ওঠার পর একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার একটি পাশে বসল। পাখিটি দুয়েকবার পানিতে ঠোঁট ডোবাল।

খিজির (আ.) বললেন, হে মুসা, এই পাখিটি তার ঠোঁট দিয়ে নদীর পানি যতটুকু কমিয়েছে, আমার আর তোমার জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞান থেকে ততটুকুও কমেনি। এর পর খিজির (আ.) হঠাৎ একটি কুঠার নিয়ে এসে নৌকার একটি তক্তা উপড়ে ফেললেন। মুসা (আ.) হঠাৎ দেখতে পেলেন তিনি কুঠার দিয়ে একটি তক্তা উপড়ে ফেলেছেন। তিনি তাঁকে বললেন, আপনি এ কী করলেন? লোকেরা আমাদের মজুরি ছাড়াই নৌকায় তুলে নিল, আর আপনি ওদের নৌকার যাত্রীদের ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য নৌকাটি ফুটো করে দিলেন? এ তো আপনি একো গুরুতর কাজ করলেন।

খিজির (আ.) বললেন, আমি কি বলিনি, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য রাখতে পারবেন না?

মুসা (আ.) বললেন, আমি বিষয়টি ভুলে গিয়েছিলাম। এ জন্য আমাকে দোষ দেবেন না। আমার প্রতি কঠোরও হবেন না। মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে প্রথম এই কথাটি ছিল ভুলক্রমে।

এর পর যখন তাঁরা দুজন নদী পার হয়ে এলেন। তাঁরা অন্য বালকদের সঙ্গে ক্রীড়ারত একটি বালকের পাশ দিয়ে গেলেন। খিজির (আ.) তার মাথাটি ধরে নিজ হাতে তার ঘাড় থেকে আলাদা করে ফেললেন।

মুসা (আ.) তাঁকে বললেন, আপনি একটি নিষ্পাপ বালককে বিনা অপরাধে হত্যা করলেন? নিশ্চয়ই আপনি একটা অন্যায় করলেন।

খিজির (আ.) বললেন, আমি কি আপনাকে বলিনি, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরে রাখতে পারবেন না? মুসা (আ.) বললেন, এর পর যদি আমি আপনাকে আর কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করি, আপনি আমাকে আর আপনার সঙ্গে রেখেন না। কারণ আপনার ওজর–আপত্তি চূড়ান্ত হয়েছে।

আবার তাঁরা চলতে লাগলেন। অবশেষে তাঁরা একটি জনপদে এসে পৌঁছালেন। গ্রামবাসীর কাছে তাঁরা খাবার চাইলেন। কিন্তু তারা তাঁদের আতিথ্য দিতে অস্বীকৃতি করে।
সেখানে তাঁরা একদিকে ঝুঁকে পড়া একটা দেয়াল দেখতে পেলেন। সেটি ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। খিজির (আ.) সেটি নিজের হাতে সোজা করে দিলেন।

মুসা (আ.) বললেন, মানুষগুলো এমন যে আমরা এলাম, অথচ তারা আমাদের না দিল খাবার, না দিল আতিথ্য। অথচ আপনি ওদের দেয়াল সারিয়ে দিলেন। আপনি ইচ্ছা করলে এর বদলে মজুরি নিতে পারতেন। খিজির (আ.) বললেন, এখানেই আপনার আর আমার মধ্যে বিচ্ছেদ হলো। তবে যে ঘটনাগুলোতে আপনি নিজের ধৈর্য ধরে রাখতে পারেননি, সেসবের রহস্য আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি।

নবী (সা.) বলেছেন, আমাদের তো ইচ্ছা যে মুসা (আ.) ধৈর্য ধরলে আমাদের কাছে তাঁদের আরও অনেক বেশি খবর বর্ণনা করা হতো। সুফিয়ান (র.) বর্ণনা করেছেন যে নবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ মুসা (আ.)-এর ওপর রহমত বর্ষণ করুন। তিনি যদি ধৈর্য ধরতেন, তাহলে তাদের দুজনার ব্যাপারে আমরা আরও অনেক ঘটনা জানতে পারতাম।

রাবী বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.) এখানে পড়েছেন, তাদের সামনে একজন বাদশাহ ছিল। সে প্রতিটি নিখুঁত নৌকা জোর করে ছিনিয়ে নিত।
দ্বিতীয়তঃ শিশুটির ব্যাপার এই যে, এর পিতা মাতা অতিশয় মুমিন বান্দা, বড় হয়ে শিশুটি জালিম এবং কুফরী করে তার মুমিন বাবা মা কে কষ্টে নিপাতিত করবে, তাই এই শিশুকে

হত্যা করে আমি আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করলাম তাদের যেন এর পরিবর্তে আর একটি উত্তম শিশু দেয়। তৃতীয়তঃ আর ঐ প্রাচীরটি - ওটা ছিল নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের, তাদের পিতা মাতা তাদের জন্য কিছু সম্পদ ওই প্রাচীরের নিচে রেখে যায়, আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা কিশোর দুজন বড় হয়ে ওই সম্পদের অধিকারী হোক, তাই আমি ভঙ্গুর প্রায় প্রাচীরটি আবার ঠিক করে দেই।

সুফিয়ান (র.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি আমর ইবনে দিনার (র.) কাছ থেকে শোনার আগেই তা মুখস্থ করেছেন, নাকি অন্য কারো কাছ থেকে শুনে তা মুখস্থ করেছেন? তিনি বললেন, আমি কার কাছে থেকে এটা মুখস্থ করতে পারি? আমি ছাড়া আর কেউ কি এ হাদিস আমরের কাছে থেকে বর্ণনা করেছে? আমি তাঁর কাছে থেকে দু-তিনবার শুনেছি। তাঁর থেকে শুনেই এটা মুখস্থ করেছি।

আলী ইবনে খুশরম (র.) সুফিয়ান (র.)–এর সূত্রে বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসটির বিবরণ দিয়েছেন।

সূত্র :প্রথম আলো।

হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম

হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর পরিচয়

হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ১০ম শতাব্দীতে, জেরুজালেমে। আল্লাহর পক্ষ থেকে যাবুর কিতাব প্রাপ্তির জন্য মুসলমানরা দাউদকে একজন রাসূল হিসেবে সম্মান করে। তিনি ছিলেন আল্লাহর একজন নবী ও রাসূল। কুরআনের দাওয়াত কথা ১৬ বার উল্লেখ করা হয়েছে।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক কতিপয় আলিমের সূত্রে ওয়াহাবি ইবনু মুনাব্বিহ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম ছিলেন বেঁটে, তার চক্ষুদ্বয় ছিল নীলাভ।তিনি ছিলেন স্বল্প কেশ বিশিষ্ট এবং পূত-পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম জালুত বাদশাকে যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করেন। ইবনু আসাকিরের বর্ণনামতে,এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল মারাজুস সাফার

নামক এলাকার সন্নিকটে উম্মু হাকিমের প্রাসাদের কাছে। এর ফলে বনি ইসরাইলের লোকজন দাউদ আলাইহিস সালামের প্রতি আকৃষ্ট এবং তাকে ভালবাসতে থাকে এবং তাকে শাসক রুপে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে থাকে। ফলে তালুত যে ভূমিকা গ্রহণ করেন, একটু আগেই তা উল্লেখ করা হয়েছে রাজ্যের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের উপর ন্যাস্ত হয়।

এভাবে আল্লাহ দাউদ আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে বাদশাহী ও নবুওয়াত তথা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ একত্রিত করে দেন।

হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে লৌহ কর্ম শিক্ষা দান

হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম প্রসঙ্গে কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন -

وَلَقَدۡ اٰتَيۡنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضۡلًا ؕ يٰجِبَالُ اَوِّبِىۡ مَعَهٗ وَالطَّيۡرَ ۚ وَاَلَـنَّا لَـهُ الۡحَدِيۡدَ ۙ ١٠ اَنِ اعۡمَلۡ ۞ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرۡ فِى السَّرۡدِ وَاعۡمَلُوۡا صَالِحًـا ؕ اِنِّىۡ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ ١١

আমি আমার পক্ষ থেকে দাঊদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম। (আমি আদেশ করেছিলাম) হে পর্বতমালা! তোমরা দাঊদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর আর পাখীদেরকেও (এ আদেশ করেছিলাম)। আমি লোহাকে তার জন্য নরম করেছিলাম।
যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরি করতে পার, কড়াসমূহ সঠিকভাবে সংযুক্ত কর আর তোমরা সৎকর্ম কর। তোমরা যা কর আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী।(সূরা সাবা, আয়াত:১০,১১)
আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন -
وَّسَخَّرۡنَا مَعَ دَاوٗدَ الۡجِبَالَ يُسَبِّحۡنَ وَالطَّيۡرَ ؕ وَكُنَّا فٰعِلِيۡنَ ٧٩ وَعَلَّمۡنٰهُ صَنۡعَةَ لَبُوۡسٍ لَّـكُمۡ لِتُحۡصِنَكُمۡ مِّنۡۢ بَاۡسِكُمۡ‌ۚ فَهَلۡ اَنۡـتُمۡ شٰكِرُوۡنَ ٨٠
আর আমি পর্বতমালা ও পাখিদেরকে করে দিয়েছিলাম, তারা দাউদের সাথে আমার তাসবিহ পাঠ করত। আর এসব কিছু আমি করেছিলাম। আর আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম বানানো শিক্ষা দিয়েছিলাম। যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে। সুতরাং তোমরা কে কৃতজ্ঞ হবে? (সূরা আম্বিয়া, আয়াত :৭৯-৮০)

যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে লোহা দ্বারা বর্ণ তৈরি করতে সাহায্য করেন এবং তাকে তা তৈরি করার নিয়ম পদ্ধতি ও শিক্ষা দেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আর বুনন কাজে পরিমাণ রক্ষা করো'। অর্থাৎ বুননটা এত সূক্ষ্ম হবে না যাতে ফাঁক বন্ধ করে যেতে পারে। আর এতটা হবে না যাতে ভেঙে যেতে পারে। (সহীহ বুখারী খন্ড-২,পৃ:১২০)

হাসান বসরি, কাতাদা ও আমাশ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের জন্য লোহাকে এমন ভাবে নরম করে দিয়েছেন, তিনি হাত দ্বারা যেমন ইচ্ছা পেঁচাতেও ভাঁজ করতে পারতেন। এর জন্য তাঁর আগুন বা হাতুড়ির প্রয়োজন হতো না। কাতাদা বলেন,হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম -ই প্রথম মানুষ, যিনি মাপজোক মতো আংটা ব্যবহার করে লোহা বর্ম নির্মাণ করেন। এর আগে লোহারপাত দ্বারা বর্মের কাজ চালানো হতো।

ইবনু শাওজাব বলেন, তিনি প্রতিদিন একটি করে বর্ম তৈরি করতেন এবং ছয় হাজার দিরহাম এর বিনিময়ে বিক্রি করতেন। হাদিসে এসেছে, মানুষের পবিত্রতম খাবার হলো, যা সে নিজে উপার্জন করে। আর আল্লাহর নবী হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম নিজের হাতে উপার্জিত খাদ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। (সহিহ বুখারি :খন্ড -১,পৃষ্ঠা -২৮৯)

হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের ইবাদত বন্দেগী

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন -

وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُۥدَ ذَا ٱلْأَيْدِ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ١٧ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُۥ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِىِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ١٨
وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهُۥٓ أَوَّابٌ ١٩ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُۥ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ

আর আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদকে স্মরণ করো ;সে ছিল অধিক আল্লাহ অভিমুখী। আমি পর্বত মালাকে অনুগত করেছিলাম, তার সাথে এগুলো সকাল সন্ধ্যায় আমার তাসবিহ পাঠ করত। আর সমবেত পাখিদেরকেও(অনুগত করেছিলাম) ;প্রত্যেকেই ছিল অধিক আল্লাহ অভিমুখী। আমি তাঁর রাজত্বকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা দিয়েছিলাম। (সূরা সোয়াদ, আয়াত: ১৭ - ২০)

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আয়াতে উল্লিখিত অর্থ ইবাদত করার শক্তি। অর্থাৎ, ছিলেন ইবাদত ও অন্যান্য সৎকাজে অত্যন্ত শক্তিশালী। কাতাদা রহিমাহুল্লাহ বলেন,তাকে আল্লাহ ইবাদত করতে দিয়েছিলেন শক্তি এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে দিয়েছিলেন গভীর জ্ঞান। কাতাদা রহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে, দাউদ আলাইহিস সালাম রাতের বেলা দাঁড়িয়ে ইবাদত করতেন এবং বছরের অর্ধেক সময় রোজা রাখতেন।

বুখারী ও মুসলিমে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নিকট ঐরূপ নামায সবচেয়ে প্রিয় যে রূপ নামাজ হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম পড়তেন এবং আল্লাহর নিকট ঔরুপ রোজা সবচেয়ে পছন্দনীয় যেরূপ রোজা হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম রাখতেন। তিনি রাতের প্রথম অর্ধেক ঘুমাতেন, তারপর এক তৃতীয়াংশ

নামাজে কাটাতে এবং শেষে এক ষষ্ঠাংশ পুনরায় ঘুমিয়ে কাটাতেন। তিনি একদিন রোজা রাখতেন এবং একদিন রোজা রাখতেন না। আর শত্রুর মোকাবেলা হলে ভয়ে পালাতেন না। (সহীহ বুখারী, খন্ড ২,পৃষ্ঠা ১২০)

তাই আয়াতে বলা হয়েছে -

إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُۥ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ١٨ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهُۥٓ أَوَّابٌ

আমি পর্বত মালাকে অনুগত করেছিলাম, তাঁর সাথে এবং সকাল সন্ধ্যায় আমার তাসবিহ পাঠ করতো। আর সমবেদ পাখিদেরকেও(অনুগত করেছিলাম) ;প্রত্যেকেই ছিল অধিক আল্লাহ অভিমুখী। (সূরা সোয়াদ, আয়াত: ১৮,১৯)

সূরা সাবায় বলা হয়েছে -

يا جبال اوبي معه والطير

হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং বিহঙ্গকুলকেও। (সূরা সাব, আয়াত :১০) অর্থাৎ তার সাথে তাসবিহ পাঠ করা। ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ প্রমুখ এই আয়াতের তাফসীর এভাবেই করেছেন। অর্থাৎ, তারা দিনের সূচনার লগ্নে ও শেষভাগে তাসবীহ পাঠ করত।

হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর দরাজ কণ্ঠ ও সুর মাধুর্য

হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা এমন দরাজ কণ্ঠ ও সুরে মাধুর্য দান করেছিলেন,যা পৃথিবীর অন্য কাউকে দান করেননি। তিনি যখন তার প্রতি অবতীর্ণ যাবুর কিতাব সুর দিয়ে পাঠ করতেন, তখন আকাশে উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল সুরের মূর্ছনায় থমকে দাঁড়াতো এবং দাউদের সুরের সাথে সুর মিলিয়ে আবৃত্তি করতো ও তার সাথে তাসবিহ পাঠ করত। এভাবেই তিনি সকাল-সন্ধ্যায় যখন তাসবিহ পাঠ করতেন, তখন পাহাড় পর্বত তার সাথে তাসবিহ পাঠে শরিক হত।

আওযায়ি বলেছেন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে এমন সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছিল যেমনটি আর কাউকে দান করা হয়নি। তিনি যখন আল্লাহর কিতাব পাঠ করতেন, তখন আকাশের পাখি ও বনের পশু তার চারপাশে জড়ো হয়ে যেত। এমনকি প্রচন্ড ক্ষুধায় ও তীব্র পিপাসায় তারা সে স্থানে মারা যেত,কিন্তু নড়াচড়া করত না। শুধু এরাই নয়, নদীর পানির প্রবাহ পর্যন্ত থেমে যেত।

ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ বলেছেন,দাউদ আলাইহিস সালামের কণ্ঠস্বর যেই শুনতো লাফিয়ে উঠত এবং কণ্ঠের তালে তালে নাচতে শুরু করতো। তিনি যাবুর এমন অভূতপূর্ব কণ্ঠে পাঠ

করতেন, যা কোনদিন কেউ শুনেনি। সে সুর শুনে জিন, পাখি ও জীব -জন্তু আপন আপন স্থানে দাঁড়িয়ে যেত। দীর্ঘ ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার ফলে তাদের কেউ কেউ মারাও যেত।

আব্দুর রাজ্জাক ইবনু জুরায়জ সূত্রের বর্ণনা করেন, তিনি বলেন গানের সুরে কেরাত পড়া যাবে কিনা এ সম্পর্কে আতা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন, এতে দোষ কী?অতঃপর তিনি বললেন, আমি শুনেছি, ওবাইদা ইবনু ওমর বলেছেন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম বাজনা বাজাজ বাজাতেন তালে তালে কেরাত পড়তেন। এতে সুরের মধ্যে লহর সৃষ্টি হত।ফলে সুরের মূর্ছনায় তিনিও কাঁদতেন এবং শ্রোতাদেরকেও কাঁদাতেন।

ইমাম আহমদ আবদুর রাজ্জাকের সূত্রে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা আবু মুসা আশআরির কিরাত পড়াশোনে বলেছিলেন, আবু মুসাকে আলে দাউদের সুর লহরি দান করা হয়েছে। (মুসনাদে আহমাদ:খন্ড ৬ পৃষ্ঠা ১৬৭)

বুখারী ও মুসলিমের শর্তে এই হাদিস বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য এই সূত্রে এই হাদিস বুখারী মুসলিমে নেই। অন্যত্র ইমাম হাসানের সূত্রে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আবু মুসাকে দাউদের বাদ্য প্রদান করা হয়েছে। এই হাদিসটি মুসলিমের শর্তে বর্ণিত। আবু ওসমান তিরমিজি রহিমাহুল্লাহ বলেন, বাদ্যও বাঁশরী শুনেছি, কিন্তু আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর কণ্ঠের চেয়ে তা অধিক শ্রুতি মধুর নয়। এরকম মধুর সুর হওয়ার সত্বেও হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম অতি দ্রুত যাবুর পাঠ করতেন।

এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা দাউদ অপেক্ষা ধীরে কিরাত পড় । কেননা, তিনি বাহনের উপর জিন লাগাবার আদেশ করে কুরআন (যাবুর) পড়তেন এবং জিন লাগানো শেষ হবার আগেই তাঁর যাবুর পড়া শেষ হয়ে যেত।আর তিনি নিজ হস্তে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

ইমাম বুখারী ও আব্দুর রাজ্জাক সূত্রে এই হাদিস প্রায় অনুরূপ শব্দে বর্ণনা করেছেন। (সহীহ বুখারী শরীফ, খন্ড 2 পৃষ্ঠা ১২০)
এরপর বুখারী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, এই হাদিস মুসা ইবনু উকবা সূত্রে হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের আলোচনায় বিভিন্ন সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

হাদিসে উল্লেখিত কুরআন অর্থ এখানে যাবুর, যা দাউদ আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। এ বর্ণনাগুলো ছিল সংরক্ষিত। কেননা তিনি ছিলেন একজন বাদশা। তাঁর ছিল বহু অনুসারী।তাই বাহনের উপর জিন লাগাতে যতটুকু সময় লাগে সেই সময় পর্যন্ত তিনি যাবুর পাঠ করতেন। ভক্তি সহ নিবিষ্ট চিত্তে ও সুর প্রয়োগে পড়ার সত্বেও তাঁর তেলাওয়াত ছিল অত্যন্ত দ্রুত।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

واتينا داؤود زبورا

আমি দাউদকে দিয়েছি যাবুর। (সূরা নিসা, আয়াত :১৬৩) এ আয়াতের তাফসীরে আমার তাফসীর গ্রন্থে ইমাম আহমদ ও অন্যান্যদের বর্ণিত হাদিস উদ্ধৃত করেছি, এই প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাবটি রমজান মাসে অবতীর্ণ হয়। গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে, এতে বিভিন্ন উপদেশ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি রয়েছে।

দাঊদ (আঃ)-এর জীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলী

(১) ছাগপাল ও শস্যক্ষেতের মালিকের বিচার: ইমাম বাগাভী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস, ক্বাতাদাহ ও যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা দু'জন লোক হযরত দাঊদের নিকটে একটি বিষয়ে মীমাংসার জন্য আসে। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক এবং অন্যজন ছিল শস্য ক্ষেতের মালিক। শস্যক্ষেতের মালিক ছাগপালের মালিকের নিকট দাবী পেশ করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেতে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে। আমি এর প্রতিকার চাই। সম্ভবতঃ শস্যের মূল্য ও ছাগলের মূল্যের হিসাব সমান বিবেচনা করে হযরত দাঊদ (আঃ) শস্যক্ষেতের মালিককে তার বিনষ্ট ফসলের বিনিময় মূল্য হিসাবে পুরা ছাগপাল শস্যক্ষেতের মালিককে দিয়ে দিতে বললেন। বাদী ও বিবাদী উভয়ে বাদশাহ দাঊদ-এর আদালত থেকে বেরিয়ে আসার সময় দরজার মুখে পুত্র সুলায়মানের সাথে দেখা হয়। তিনি মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা সব খুলে বলল। তিনি পিতা দাঊদের কাছে গিয়ে বললেন, আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হ'ত এবং উভয়ের জন্য কল্যাণকর হ'ত'। অতঃপর পিতার নির্দেশে তিনি বললেন, ছাগপাল শস্যক্ষেতের মালিককে সাময়িকভাবে দিয়ে দেওয়া হউক। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক। পক্ষান্তরে শস্যক্ষেতটি ছাগপালের মালিককে অর্পণ করা হউক। সে তাতে শস্য উৎপাদন করুক। অতঃপর শস্যক্ষেত্র যখন ছাগপালে বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন তা ক্ষেতের মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং ছাগপাল তার মালিককে ফেরৎ দেওয়া হবে'। হযরত দাঊদ (আঃ) রায়টি অধিক উত্তম গণ্য করে সেটাকেই কার্যকর করার নির্দেশ দেন। এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন,

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ- فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَّعِلْماً- (الأنبياء ٧٨-٧٩)-

'আর স্মরণ কর দাঊদ ও সুলায়মানকে, যখন তারা একটি শস্যক্ষেত সম্পর্কে বিচার করেছিল, যাতে রাত্রিকালে কারু মেষপাল ঢুকে পড়েছিল। আর তাদের বিচারকার্য আমাদের সম্মুখেই হচ্ছিল'। 'অতঃপর আমরা সুলায়মানকে মোকদ্দমাটির ফায়ছালা বুঝিয়ে দিলাম এবং আমরা উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম' (আম্বিয়া ২১/৭৮-৭৯)।

বস্ততঃ উভয়ের রায় সঠিক ও সুধারণা প্রসূত ছিল। কিন্তু অধিক উত্তম বিবেচনায় হযরত দাঊদ স্বীয় পুত্রের দেওয়া পরামর্শকেই কার্যকর করার নির্দেশ দেন। আর সেকারণেই আল্লাহ উভয়কে সমগুণে ভূষিত করে বলেছেন যে, 'আমরা উভয়কে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছি'। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিচারক উত্তম মনে করলে তার পূর্বের রায় বাতিল করে নতুন রায় প্রদান করতে পারেন।

(২) ইবাদত খানায় প্রবেশকারী বাদী-বিবাদীর বিচার: হযরত দাঊদ (আঃ) যেকোন ঘটনায় যদি বুঝতেন যে, এটি আল্লাহর তরফ থেকে পরীক্ষা, তাহ'লে তিনি সাথে সাথে আল্লাহর দিকে রুজু হ'তেন ও ক্ষমা প্রার্থনায় রত হ'তেন। এরই একটি উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ- إِذْ دَخَلُوْا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لاَ تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلاَ تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ- إِنَّ هَذَا أَخِيْ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ- قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيْراً مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَّأَنَابَ- فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ- (ص ٢١-٢٥)-

'আপনার কাছে কি সেই বাদী-বিবাদীর খবর পৌঁছেছে, যখন তারা পাঁচিল টপকিয়ে দাঊদের ইবাদতখানায় ঢুকে পড়েছিল'? (ছোয়াদ ২১) 'যখন তারা দাঊদের কাছে অনুপ্রবেশ করল এবং দাঊদ তাদের থেকে ভীত হয়ে পড়ল, তখন তারা বলল, আপনি ভয় পাবেন না, আমরা দু'জন বিবদমান পক্ষ। আমরা একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন' (২২)। '(বিষয়টি

এই যে,) সে আমার ভাই। সে ৯৯টি দুম্বার মালিক আর আমি মাত্র একটি মাদী দুম্বার মালিক। এরপরও সে বলে যে, এটি আমাকে দিয়ে দাও। সে আমার উপরে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করে' (২৩)। 'দাঊদ বলল, সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলির সাথে যুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরীকদের অনেকে একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে, কেবল তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। অবশ্য এরূপ লোকের সংখ্যা কম। (অত্র ঘটনায়) দাঊদ ধারণা করল যে, আমরা তাকে পরীক্ষা করছি। অতঃপর সে তার পালনকর্তার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়ল ও আমার দিকে প্রণত হ'ল' (২৪)। অতঃপর আমরা তাকে ক্ষমা করে দিলাম। নিশ্চয়ই তার জন্য আমাদের নিকটে রয়েছে নৈকট্য ও সুন্দর প্রত্যাবর্তন স্থল' (ছোয়াদ ৩৮/২১-২৫)।

উপরোক্ত পাঁচটি আয়াতে বা অন্য কোথাও এরূপ কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি যে, সে পরীক্ষা কি ছিল, দাঊদ (আঃ) কি ভুল করেছিলেন, যে কারণে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন এবং যা আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। ফলে সেই প্রাচীন যুগের কোন ঘটনার ব্যাখ্যা নবী ব্যতীত অন্য কারু পক্ষে এ যুগে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ধারণা ও কল্পনার মাধ্যমে যেটাই বলা হবে, তাতে ভ্রান্তির আশংকা থেকেই যাবে। কিন্তু পথভ্রষ্ট ইহুদী পন্ডিতেরা তাদের স্বগোত্রীয় এই মর্যাদাবান নবীর উক্ত ঘটনাকে এমন নোংরাভাবে পেশ করেছে, যা কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে। বলা হয়েছে, দাঊদ (আঃ)-এর নাকি ৯৯ জন স্ত্রী ছিল। এ সত্ত্বেও তিনি তাঁর এক সৈন্যের স্ত্রীকে জোরপূর্বক অপহরণ করেন। অতঃপর উক্ত সৈনিককে হত্যা করে তার স্ত্রীকে বিয়ে করেন। এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে আল্লাহ দু'জন ফেরেশতাকে বাদী ও বিবাদীর বেশে পাঠিয়ে তাকে শিক্ষা দেন (নাঊযুবিল্লাহ)।

(৩) শনিবার ওয়ালাদের পরিণতি: বনু ইস্রাঈলদের জন্য শনিবার ছিল সাপ্তাহিক ছুটির দিন এবং ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট ও পবিত্র দিন। এ দিন তাদের জন্য মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল। তারা সমুদ্রোপকুলের বাসিন্দা ছিল এবং মৎস্য শিকার ছিল তাদের পেশা। ফলে দাঊদ (আঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা ঐদিন মৎস্য শিকার করতে থাকে। এতে তাদের উপরে আল্লাহর পক্ষ হ'তে 'মস্খ' বা আকৃতি পরিবর্তনের শাস্তি নেমে আসে এবং তিনদিনের মধ্যেই তারা সবাই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ মদীনার ইহুদীদের উদ্দেশ্যে বলেন,

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ- فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ- (البقرة ৬৫-৬৬)-

‘আর তোমরা তো তাদেরকে ভালভাবে জানো, যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লংঘন করেছিল। আমরা তাদের বলেছিলাম, তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও’। ‘অতঃপর আমরা এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে এবং আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশ হিসাবে রেখে দিলাম’ (বাক্বারাহ ২/৬৫-৬৬)।

তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা প্রথমে গোপনে ও বিভিন্ন কৌশলে এবং পরে ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ দিনে মৎস্য শিকার করতে থাকে। এতে তারা দু’দলে বিভক্ত হয়ে যায়। সৎ ও বিজ্ঞ লোকেরা একাজে বাধা দেন। অপরদল বাধা অমান্য করে মাছ ধরতে থাকে। ফলে প্রথম দলের লোকেরা শেষোক্তদের থেকে পৃথক হয়ে যান। তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এমনকি তাদের বাসস্থানও পৃথক করে নেন। একদিন তারা অবাধ্যদের এলাকায় চরম নীরবতা লক্ষ্য করেন। অতঃপর তারা সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে, সবাই বানর ও শূকরে পরিণত হয়ে গেছে। ক্বাতাদাহ বলেন যে, বৃদ্ধরা শূকরে এবং যুবকেরা বানরে পরিণত হয়েছিল। রূপান্তরিত বানরেরা নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনকে চিনতে পেরেছিল এবং তাদের কাছে গিয়ে অঝোর নয়নে অশ্রু বিসর্জন করেছিল।

উক্ত বিষয়ে সূরা আ‘রাফের ১৬৪-৬৫ আয়াতের বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, সেখানে তৃতীয় আরেকটি দল ছিল, যারা উপদেশ দানকারীদের উপদেশ দানে বিরত রাখার চেষ্টা করত। বাহ্যতঃ এরা ছিল শান্তিবাদী এবং অলস ও সুবিধাবাদী। এরাও ফাসেকদের সাথে শূকর-বানরে পরিণত হয় ও ধ্বংস হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اَللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً، قَالُوْا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ- فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُونَ- (الأعراف ১৬৪-১৬৫)-

‘আর যখন তাদের মধ্যকার একদল বলল, কেন আপনারা ঐ লোকদের উপদেশ দিচ্ছেন, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিতে চান কিংবা তাদের আযাব দিতে চান কঠিন আযাব? ঈমানদারগণ বলল, তোমাদের পালনকর্তার নিকট ওযর পেশ করার জন্য এবং এজন্য যাতে ওরা সতর্ক হয়’। ‘অতঃপর তারা যখন উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তখন আমরা সেসব লোকদের মুক্তি দিলাম, যারা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করত এবং পাকড়াও করলাম যালেমদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের পাপাচারের কারণে’ (আ‘রাফ ৭/১৬৪-৬৫)।

এতে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধকারীদের পক্ষাবলম্বন না করে নিরপেক্ষতা অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ যালেম ও ফাসেকদের সাথেই আল্লাহর গযবে ধ্বংস হবে। অতএব হকপন্থীদের জন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার ব্যতীত অন্য কোন পথ খোলা নেই।

ছহীহ মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা কয়েকজন ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল! এ যুগের বানর-শূকরগুলো কি সেই আকৃতি পরিবর্তিত ইহুদী সম্প্রদায়? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেন, কিংবা তাদের উপরে আকৃতি পরিবর্তনের আযাব নাযিল করেন, তখন তাদের বংশধারা থাকে না। আর বানর-শূকর পৃথিবীতে পূর্বেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে।[12] ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, তারা খায় না, পান করে না এবং তিন দিনের বেশী বাঁচে না।[13]

তালূতের পরে বনু ইস্রাঈলগণের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় পর্যায়ে চলে যায়। যালেম বাদশাহদের দ্বারা তারা শাম দেশ হ'তে বিতাড়িত হয়। বিশেষ করে পারস্যরাজ বুখতানছর যখন তাদেরকে শাম থেকে বহিষ্কার করলেন, তখন তাদের একদল হেজাযে গিয়ে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিল। এই উদ্দেশ্যে যে, আমরা দাঊদ ও সুলায়মানের নির্মিত বায়তুল মুক্বাদ্দাস হারিয়েছি। ফলে এক্ষণে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ ইবরাহীম-ইসমাঈলের নির্মিত কা'বা গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। যাতে আমরা বা আমাদের বংশধররা শেষনবীর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়। সেমতে তারা আরবে হিজরত করে এবং ইয়াছরিবে বসবাস শুরু করে।

[12]. মুসলিম, 'তাক্বদীর' অধ্যায় হা/৬৭৭০।

[13]. কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ৬৫, পৃ: ১/৪৭৯।

সূত্র : কিতাবঃকাসাসুল আম্বিয়া, নবীদের কাহিনী।

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম

সকল প্রাণীর ভাষা বোঝার ক্ষমতা

হযরত সুলাইমান আলাইহি সালামের উক্তি - يا ايها الناس علمنا منطق الطير.
হে মানুষ, আমাকে পক্ষে কুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। 'অর্থাৎ, হযরত সুলাইমান আলাইহি সালাম পাখিদের ভাষা বুঝতেন, তারা শব্দ করে কি বুঝাতে চাই, তিনি মানুষকে তার ব্যাখ্যা করতেন।

হাফিজ আবু বকর বায়হাকীর সূত্রে আবু মালিক থেকে বর্ণনা করেন, একদিন সুলাইমান আলাইহিস সালাম কোথাও যাচ্ছিলেন, পথে দেখেন একটি পুরুষ চড়ুই পাখি আরেকটি চড়ুই পাখির পাশে ঘুরাঘুরি করছে। সুলাইমান আলাইহিস সালাম তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা বুঝেছ কি? চড়ুই পাখিটি কি বলছে? তারা বলল, হে আল্লাহর নবী, এরা কি বলছে? সুলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন, সে তার সাথে বিবাহের প্রস্তাব দিচ্ছে এবং বলছে, তুমি আমাকে বিয়ে কর, তাহলে তোমাকে নিয়ে আমি দামিস্কের প্রাসাদের যে কক্ষে চাও, এখানে বসবাস করবো।

অতঃপর সুলাইমান আলাইহিস সালাম এরূপ বলার কারণ ব্যাখ্যা করলেন, দামিশকের প্রাসাদ সমূহ শক্ত পাথর দ্বারা নির্মিত। তার মধ্যে কেউই বসবাস করতে পারে না, তবে বিবাহের প্রত্যেক প্রস্তাবই মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে থাকে। ইবনে আসাকির বাইহাকি থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। চড়ুই ছাড়াও অন্য সকল জীব জন্তু ও প্রাণীদের ভাষাও তিনি বুঝতেন। এর প্রমাণ কুরআন এর আয়াত - وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ, আমাকে সকল জিনিসের জ্ঞান দান করা হয়েছে '।যা একজন বাদশার জন্য প্রয়োজন। অর্থাৎ, দ্রব্যসামগ্রী, অস্ত্র, আসবাবপত্র, সৈন্য-সামন্ত, জিন, ইনসান, বিহঙ্গকুল, বন্য জন্তু,বিচরণকারী শয়তান, জ্ঞান-বিজ্ঞান, বাক ও নির্বাক জীবের অন্তরের খবর জানা ইত্যাদি। এরপর আল্লাহ বলেছেন -إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ 'নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট অনুগ্রহ। 'অর্থাৎ, এ সবই সৃষ্টি কুলের স্রষ্টা ও আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে দান।

হুদহুদ’ পাখির ঘটনা

হযরত সুলায়মান (আঃ) আল্লাহর হুকুমে পক্ষীকুলের আনুগত্য লাভ করেন। একদিন তিনি পক্ষীকুলকে ডেকে একত্রিত করেন ও তাদের ভাল-মন্দ খোঁজ-খবর নেন। তখন দেখতে পেলেন যে, ‘হুদহুদ’ পাখিটা নেই। তিনি অনতিবিলম্বে তাকে ধরে আনার জন্য কড়া নির্দেশ

জারি করলেন। সাথে তার অনুপস্থিতির উপযুক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করলেন। উক্ত ঘটনা কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ:

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لاَ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ- لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ- فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَّقِينٍ-)نمل ২০-২২)-

'সুলায়মান পক্ষীকুলের খোঁজ-খবর নিল। অতঃপর বলল, কি হ'ল হুদহুদকে দেখছি না যে? না-কি সে অনুপস্থিত' (নমল ২০)। সে বলল, 'আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেব কিংবা যবহ করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ' (২১)। 'কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ এসে হাযির হয়ে বলল, (হে বাদশাহ!) আপনি যে বিষয়ে অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার নিকটে 'সাবা' থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি' (নমল ২৭/২০-২২)।

এ পর্যন্ত বলেই সে তার নতুন আনীত সংবাদের রিপোর্ট পেশ করল। হুদহুদের মাধ্যমে একথা বলানোর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে একথা জানিয়ে দিলেন যে, নবীগণ গায়েবের খবর রাখেন না। তাঁরা কেবল অতটুকুই জানেন, যতটুকু আল্লাহ তাদেরকে অবহিত করেন।

উল্লেখ্য যে, 'হুদহুদ' এক জাতীয় ছোট্ট পাখির নাম। যা পক্ষীকুলের মধ্যে অতীব ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যাও দুনিয়াতে খুবই কম। বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) একদা নও মুসলিম ইহুদী পন্ডিত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, এতসব পাখী থাকতে বিশেষভাবে 'হুদহুদ' পাখির খোঁজ নেওয়ার কারণ কি ছিল? জওয়াবে তিনি বলেন, সুলায়মান (আঃ) তাঁর বিশাল বাহিনীসহ ঐসময় এমন এক অঞ্চলে ছিলেন, যেখানে পানি ছিল না। আল্লাহ তা'আলা হুদহুদ পাখিকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, সে ভূগর্ভের বস্তু সমূহকে এবং ভূগর্ভে প্রবাহিত পানি উপর থেকে দেখতে পায়। হযরত সুলায়মান (আঃ) হুদহুদকে এজন্যেই বিশেষভাবে খোঁজ করছিলেন যে, এতদঞ্চলে কোথায় মরুগর্ভে পানি লুক্কায়িত আছে, সেটা জেনে নিয়ে সেখানে জিন দ্বারা খনন করে যাতে দ্রুত পানি উত্তোলনের ব্যবস্থা করা যায়'। একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) 'হুদহুদ' পাখি সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। তখন নাফে' ইবনুল আযরক্ব তাঁকে বলেন,

قِفْ يا وَقَّافُ !كيف يَرَى الهدهدُ باطنَ الأرضِ وهو لا يَرَى الْفَخَّ حِيْنَ يَقَعُ فيه-

‘জেনে নিন হে মহা জ্ঞানী! হুদহুদ পাখি মাটির গভীরে দেখতে পায়। কিন্তু (তাকে ধরার জন্য) মাটির উপরে বিস্তৃত জাল সে দেখতে পায় না। যখন সে তাতে পতিত হয়’। জবাবে ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, إذا جاء القَدَرُ عَمِيَ البَصَرُ ‘যখন তাক্বদীর এসে যায়, চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়’। চমৎকার এ জবাবে মুগ্ধ হয়ে ইবনুল ‘আরাবী বলেন, لايَقْدِرُ على هذا الجوابِ إلا عالِمُ القرانِ ‘এরূপ জওয়াব দিতে কেউ সক্ষম হয় না, কুরআনের আলেম ব্যতীত’।[5]

[5]. কুরতুবী, তাফসীর সূরা নমল ২০ আয়াত।

রাণী বিলক্বীসের ঘটনা

হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর শাম ও ইরাক সাম্রাজ্যের পার্শ্ববর্তী ইয়ামন তথা ‘সাবা’ রাজ্যের রাণী ছিলেন বিলক্বীস বিনতুস সারাহ বিন হাদাহিদ বিন শারাহীল। তিনি ছিলেন সাম বিন নূহ (আঃ)-এর ১৮তম অধঃস্তন বংশধর। তাঁর ঊর্ধ্বতন ৯ম পিতামহের নাম ছিল ‘সাবা’।[6] সম্ভবতঃ তাঁর নামেই ‘সাবা’ সাম্রাজ্যের নামকরণ হয়।আল্লাহ তাদের সামনে জীবনোপকরণের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং নবীগণের মাধ্যমে এসব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আল্লাহর অবাধ্য হয় এবং ‘সূর্য পূজারী’ হয়ে যায়। ফলে তাদের উপরে প্লাবণের আযাব প্রেরিত হয় ও সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ সূরা সাবা ১৫ হ’তে ১৭ আয়াতে এই সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

দুনিয়াবী দিক দিয়ে এই ‘সাবা’ সাম্রাজ্য খুবই সমৃদ্ধ এবং শান-শওকতে পূর্ণ ছিল। তাদের সম্পর্কে হযরত সুলায়মানের কিছু জানা ছিল না বলেই কুরআনী বর্ণনায় প্রতীয়মান হয়। তাঁর এই না জানাটা বিস্ময়কর কিছু ছিল না। ইয়াকূব (আঃ) তাঁর বাড়ীর অনতিদূরে তাঁর সন্তান ইউসুফকে কূয়ায় নিক্ষেপের ঘটনা জানতে পারেননি। স্ত্রী আয়েশার গলার হারটি হারিয়ে গেল। অথচ স্বামী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা জানতে পারেননি। বস্তুতঃ আল্লাহ যতটুকু ইল্ম বান্দাকে দেন, তার বেশী জানার ক্ষমতা কারু নেই। পার্শ্ববর্তী ‘সাবা’ সাম্রাজ্য সম্পর্কে পূর্বে না জানা এবং পরে জানার মধ্যে যে কি মঙ্গল নিহিত ছিল, তা পরবর্তী ঘটনাতেই প্রমাণিত হয়েছে এবং রাণী বিলক্বীস মুসলমান হয়ে যান। বস্তুতঃ হুদহুদ পাখি তাদের সম্পর্কে হযরত সুলায়মানের নিকটে এসে প্রথম খবর দেয়। তার বর্ণিত প্রতিবেদনটি ছিল কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ :

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ- وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ- (نمل ২৩-২৪)-

‘আমি এক মহিলাকে সাবা বাসীদের উপরে রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে’ (২৩)। ‘আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলীকে সুশোভিত করেছে। অতঃপর তাদেরকে সত্যপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। ফলে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয় না’ (নমল ২৭/২৩-২৪)।

সুলায়মান বলল,

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ)27 (اذْهَبْ بِكِتَابِيْ هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ
مَاذَا يَرْجِعُوْنَ)28 (قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيْمٌ)29 (إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ)30 (أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُوْنِي مُسْلِمِيْنَ)31 (قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُوْنِيْ فِيْ أَمْرِيْ
مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوْنِ)32 (قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوْ قُوَّةٍ وَأُوْلُوْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِيْ
مَاذَا تَأْمُرِيْنَ)33 (قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوْكَ إِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً أَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُوْنَ
وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ)35 (فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ (34)
فَمَا آتَانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ)36 (ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لاَ قِبَلَ لَهُمْ
بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُوْنَ)37 (قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي
مُسْلِمِيْنَ)38 (قَالَ عِفْرِيْتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِيْنٌ
قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيْكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَّرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ (39)
قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي
غَنِيٌّ كَرِيْمٌ)40 (قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ)41 (فَلَمَّا جَاءَتْ
قِيْلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ)42 (وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ
مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِيْنَ)43 (قِيْلَ لَهَا ادْخُلِيْ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً
وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيْرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ
سُلَيْمَانَ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ-)نمل 27-44(-

‘এখন আমরা দেখব তুমি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যাবাদীদের একজন’ (২৭)। ‘তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পণ কর। অতঃপর তাদের কাছ থেকে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি জওয়াব দেয়’ (২৮)। ‘বিলক্বীস বলল, হে সভাসদ বর্গ! আমাকে একটি মহিমান্বিত পত্র দেওয়া হয়েছে’ (২৯)। ‘সেই পত্র সুলায়মানের পক্ষ হ’তে এবং তা হ’ল এই: করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)’ (৩০)। ‘আমার মোকাবেলায় তোমরা শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার নিকটে উপস্থিত হও’ (৩১)। ‘বিলক্বীস বলল, হে আমার পারিষদ বর্গ! আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দিন। আপনাদের উপস্থিতি

ব্যতিরেকে আমি কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না' (৩২)। 'তারা বলল, আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত আপনার হাতে। অতএব ভেবে দেখুন আপনি আমাদের কি আদেশ করবেন' (৩৩)।

'রাণী বলল, রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত লোকদের অপদস্থ করে। তারাও এরূপ করবে' (৩৪)। 'অতএব আমি তাঁর নিকটে কিছু উপঢৌকন পাঠাই। দেখি, প্রেরিত লোকেরা কি জওয়াব নিয়ে আসে' (৩৫)। 'অতঃপর যখন দূত সুলায়মানের কাছে আগমন করল, তখন সুলায়মান বলল, তোমরা কি ধন-সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদের দেওয়া বস্তু থেকে অনেক উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাক' (৩৬)। 'ফিরে যাও তাদের কাছে। এখন অবশ্যই আমরা তাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী সহ আগমন করব, যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই। আমরা অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিষ্কার করব এবং তারা হবে লাঞ্ছিত' (৩৭)। 'অতঃপর সুলায়মান বলল, হে আমার পারিষদবর্গ! তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে আছ বিলক্বীসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে?' (৩৮) 'জনৈক দৈত্য-জ্বিন বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বেই আমি তা এনে দেব এবং আমি একাজে শক্তিবান ও বিশ্বস্ত' (৩৯)। '(কিন্তু) কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বলল, তোমার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা এনে দিব। অতঃপর সুলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখল, তখন বলল, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি শুকরিয়া আদায় করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের কল্যাণের জন্য তা করে থাকে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত ও কৃপাময়' (নমল ৪০)।

'সুলায়মান বলল, বিলক্বীসের সিংহাসনের আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখব সে সঠিক বস্তু চিনতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা সঠিক পথ খুঁজে পায় না?' (৪১) 'অতঃপর যখন বিলক্বীস এসে গেল, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল: আপনার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলল, মনে হয় এটা সেটিই হবে। আমরা পূর্বেই সবকিছু অবগত হয়েছি এবং আমরা আজ্ঞাবহ হয়ে গেছি' (৪২)। 'বস্তুতঃ আল্লাহর পরিবর্তে সে যার উপাসনা করত, সেই-ই তাকে ঈমান থেকে বিরত রেখেছিল। নিশ্চয়ই সে কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল' (৪৩)। 'তাকে বলা হ'ল, প্রাসাদে প্রবেশ করুন। অতঃপর যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করল, তখন ধারণা করল যে, এটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয়। ফলে সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। সুলায়মান বলল, এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ। বিলক্বীস বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি তো নিজের প্রতি যুলুম

করেছি। আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহর নিকটে আত্মসমর্পণ করলাম’ (নমল ২৭/২৭-৪৪)।

সূরা নমল ২২ হ’তে ৪৪ আয়াত পর্যন্ত উপরে বর্ণিত ২৩টি আয়াতে রাণী বিলক্বীসের কাহিনী শেষ হয়েছে। এর মধ্যে ৪০তম আয়াতে ‘যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল’ বলে কাকে বুঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে তাফসীরবিদগণ মতভেদ করেছেন। তার মধ্যে প্রবল মত হ’ল এই যে, তিনি ছিলেন স্বয়ং হযরত সুলায়মান (আঃ)। কেননা আল্লাহর কিতাবের সর্বাধিক জ্ঞান তাঁরই ছিল। তিনি এর দ্বারা উপস্থিত জিন ও মানুষ পারিষদ বর্গকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তোমাদের সাহায্য ছাড়াও আল্লাহ অন্যের মাধ্যমে অর্থাৎ ফেরেশতাদের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করে থাকেন। ‘আর এটি হ’ল আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ’ (নমল ৪০)। দ্বিতীয়তঃ গোটা ব্যাপারটাই ছিল একটা মু‘জেযা এবং রাণী বিলক্বীসকে আল্লাহর সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদর্শন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। বস্ত্ততঃ এতে তিনি সফল হয়েছিলেন এবং সুদূর ইয়ামন থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে বিলক্বীস তার সিংহাসনের আগাম উপস্থিতি দেখে অতঃপর স্ফটিক স্বচ্ছ প্রাসাদে প্রবেশকালে অনন্য কারুকার্য দেখে এবং তার তুলনায় নিজের ক্ষমতা ও প্রাসাদের দীনতা বুঝে লজ্জিত ও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর নিকটে আত্মসমর্পণ করে মুসলমান হয়ে যান। মূলতঃ এটাই ছিল হযরত সুলায়মানের মূল উদ্দেশ্য, যা শতভাগ সফল হয়েছিল।

এর পরবর্তী ঘটনাবলী, যা বিভিন্ন তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে যেমন সুলায়মানের সাথে বিলক্বীসের বিবাহ হয়েছিল। সুলায়মান তার রাজত্ব বহাল রেখে ইয়ামনে পাঠিয়ে দেন। প্রতি মাসে সুলায়মান একবার করে সেখানে যেতেন ও তিনদিন করে থাকতেন। তিনি সেখানে বিলক্বীসের জন্য তিনটি নযীরবিহীন প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন- ইত্যাদি সবকথাই ধারণা প্রসূত। যার কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই।

জনৈক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উৎবাকে জিজ্ঞেস করেন, সুলায়মান (আঃ)-এর সাথে বিলক্বীসের বিয়ে হয়েছিল কি? জওয়াবে তিনি বলেন, বিলক্বীসের বক্তব্য وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ‘আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহর নিকটে আত্মসমর্পণ করলাম’ (নমল ৪৪)-এ পর্যন্তই শেষ হয়ে গেছে। কুরআন এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চুপ রয়েছে। অতএব আমাদের এ বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন নেই (তাফসীর বাগাভী)।

[6]. কুরতুবী, তাফসীর সূরা নমল ৪৪ ও ২৩ আয়াত।

পিপীলিকার ঘটনা

হযরত সুলায়মান (আঃ) একদা তাঁর বিশাল সেনাবাহিনী সহ একটি এলাকা অতিক্রম করছিলেন। ঐ সময় তাঁর সাথে জিন, মানুষ পক্ষীকুল ছিল। যে এলাকা দিয়ে তাঁরা যাচ্ছিলেন সে এলাকায় বালির ঢিবি সদৃশ পিপীলিকাদের বহু বসতঘর ছিল। সুলায়মান বাহিনীকে আসতে দেখে পিপীলিকাদের সর্দার তাদেরকে বলল, তোমরা শীঘ্র পালাও। নইলে পাদপিষ্ট হয়ে শেষ হয়ে যাবে। সুলায়মান (আঃ) পিপীলিকাদের এই বক্তব্য শুনতে পেলেন। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ- وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ- حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ- فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ- (نمل ১৬-১৯)-

‘সুলায়মান দাঊদের স্থলাভিষিক্ত হ’ল এবং বলল, হে লোক সকল! আমাদেরকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে সবকিছু দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এটি একটি সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব’ (নমল ১৬)। ‘অতঃপর সুলায়মানের সম্মুখে তার সোনাবাহিনীকে সমবেত করা হ’ল জিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে। তারপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হ’ল’ (১৭)। ‘অতঃপর যখন তারা একটি পিপীলিকা অধ্যুষিত এলাকায় উপনীত হ’ল, তখন এক পিপীলিকা বলল, ‘হে পিপীলিকা দল! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে’ (১৮)। ‘তার কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হাসল এবং বলল, ‘হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে ক্ষমতা দাও, যেন আমি তোমার নে‘মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পসন্দনীয় সৎকর্মাদি করতে পারি এবং তুমি আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর’ (নমল ২৭/১৬-১৯)।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে প্রমাণিত হয় যে, সুলায়মান (আঃ) কেবল পাখির ভাষা নয়, বরং সকল জীবজন্তু এমনকি ক্ষুদ্র পিঁপড়ার কথাও বুঝতেন। এজন্য তিনি মোটেই গর্ববোধ না করে বরং আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি শুকরিয়া আদায় করেন এবং নিজেকে যাতে আল্লাহ অন্যান্য সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেন সে প্রার্থনা করেন। এখানে আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, তিনি কেবল জিন-ইনসানের নয় বরং তাঁর সময়কার সকল জীবজন্তুরও নবী ছিলেন। তাঁর

নবুঅতকে সবাই স্বীকার করত এবং সকলে তাঁর প্রতি আনুগত্য পোষণ করত। যদিও জিন ও ইনসান ব্যতীত অন্য প্রাণী শরী'আত পালনের হকদার নয়।

সূত্র :কাসাসুল আম্বিয়া, নবীদের কাহিনী

হযরত উজাইর আলাইহিস সালাম

হযরত উজায়ের আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিদর্শন

উজাইর হিজকিল নবির সাওয়াদ এলাকায় অবস্থিত আশ্রমে বসে তাওরাত কিতাবের পুনরায় লেখার কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। যে নগরীতে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন তার নাম সাইরাবাজ। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী - وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ 'তোমাকে আমি মানব জাতির জন্য নিদর্শন বানাবার উদ্দেশ্যে এরূপ করেছি। 'মানবজাতি বলতে এখানে বনি ইসরাইলকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, উজাইর তার পুত্রদের মাঝে অবস্থান করছিলেন। অথচ পুত্রগণ সবাই ছিল বৃদ্ধ আর তিনি অবশ্য যুবক। এর কারণ, যখন তার মৃত্যু হয় তখন তার বয়স ছিল ৪০বছর । একশত বছর পর আল্লাহ যখন তাকে জীবিত করলেন প্রথম মৃত্যু কালের যৌবন অবস্থার উপরে জীবিত করেছিলেন।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, বুখতে নসরের ঘটনার পর উজায়ের পুনর্জীবিত হয়েছিলেন হাসানও এ একই মত প্রকাশ করেছেন। আবু হাতিম সিজিসতানি ইবনু আব্বাসের বক্তব্যকে কবিতা আকারে নিম্নলিখিত ভাবে রূপ দিয়েছেন।

তার উজাইরের মাথার চুল কালোই আছে, কিন্তু এর পূর্বেই। তাঁর পুত্র ও পৌত্রের চুল পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। অথচ বড় তো তিনিই।

তার পুত্রকে দেখা যায় বৃদ্ধ, লাঠির উপর ভর দিয়ে চলাফেরা করে, অথচ পিতার দাড়ি এখনো রয়েছে কালো এবং মাথার চুল লাল খয়েরি।

পুত্রের দৈহিক শক্তি সামর্থ্য ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে।ফলে সে দাঁড়াতে ও হাটতে চায় তখন ছোট্ট শিশুর ন্যায় আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে যায় । সমাজের লোক জানে, তার(উজাইর) পুত্র নব্বই বছর পর্যন্ত তাদের মাঝে চলাফেরা করেছে । কিন্তু ২০ বছর হলো ভাল রূপে চলতে ফিরতে পারছেনা।

পিতার বয়স ৪০ বছর, আর পুত্রের বয়স ৯০ বছর অতিক্রম করেছে।এই এমন একটি বিষয় যা তোমার বুদ্ধি থাকলে তুমি অনুধাবন করতে পারবে। আর যদি এর মর্ম অনুধাবন করতে ব্যর্থ হও, তাহলে তোমার অজ্ঞতা ক্ষমার যোগ্য।

উজায়ের কে আল্লাহর পুত্র বলার কারণ

প্রসিদ্ধ মতে, উজায়র আলাইহিস সালাম ছিলেন বনি ইসরাঈলদের নবী। তিনি দাউদ ও সুলাইমান এবং জাকারিয়া ও ইয়াহয়া আলাইহিস সালাম এর মধ্যবর্তী সময়ে আবির্ভূত হন। কথিত আছে, বনি ইসরাইলের মধ্যে কারণ নিকট যখন তাওরাত কিতাব সংরক্ষিত ছিল না, তখন উজায়েরের স্মৃতিপটে আল্লাহ তাওরাত কিতাব জাগরুক করে দেন এবং বনি ইসরাইলকে তিনি তা পড়ে শুনান। এ প্রসঙ্গে ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর নির্দেশে একটি ফিরিশতা নূরের চামচ নিয়ে আসেন এবং উজাইরের মুখের মধ্যে তা ঢেলে দেন। অতঃপর তিনি তাওরাতের হুবুহু একটি কপি লিখে দেন।

ইবনে আসাকির লিখেছেন, ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একদা আব্দুল্লাহ ইবনু সালামের নিকট নিম্নোক্ত আয়াতটি-وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ'ইহুদিরা ওজাইয়ের কে আল্লাহর পুত্র বলে থাকে। 'উল্লেখপূর্বক জিজ্ঞেস করেন, তাকে আল্লাহর পুত্র বলার কারণ কি? উত্তরে আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন , বনি ইসরাইলের মধ্যে এ সময়ে তাওরাত কণ্ঠস্থকারী একজন লোকও ছিল না। তারা বলতো, নবী মুসাও তাওরাত লিখিত আকারে ছাড়া আমাদেরকে দিতে পারেননি। অথচ উজায়ের নিজের স্মৃতি থেকে অলিখিত তাওরাত আমাদেরকে দিয়েছেন। তার এই বিস্ময়কর প্রতিভা দেখে বনি ইসরাইলের একদল লোক তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত করে।

এ কারণে অধিকাংশ আলেম বলেছেন, তাওরাত কিতাবের ধারাবাহিকতা উজায়ের এর সময় শেষ হয়ে যায়। তিনি যদি নবী হয়ে থাকেন, তাহলে এ মন্তব্যটি খুবই প্রনিধান যোগ্য। আতা ইবনু আবি রাবাহ এবং হাসান বসরিও মন্তব্য করেছেন ।

সূত্র -বই:কাসাসুল আম্বিয়া।

হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালাম

পরিচয় ও বিবরণ

আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً- 'তুমি এই কিতাবে ইদরীসের কথা আলোচনা কর। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও নবী'। 'আমরা তাকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম' (মারিয়াম ১৯/৫৬-৫৭)।

ইদরীস (আঃ)-এর পরিচয়: তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত নবী। তাঁর নামে বহু উপকথা তাফসীরের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। যে কারণে জনসাধারণ্যে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। হযরত ইদরীস (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-এর পূর্বের নবী ছিলেন, না পরের নবী ছিলেন এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ ছাহাবীর মতে তিনি নূহ (আঃ)-এর পরের নবী ছিলেন।[1]

সূরা মারিয়ামে হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকূব, হারূণ, মূসা, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ইবনে মারিয়াম ও ইদরীস (আঃ)-এর আলোচনা শেষে আল্লাহ বলেন,

أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوْا سُجَّداً وَبُكِيّاً-

'এঁরাই হ'লেন সেই সকল নবী, যাদেরকে নবীগণের মধ্য হ'তে আল্লাহ বিশেষভাবে অনুগৃহীত করেছেন। এঁরা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমরা নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশধর এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈল (ইয়াকূব)-এর বংশধর এবং যাদেরকে আমরা (ইসলামের) সুপথ প্রদর্শন করেছি ও (ঈমানের জন্য) মনোনীত করেছি তাদের বংশধর। তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহর আয়াত সমূহ পাঠ করা হ'ত, তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত ও ক্রন্দন করত' (মারিয়াম ১৯/৫৮)। অত্র আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইদরীস (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-এর পরের নবী ছিলেন। তবে নূহ ও ইদরীস হযরত আদম (আঃ)-এর নিকটবর্তী নবী ছিলেন, যেমন ইবরাহীম (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-এর নিকটবর্তী এবং ইসমাঈল, ইসহাক্ব ও ইয়াকূব হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকটবর্তী নবী ছিলেন।[2] নূহ পরবর্তী সকল মানুষ হ'লেন নূহের বংশধর।[3]

উল্লেখ্য যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস, কা'ব আল-আহবার, সুদ্দী প্রমুখের বরাতে হযরত ইদরীস (আঃ)-এর জান্নাত দেখতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ফেরেশতার মাধ্যমে সশরীরে আসমানে উত্থান ও ৪র্থ আসমানে মালাকুল মউত কর্তৃক তাঁর জান কবয করা, অতঃপর সেখানেই অবস্থান করা ইত্যাদি বিষয়ে যেসব বর্ণনা তাফসীরের কিতাব সমূহে দেখতে পাওয়া যায়, তার সবই ভিত্তিহীন ইস্রাঈলিয়াত মাত্র।[4]

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনে হযরত ইদরীস (আঃ) সম্পর্কে সূরা মারিয়াম ৫৬, ৫৭ এবং সূরা আম্বিয়া ৮৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

কুরতুবী বলেন, ইদরীস (আঃ)-এর নাম 'আখনূখ' ছিল এবং তিনি হযরত নূহ (আঃ)-এর পরদাদা ছিলেন বলে বংশবিশারদগণ যে কথা বলেছেন, তা ধারণা মাত্র। এমনিভাবে অন্যান্য নবীদের যে দীর্ঘ বংশধারা সাধারণতঃ বর্ণনা করা হয়ে থাকে, সে সবের কোন সঠিক ভিত্তি নেই। এসবের প্রকৃত ইল্ম কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটে রয়েছে। ইদরীস (আঃ)-কে ৩০টি ছহীফা প্রদান করা হয়েছিল বলে হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) থেকে ইবনু হিববানে (নং ৩৬১) যে বর্ণনা এসেছে, তার সনদ যঈফ।[5]

কুরতুবী বলেন, তিনি যে নূহের পূর্বেকার নবী ছিলেন না, তার বড় প্রমাণ হ'ল এই যে, মি'রাজে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ১ম আসমানে আদম (আঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি রাসূলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন, مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح 'নেককার সন্তান ও নেককার নবীর জন্য সাদর সম্ভাষণ'। অতঃপর ৪র্থ আসমানে হযরত ইদরীস (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হ'লে তিনি রাসূলকে বলেন, مرحبا بالاخ الصالح والنبى الصالح 'নেককার ভাই ও নেককার নবীর জন্য সাদর সম্ভাষণ'।[6] ক্বাযী আয়ায বলেন, যদি ইদরীস (আঃ) নূহ (আঃ)-এর পূর্বেকার নবী হ'তেন, তাহ'লে তিনি শেষনবী (ছাঃ)-কে 'নেককার ভাই' না বলে 'নেককার সন্তান' বলে সম্ভাষণ জানাতেন। যেমন আদম, নূহ ও ইবরাহীম বলেছিলেন। তিনি বলেন, নূহ ছিলেন সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত প্রথম রাসূল। যেমন শেষনবী ছিলেন সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত শেষ রাসূল। আর ইদরীস (আঃ) ছিলেন স্বীয় কওমের প্রতি প্রেরিত নবী। যেমন ছিলেন হূদ, ছালেহ প্রমুখ নবী'।[7] উল্লেখ্য যে, এখানে আদম, নূহ ও ইবরাহীমকে 'পিতা' হিসাবে খাছ করার কারণ এই যে, আদম হ'লেন মানবজাতির আদি পিতা। নূহ হ'লেন মানবজাতির দ্বিতীয় পিতা এবং ইবরাহীম হ'লেন তাঁর পরবর্তী সকল নবীর পিতা 'আবুল আম্বিয়া'।

বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইদরীস (আঃ) হ'লেন প্রথম মানব, যাঁকে মু'জেযা হিসাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংকবিজ্ঞান দান করা হয়েছিল। তিনিই সর্বপ্রথম মানব, যিনি আল্লাহর ইলহাম

মতে কলমের সাহায্যে লিখন পদ্ধতি ও বস্ত্র সেলাই শিল্পের সূচনা করেন। তাঁর পূর্বে মানুষ সাধারণতঃ পোশাক হিসাবে জীবজন্তুর চামড়া ব্যবহার করত। ওযন ও পরিমাপের পদ্ধতি তিনিই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন এবং লোহা দ্বারা অস্ত্র-শস্ত্র তৈরীর পদ্ধতি আবিষ্কার ও তার ব্যবহার তাঁর আমল থেকেই শুরু হয়। তিনি অস্ত্র নির্মাণ করে ক্বাবীল গোত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ করেন।[৪]

[1]. তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন পৃঃ ৪৫২।
[2]. কুরতুবী, মারিয়াম ৫৮-এর ব্যাখ্যা।

সূত্র -বই:নবীদের কাহিনী

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম

পরিচয় ও বিবরণ

হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন বনু ইস্রাঈল বংশের সর্বশেষ নবী ও কিতাবধারী রাসূল। তিনি ‘ইনজীল’ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরপর থেকে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত আর কোন নবী আগমন করেননি। এই সময়টাকে فترة الرسل বা ‘রাসূল আগমনের বিরতিকাল’ বলা হয়। ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার অব্যবহিত কাল পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর হুকুমে পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং মুহাম্মাদী শরী'আত অনুসরণে ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে সারা পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য কায়েম করবেন। তিনি উম্মতে মুহাম্মাদীর সাথে বিশ্ব সংস্কারে ব্রতী হবেন। তাই তাঁর সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তৃত ধারণা দেওয়া অত্যন্ত যরূরী বিবেচনা করে আল্লাহ পাক শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, মূসা (আঃ)-এর অনুসারী হওয়ার দাবীদার ইহুদীরা তাঁকে নবী বলেই স্বীকার করেনি। অত্যন্ত লজ্জাষ্করভাবে তারা তাঁকে জনৈক ইউসুফ মিস্ত্রীর জারজ সন্তান বলে আখ্যায়িত করেছে (নাঊযুবিল্লাহ)। অন্যদিকে ঈসা (আঃ)-এর ভক্ত ও অনুসারী হবার দাবীদার খৃষ্টানরা বাড়াবাড়ি করে তাঁকে ‘আল্লাহর পুত্র’ (তওবাহ ৯/৩০) বানিয়েছে’। বরং ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানরা তাঁকে সরাসরি ‘আল্লাহ’ সাব্যস্ত করেছে এবং বলেছে যে, তিনি হ’লেন তিন আল্লাহর একজন (ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ =মায়েদাহ ৭৩)। অর্থাৎ ঈসা, মারিয়াম ও আল্লাহ প্রত্যেকেই আল্লাহ এবং তারা এটাকে ‘বুদ্ধি

বহির্ভূত সত্য' বলে ক্ষান্ত হয়। অথচ এরূপ ধারণা পোষণকারীদের আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে 'কাফের' বলে ঘোষণা করেছেন (মায়েদাহ ৫/৭২-৭৩)। কুরআন তাঁর সম্পর্কে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করেছে। আমরা এখন সেদিকে মনোনিবেশ করব।

উল্লেখ্য যে, হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের মোট ১৫টি সূরায় ৯৮টি আয়াতে[1] বর্ণিত হয়েছে।

[1]. যথাক্রমে (১) বাক্বারাহ ২/৮৭, ১৩৬, ২৫৩; (২) আলে-ইমরান ৩/৩৫-৬৩=২৯ ,৮৪; (৩) নিসা ৪/১৫৬-১৫৮=৩, ১৬৩, ১৭১-১৭২; (৪) মায়েদাহ ৫/১৭, ৪৬-৪৭, ৭২-৭৫=৪, ৭৮, ১১০-১১৮=৯; (৫) আন'আম ৬/৮৫; (৬) তওবা ৯/৩০-৩১; (৭) মারিয়াম ১৯/১৬-৪০=২৫; (৮) আম্বিয়া ২১/৯১; (৯) মুমিনূন ২৩/৫০; (১০) আহযাব ৩২/৭; (১১) শূরা ৪২/১৩; (১২) যুখরুফ ৪৩/৫৭-৫৯=৩, ৬৩-৬৫=৩; (১৩) হাদীদ ৫৭/২৭; (১৪) ছফ ৬১/৬, ১৪; (১৫) তাহরীম ৬৬/১২। সর্বমোট = ৯৮টি

ঈসার মা ও নানী

ঈসা (আঃ)-এর আলোচনা করতে গেলে তাঁর মা ও নানীর আলোচনা আগেই করে নিতে হয়। কারণ তাঁদের ঘটনাবলীর সাথে ঈসার জীবনের গভীর যোগসূত্র রয়েছে। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরী'আতে প্রচলিত ইবাদত-পদ্ধতির মধ্যে আল্লাহর নামে সন্তান উৎসর্গ করার রেওয়াজও চালু ছিল। এসব উৎসর্গীত সন্তানদের পার্থিব কোন কাজকর্মে নিযুক্ত করা হ'ত না। এ পদ্ধতি অনুযায়ী ঈসার নানী অর্থাৎ ইমরানের স্ত্রী নিজের গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে মানত করলেন যে, তাকে বিশেষভাবে আল্লাহর ঘর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতে নিয়োজিত করা হবে। তিনি ভেবেছিলেন যে পুত্র সন্তান হবে। কিন্তু যখন তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করলেন, তখন আক্ষেপ করে বললেন, 'হে আল্লাহ! আমি কন্যা প্রসব করেছি'? (আলে ইমরান ৩৬)। অর্থাৎ একে দিয়ে তো আমার মানত পূর্ণ হবে না। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। তিনি উক্ত কন্যাকেই কবুল করে নেন। বস্ত্ততঃ ইনিই ছিলেন মারিয়াম বিনতে ইমরান, যিনি ঈসা (আঃ)-এর কুমারী মাতা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকে জান্নাতের শ্রেষ্ঠ চারজন মহিলার অন্যতম হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

أفضلُ نساءِ أهلِ الجنتِ خديجتُ بنتِ خُوَيْلِدِ وفاطمةُ بنتِ محمدٍ ومريمُ———

‘জান্নাতবাসী মহিলাগণের মধ্যে সেরা হ’লেন চারজন: খাদীজা বিনতে খুওয়ালিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ, মারিয়াম বিনতে ইমরান এবং আসিয়া বিনতে মুযাহিম, যিনি ফেরাঊনের স্ত্রী’।[2]

[2]. আহমাদ, ত্বাবারাণী, হাকেম, ইবনু আববাস (রাঃ) হ’তে; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫০৮।

মারিয়ামের জন্ম ও লালন-পালন

মারিয়ামের জন্ম ও লালন-পালন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ- فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِّي أُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ- فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ- (آل عمران ৩৫-৩৭)-

‘যখন ইমরানের স্ত্রী বলল, হে আমার প্রভু! আমার গর্ভে যা রয়েছে তাকে আমি তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত হিসাবে। অতএব আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ (আলে ইমরান ৩৫)। ‘অতঃপর সে যখন তাকে প্রসব করল, তখন বলল, হে প্রভু! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি! অথচ আল্লাহ ভাল করেই জানেন, সে কি প্রসব করেছে। (আল্লাহ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,) এই কন্যার মত কোন পুত্রই যে নেই। আর আমি তার নাম রাখলাম ‘মারিয়াম’। (মারিয়ামের মা দো‘আ করে বলল, হে আল্লাহ!) আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি, অভিশপ্ত শয়তানের কবল হ’তে’ (৩৬)। আল্লাহ বলেন, ‘অতঃপর তার প্রভু তাকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করলেন। (অতঃপর ঘটনা হ’ল এই যে,) যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কাছে আসতেন, তখনই কিছু খাদ্য দেখতে পেতেন। তিনি জিজ্ঞেস করতেন, মারিয়াম! এসব কোথা থেকে তোমার কাছে এল? মারিয়াম বলত, ‘এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করে থাকেন’ (আলে ইমরান ৩/৩৫-৩৭)।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর নামে উৎসর্গীত সন্তান পালন করাকে তখনকার সময়ে খুবই পুণ্যের কাজ মনে করা হ’ত। আর সেকারণে মারিয়ামকে প্রতিপালনের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। ফলে লটারীর ব্যবস্থা করা হয় এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর বয়োবৃদ্ধ নবী হযরত যাকারিয়া (আঃ) মারিয়ামের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন (আলে ইমরান ৩/৪৪)।

ঈসার জন্ম ও লালন-পালন

এভাবে মেহরাবে অবস্থান করে মারিয়াম বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমত করতে থাকেন। সম্মানিত নবী ও মারিয়ামের বয়োবৃদ্ধ খালু যাকারিয়া (আঃ) সর্বদা তাকে দেখাশুনা করতেন। মেহরাবের উত্তর-পূর্বদিকে সম্ভবতঃ খেজুর বাগান ও ঝর্ণাধারা ছিল। যেখানে মারিয়াম পর্দা টাঙিয়ে মাঝে-মধ্যে পায়চারি করতেন। অভ্যাসমত তিনি উক্ত নির্জন স্থানে একদিন পায়চারি করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ মানুষের বেশে সেখানে জিবরাঈল উপস্থিত হন। স্বাভাবিকভাবেই তাতে মারিয়াম ভীত হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيًّا- فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا- قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا- قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاَمًا زَكِيًّا- قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا- قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا- (مريم ১৬-২১)-

(হে মুহাম্মাদ!) 'আপনি এই কিতাবে মারিয়ামের কথা বর্ণনা করুন। যখন সে তার পরিবারের লোকজন হ'তে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে একস্থানে আশ্রয় নিল' (মারিয়াম ১৬)। 'অতঃপর সে তাদের থেকে আড়াল করার জন্য পর্দা টাঙিয়ে নিল। অতঃপর আমরা তার নিকটে আমাদের 'রূহ' (অর্থাৎ জিব্রীলকে) প্রেরণ করলাম। সে তার কাছে গিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল' (১৭)। 'মারিয়াম বলল, আমি তোমার থেকে করুণাময় আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যদি তুমি আল্লাহভীরু হও' (১৮)। 'সে বলল, আমি তো কেবল তোমার প্রভুর প্রেরিত। এজন্য যে, আমি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান দান করে যাব' (১৯)। 'মারিয়াম বলল, কিভাবে আমার পুত্র সন্তান হবে? অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণী নই' (২০)। 'সে বলল, এভাবেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ ব্যাপার এবং আমরা তাকে (ঈসাকে) মানবজাতির জন্য একটা নিদর্শন ও আমাদের পক্ষ হ'তে বিশেষ অনুগ্রহরূপে পয়দা করতে চাই। তাছাড়া এটা (পূর্ব থেকেই) নির্ধারিত বিষয়' (মারিয়াম ১৯/১৬-২১)। অতঃপর জিব্রীল মারিয়ামের মুখে অথবা তাঁর পরিহিত জামায় ফুঁক মারলেন এবং তাতেই তাঁর গর্ভ সঞ্চার হ'ল (আম্বিয়া ২১/৯১; তাহরীম ৬৬/১২)। অন্য আয়াতে একে 'আল্লাহর কলেমা' (بِكَلِمَةٍ مِنْهُ) অর্থাৎ 'কুন্' (হও) বলা হয়েছে (আলে ইমরান ৩/৪৫)।

অতঃপর আল্লাহ বলেন,

فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا- فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا- فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا- وَهُزِّيْ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا- فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيْ إِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا- (مريم ২২-২৬)-

‘অতঃপর মারিয়াম গর্ভে সন্তান ধারণ করল এবং তৎসহ একটু দূরবর্তী স্থানে চলে গেল’ (মারিয়াম ২২)। ‘এমতাবস্থায় প্রসব বেদনা তাকে একটি খর্জুর বৃক্ষের মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তখন সে বলল, হায়! আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম এবং আমি যদি মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম’ (২৩)। ‘এমন সময় ফেরেশতা তাকে নিম্নদেশ থেকে (অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী নিম্নভূমি থেকে) আওয়ায দিয়ে বলল, তুমি দুঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পাদদেশে একটি ঝর্ণাধারা সৃষ্টি করেছেন’ (২৪)। ‘আর তুমি খর্জুর বৃক্ষের কান্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার দিকে সুপক্ক খেজুর পতিত হবে’ (২৫)। ‘তুমি আহার কর, পান কর এং স্বীয় চক্ষু শীতল কর। আর যদি কোন মানুষকে তুমি দেখ, তবে তাকে বলে দিয়ো যে, আমি দয়াময় আল্লাহর জন্য ছিয়াম পালনের মানত করেছি। সুতরাং আমি আজ কারু সাথে কোন মতেই কথা বলব না’ (মারিয়াম ১৯/২২-২৬)।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম-পূর্ব কালের বিভিন্ন ও কথা বলার অবকাশ ছিল (মারিয়াম ১৯/১০-১১)। একইভাবে মারিয়ামকেও নির্দেশ দেওয়া হ’ল (মারিয়াম ১৯/২৬)।

আলোচনা

(১) যেহেতু ঈসা (আঃ)-এর জন্মগ্রহণের ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে অলৌকিক, তাই তার গর্ভধারণের মেয়াদ স্বাভাবিক নিয়মের বহির্ভূত ছিল বলেই ধরে নিতে হবে। নয় মাস দশদিন পরে সন্তান প্রসব শেষে চল্লিশ দিন ‘নেফাস’ অর্থাৎ রজঃস্রাব হ’তে পবিত্রতার মেয়াদও এখানে ধর্তব্য না হওয়াই সমীচীন। অতএব ঈসাকে গর্ভধারণের ব্যাপারটাও যেমন নিয়ম বহির্ভূত, তার ভূমিষ্ঠ হওয়া ও তার মায়ের পবিত্রতা লাভের পুরা ঘটনাটাই নিয়ম বহির্ভূত এবং অলৌকিক। আর এটা আল্লাহর জন্য একেবারেই সাধারণ বিষয়। স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে সন্তান জন্ম হবে, মাকে দশ মাস গর্ভধারণ করতে হবে ইত্যাদি নিয়ম আল্লাহরই সৃষ্টি এবং এই নিয়ম ভেঙ্গে সন্তান দান করাও তাঁরই এখতিয়ার। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন,

إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ- الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ- (آل عمران ৫৯-৬০)-

‘নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকটে ঈসার দৃষ্টান্ত হ’ল আদমের মত। তাকে তিনি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেন এবং বলেন, হয়ে যাও ব্যস হয়ে গেল’। ‘যা তোমার প্রভু আল্লাহ বলেন, সেটাই সত্য। অতএব তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না’ (আলে ইমরান ৩/৫৯-৬০)। অর্থাৎ আদমকে যেমন পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করা হয়েছে, ঈসাকে তেমনি পিতা ছাড়াই শুধু মায়ের মাধ্যমেই সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এটাই যে সত্য এবং এর বাইরে যাবতীয় জল্পনা-কল্পনা যে মিথ্যা, সে কথাও উপরোক্ত আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্য এই যে, যে বনু ইস্রাঈলের নবী ও রাসূল হয়ে ঈসা (আঃ)-এর আগমন ঘটলো, সেই ইহুদী-নাছারারাই আল্লাহর উক্ত ঘোষণাকে মিথ্যা বলে গণ্য করেছে। অথচ এই হতভাগারা মারিয়ামের পূর্বদিকে যাওয়ার অনুসরণে পূর্বদিককে তাদের ক্বিবলা বানিয়েছে।[3]

(২) এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মারিয়ামকে খেজুর গাছের কান্ড ধরে নাড়া দিতে বলা হয়েছে, যাতে সুপক্ক খেজুর নীচে পতিত হয়। এটাতে বুঝা যায় যে, ওটা ছিল তখন খেজুর পাকার মৌসুম অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল। আর খৃষ্টানরা কথিত যীশু খৃষ্টের জন্মদিন তথা তাদের ভাষায় X-mas Day বা বড় দিন উৎসব পালন করে থাকে শীতকালে ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে। অথচ এর কোন ভিত্তি তাদের কাছে নেই। যেমন কোন ভিত্তি নেই মুসলমানদের কাছে ১২ই রবীউল আউয়াল একই তারিখে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালনের। অথচ জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব অনুযায়ী রাসূলের জন্মদিবস ছিল ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার ও মৃত্যুর তারিখ ছিল ১২ই রবীউল আউয়াল সোমবার।

ইসলামে কারু জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালনের বিধান নেই। ক্রুসেড যুদ্ধের সময় খৃষ্টান বাহিনীর বড় দিন পালনের দেখাদেখি ৬০৫ অথবা ৬২৫ হিজরীতে ইরাকের এরবল প্রদেশের গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩২ হি:)-এর মাধ্যমে কথিত ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রথা প্রথম চালু হয়। এই বিদ‘আতী প্রথা কোন কোন মুসলিম দেশে বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে শিকড় গেড়ে বসেছে।

(৩) এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, খেজুর গাছের গোড়া ধরে নাড়া দেওয়া কখনোই সম্ভব নয়। বিশেষ করে একজন সদ্য প্রসূত সন্তানের মায়ের পক্ষে। এর মধ্যে এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নেকীর কাজে আল্লাহর উপরে ভরসা করে বান্দাকে অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে। যত সামান্যই হৌক কাজ করতে হবে। আল্লাহ তাতেই বরকত দিবেন। যেমন তালূত ও দাঊদকে আল্লাহ দিয়েছিলেন এবং যেমন শেষনবী (ছাঃ)-কে আল্লাহ সাহায্য করেছিলেন বিশেষভাবে হিজরতের রাত্রিতে মক্কা ত্যাগের সময়, হিজরতকালীন সফরে এবং বদর ও খন্দক যুদ্ধের কঠিন সময়ে। অতএব আমরা ধরে নিতে পারি যে, মারিয়ামের গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব

ও প্রসব পরবর্তী পবিত্রতা অর্জন সবই ছিল অলৌকিক এবং সবই অত্যন্ত দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

এর পরের ঘটনা আমরা সরাসরি কুরআন থেকে বিবৃত করব। আল্লাহ বলেন,

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوْا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا- يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوْكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا- (مريم ٢٧-٢٨)-

'অতঃপর মারিয়াম তার সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হ'ল। তারা বলল, হে মারিয়াম! তুমি একটা আশ্চর্য বস্ত নিয়ে এসেছ'। 'হে হারূণের বোন![4] তোমার পিতা কোন অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না কিংবা তোমার মাতাও কোন ব্যভিচারিণী মহিলা ছিলেন না' (মারিয়াম ১৯/২৭-২৮)। কওমের লোকদের এ ধরনের কথা ও সন্দেহের জওয়াবে নিজে কিছু না বলে বিবি মারিয়াম তার সদ্য প্রসূত সন্তানের দিকে ইশারা করলেন। অর্থাৎ একথার জবাব সেই-ই দিবে। কেননা সে আল্লাহর দেওয়া এক অলৌকিক সন্তান, যা কওমের লোকেরা জানে না। আল্লাহ বলেন,

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا- قَالَ إِنِّيْ عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا- وَجَعَلَنِيْ مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِيْ بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا- وَبَرًّا بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا- وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوْتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا- (مريم ٢٩-٣٣)-

'অতঃপর মারিয়াম ঈসার দিকে ইঙ্গিত করল। তখন লোকেরা বলল, কোলের শিশুর সাথে আমরা কিভাবে কথা বলব'? (মারিয়াম ২৯)। ঈসা তখন বলে উঠল, 'আমি আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব (ইনজীল) প্রদান করেছেন এবং আমাকে নবী করেছেন' (৩০)। 'আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন ছালাত ও যাকাত আদায় করতে' (৩১)। 'এবং আমার মায়ের অনুগত থাকতে। আল্লাহ আমাকে উদ্ধত ও হতভাগা করেননি' (৩২)। 'আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন জীবিত পুনরুত্থিত হব' (মারিয়াম ১৯/২৯-৩৩)।

ঈসার উপরোক্ত বক্তব্য শেষ করার পর সংশয়বাদী ও বিতর্ককারী লোকদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন,

ذَلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ- مَا كَانَ ِللهِ أَن يَّتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ- وَإِنَّ اللهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ- (مريم ৩৪-৩৬)-

'ইনিই হ'লেন মারিয়াম পুত্র ঈসা। আর ওটাই হ'ল সত্যকথা (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে), যে বিষয়ে লোকেরা (অহেতুক) বিতর্ক করে থাকে' (মারিয়াম ৩৪)। 'আল্লাহ এমন নন যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন (যেমন অতিভক্ত খৃষ্টানরা বলে থাকে যে, ঈসা 'আল্লাহর পুত্র')। তিনি মহাপবিত্র। যখন তিনি কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন বলেন, হও! ব্যস, হয়ে যায়' (৩৫)। 'ঈসা আরও বলল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর। (মনে রেখ) এটাই হ'ল সরল পথ' (মারিয়াম ১৯/৩৪-৩৬)।

কিন্তু সদ্যপ্রসূত শিশু ঈসার মুখ দিয়ে অনুরূপ সারগর্ভ কথা শুনেও কি কওমের লোকেরা আশ্বস্ত হ'তে পেরেছিল? কিছু লোক আশ্বস্ত হ'লেও অনেকে পারেনি। তারা নানা বাজে কথা রটাতে থাকে। তাদের ঐসব বাক-বিতন্ডার প্রতি ইঙ্গিত করেই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেন,

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ- أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوْنَنَا لَكِنِ الظَّالِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ- (مريم ৩৭-৩৮)-

'অতঃপর তাদের মধ্যকার বিভিন্ন দল বিভিন্ন (মত ও পথে) বিভক্ত হয়ে গেল (দুনিয়াতে যার শেষ হবে না)। অতএব ক্বিয়ামতের মহাদিবস আগমন কালে অবিশ্বাসী কাফিরদের জন্য ধ্বংস'। 'সেদিন তারা চমৎকারভাবে শুনবে ও দেখবে, যেদিন তারা সবাই আমাদের কাছে আগমন করবে। কিন্তু আজ যালেমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে রয়েছে' (মারিয়াম ১৯/৩৭-৩৮)।

[3]. ঈসার জন্মের স্থানটিকে এখন Bethlehem (بيت لحم) বলা হয়। যা উত্তর কুদস থেকে ৮ কি:মি: দক্ষিণে অবস্থিত এবং ফিলিস্তীনের পশ্চিম তীরে ইস্রাঈলের দখলীভুক্ত।- লেখক

[4]. মারিয়ামের এক ইবাদতগুযার ভাইয়ের নাম ছিল হারূণ। অথবা হারূণ (আঃ)-এর বংশধর হওয়ার কারণেও এটা বলা হ'তে পারে (কুরতুবী)।

মারিয়ামের সতীত্ব সম্পর্কে আল্লাহর সাক্ষ্য

আল্লাহ পাক নিজেই মারিয়ামের সতীত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন,

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ- (التحريم ১২)-

'তিনি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন ইমরান তনয়া মারিয়ামের, যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ হ'তে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাণী ও কিতাব সমূহকে সত্যে পরিণত করেছিল এবং সে ছিল বিনয়ীদের অন্যতম' (তাহরীম ৬৬/১২)।

মারিয়ামের বৈশিষ্ট্য সমূহ

(১) তিনি ছিলেন বিশ্ব নারী সমাজের শীর্ষস্থানীয়া এবং আল্লাহর মনোনীত ও পবিত্র ব্যক্তিত্ব (আলে ইমরান ৩/৪২)।

(২) তিনি ছিলেন সর্বদা আল্লাহর উপাসনায় রত, বিনয়ী, রুকু কারিনী ও সিজদাকারিনী (ঐ, ৩/৪৩)।

(৩) তিনি ছিলেন সতীসাধ্বী এবং আল্লাহর আদেশ ও বাণী সমূহের বাস্তবায়নকারিনী (তাহরীম ৬৬/১২)।

(৪) আল্লাহ নিজেই তার নাম রাখেন 'মারিয়াম' (আলে ইমরান ৩/৩৬)। অতএব তিনি ছিলেন অতীব সৌভাগ্যবতী।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

(১) মারিয়াম ছিলেন তার মায়ের মানতের সন্তান এবং তার নাম আল্লাহ নিজে রেখেছিলেন।

(২) মারিয়ামের মা দো'আ করেছিলেন এই মর্মে যে, আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে আল্লাহর আশ্রয়ে সমর্পণ করছি অভিশপ্ত শয়তানের কবল হ'তে এবং আল্লাহ সে দো'আ কবুল করেছিলেন উত্তমরূপে। অতএব মারিয়াম ও তার পুত্র ঈসার পবিত্রতা সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই।

(৩) মারিয়াম আল্লাহর ঘর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতে রত ছিলেন এবং তাকে আল্লাহর পক্ষ হ'তে বিশেষ ফল-ফলাদির মাধ্যমে খাদ্য পরিবেশন করা হ'ত (আলে ইমরান ৩/৩৭)। এতে বুঝা যায় যে, পবিত্রাত্মা মহিলাগণ মসজিদের খিদমত করতে পারেন এবং আল্লাহ তাঁর নেককার বান্দাদের জন্য যেকোন স্থানে খাদ্য পরিবেশন করে থাকেন।

(৪) মারিয়ামের গর্ভধারণ ও ঈসার জন্মগ্রহণ ছিল সম্পূর্ণরূপে অলৌকিক ঘটনা। আল্লাহ পাক নিয়মের স্রষ্টা এবং তিনিই নিয়মের ভঙ্গকারী। তাকে কোন বিষয়ে বাধ্য করার মত কেউ নেই। তিনি পিতা-মাতা ছাড়াই আদমকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর পিতা ছাড়াই শুধু মাতার মাধ্যমে ঈসাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি যা খুশী তাই করতে পারেন।

(৫) ঈসার জন্ম গ্রীষ্মকালে হয়েছিল খেজুর পাকার মওসুমে। খৃষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা মতে ২৫শে ডিসেম্বরের প্রচন্ড শীতের সময়ে নয়।

(৬) ফেরেশতা মানবাকৃতি ধারণ করে অথবা অদৃশ্য থেকে নেককার বান্দাকে আল্লাহর হুকুমে সাহায্য করে থাকেন। যেমন জিব্রীল মানবাকৃতি ধারণ করে মারিয়ামের জামায় ফুঁক দিলেন। অতঃপর অদৃশ্য থেকে আওয়ায দিয়ে তার খাদ্য ও পানীয়ের পথ নির্দেশ দান করলেন।

(৭) বান্দাকে কেবল প্রার্থনা করলেই চলবে না, তাকে কাজে নামতে হবে। তবেই তাতে আল্লাহর সাহায্য নেমে আসবে। যেমন খেজুর বৃক্ষের কান্ড ধরে নাড়া দেওয়ার সামান্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর হুকুমে সুপক্ক খেজুর সমূহ পতিত হয়।

(৮) বিশেষ সময়ে আল্লাহর হুকুমে শিশু সন্তানের মুখ দিয়ে সারগর্ভ বক্তব্য সমূহ বের হ'তে পারে। যেমন ঈসার মুখ দিয়ে বের হয়েছিল তার মায়ের পবিত্রতা প্রমাণের জন্য। বুখারী শরীফে বর্ণিত বনু ইস্রাঈলের জুরায়েজ-এর ঘটনায়ও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[5]

(৯) ঈসা কোন উপাস্য ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন অন্যদের মত আল্লাহর একজন দাস মাত্র এবং তিনি ছিলেন আল্লাহর একজন সম্মানিত নবী ও কিতাবধারী রাসূল।

(১০) ঈসা যে বিনা বাপে পয়দা হয়েছিলেন, তার অন্যতম প্রমাণ এই যে, কুরআনের সর্বত্র তাঁকে 'মারিয়াম-পুত্র' (عيسى ابن مريم) বলা হয়েছে (বাক্বারাহ ২/৮৭, ২৫৩; আলে ইমরান ৩/৪৫ প্রভৃতি)। পিতা-মাতা উভয়ে থাকলে হয়তবা তাঁকে কেবল ঈসা বলেই সম্বোধন করা হ'ত, যেমন অন্যান্য নবীগণের বেলায় করা হয়েছে। অথচ মারিয়ামকে তার পিতার দিকে সম্বন্ধ করে 'মারিয়াম বিনতে ইমরান' (ابنت عمران) 'ইমরান-কন্যা' বলা হয়েছে (তাহরীম ৬৬/১২)।

(১১) একমাত্র মারিয়ামের নাম ধরেই আল্লাহ তাঁর সতীত্বের সাক্ষ্য ঘোষণা করেছেন (তাহরীম ৬৬/১২)। যা পৃথিবীর অন্য কোন মহিলা সম্পর্কে করা হয়নি। অতএব যাবতীয় বিতর্কের

অবসানের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। তাছাড়া আল্লাহ তাঁকে ‘ছিদ্দীক্বাহ’ অর্থাৎ কথায় ও কর্মে ‘সত্যবাদীনী’ আখ্যা দিয়েছেন (মায়েদাহ ৫/৭৫)। যেটা অন্য কোন মহিলা সম্পর্কে দেওয়া হয়নি।

[5]. বুখারী, হা/২৪৮২ ‘মাযালিম’ অধ্যায় ৩৫ অনুচ্ছেদ।

ঈসা (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ

(১) তিনি ছিলেন বিনা বাপে পয়দা বিশ্বের একমাত্র নবী (আলে ইমরান ৩/৪৬ প্রভৃতি)। (২) আল্লাহ স্বয়ং যার নাম রাখেন মসীহ ঈসা রূপে (আলে ইমরান ৩/৪৫)। (৩) তিনি শয়তানের অনিষ্টকারিতা হ’তে মুক্ত ছিলেন (ঐ, ৩/৩৬-৩৭)। (৪) দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি ছিলেন মহা সম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহর একান্ত প্রিয়জনদের অন্যতম (আলে ইমরান ৩/৪৫)। (৫) তিনি মাতৃক্রোড়ে থেকেই সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন (মারিয়াম ১৯/২৭-৩৩; আলে ইমরান ৩/৪৬)। (৬) তিনি বনু ইস্রাঈলগণের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন (আলে ইমরান ৩/৪৯) এবং শেষনবী ‘আহমাদ’-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেন (ছফ ৬১/৬)। (৭) তাঁর মো‘জেযা সমূহের মধ্যে ছিল- (ক) তিনি মাটির তৈরী পাখিতে ফুঁক দিলেই তা জীবন্ত হয়ে উড়ে যেত (খ) তিনি জন্মান্ধকে চক্ষুষ্মান ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করতে পারতেন (গ) তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারতেন (ঘ) তিনি বলে দিতে পারতেন মানুষ বাড়ী থেকে যা খেয়ে আসে এবং যা সে ঘরে সঞ্চিত রেখে আসে (আলে ইমরান ৩/৪৯; মায়েদাহ ৫/১১০)।

(৮) তিনি আল্লাহর কিতাব ইনজীল প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। তবে তওরাতে হারামকৃত অনেক বিষয়কে তিনি হালাল করেন (আলে ইমরান ৩/৫০)। (৯) তিনি ইহুদী চক্রান্তের শিকার হয়ে সরকারী নির্যাতনের সম্মুখীন হন। ফলে আল্লাহ তাঁকে সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেন (আলে ইমরান ৩/৫২, ৫৪-৫৫; নিসা ৪/১৫৮)। শত্রুরা তাঁরই মত আরেকজনকে সন্দেহ বশে শূলে চড়িয়ে হত্যা করে এবং তারা নিশ্চিতভাবেই ঈসাকে হত্যা করেনি’ (নিসা ৪/১৫৭)। (১০) তিনিই একমাত্র নবী, যাকে আল্লাহ জীবিত অবস্থায় দুনিয়া থেকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে তিনি পুনরায় সশরীরে দুনিয়াতে অবতরণ করবেন এবং দাজ্জাল, ক্রুশ, শূকর প্রভৃতি ধ্বংস করবেন। অতঃপর ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে সারা পৃথিবীতে ইসলামী শরী‘আত অনুযায়ী শান্তির রাজ্য কায়েম করবেন।[6]

[6]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫০৫-৭ ‘ফিতান’ অধ্যায় ‘ঈসার অবতরণ’ অনুচ্ছেদ-৫; তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪৫২-৫, ঐ, ‘ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ’ অনুচ্ছেদ-২।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাহিনী

সাধারণতঃ সকল নবীই ৪০ বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেছেন। তবে ঈসা (আঃ) সম্ভবতঃ তার কিছু পূর্বেই নবুঅত ও কিতাব প্রাপ্ত হন। কেননা বিভিন্ন রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আকাশে তুলে নেবার সময় তাঁর বয়স ৩০ থেকে ৩৫-এর মধ্যে ছিল। তিনি যৌবনে আকাশে উত্তোলিত হয়েছিলেন এবং পৌঢ় বয়সে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এসে মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দিবেন।

ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াত

ঈসা (আঃ) নবুঅত লাভ করার পর স্বীয় কওমকে প্রধানতঃ নিম্নোক্ত ৭টি বিষয়ে দাওয়াত দিয়ে বলেন, يَابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ- ‘হে বনু ইস্রাঈলগণ! আমি তোমাদের নিকটে আগমন করেছি (১) আল্লাহর রাসূল হিসাবে (২) আমার পূর্ববর্তী তওরাত কিতাবের সত্যায়নকারী হিসাবে এবং (৩) আমার পরে আগমনকারী রাসূলের সুসংবাদ দানকারী হিসাবে, যার নাম হবে আহমাদ’... (ছফ ৬১/৬)। তিনি বললেন, وَإِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ‘(৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটাই সরল পথ’ (মারিয়াম ১৯/৩৬)।

তিনি বললেন, وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُواْ اللهَ وَأَطِيعُونِ- (آل عمران ৫০)- ‘আমার আনীত এ কিতাব (ইনজীল) পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতকে সত্যায়ন করে এবং এজন্য যে, (৫) আমি তোমাদের জন্য হালাল করে দেব কোন কোন বস্তু, যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। আর (৬) আমি তোমাদের নিকটে এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শন সহ। অতএব (৭) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর’ (আলে ইমরান ৩/৫০)।

এটার ব্যাখ্যা এসেছে অন্য আয়াতে যে,

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَثِيْرًا- وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيْماً-)النساء ১৬০-১৬১)-

‘বস্তুতঃ ইহুদীদের পাপের কারণে আমরা তাদের উপরে হারাম করেছিলাম বহু পবিত্র বস্তু, যা তাদের জন্য হালাল ছিল। এটা ছিল (১) আল্লাহর পথে তাদের অধিক বাধা দানের কারণে’। ‘এবং এ কারণে যে, (২) তারা সূদ গ্রহণ করত। অথচ এ ব্যাপারে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, (৩) তারা অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করত। বস্তুতঃ আমরা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি বেদনাদায়ক শাস্তি’ (নিসা ৪/১৬০-১৬১)। তিনি আরও বলেন,

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُوْنَ- (الأنعام ১৪৬)-

‘এবং ইহুদীদের জন্য আমরা (১) প্রত্যেক নখবিশিষ্ট পশু হারাম করেছিলাম এবং (২) ছাগল ও গরু থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমরা তাদের জন্য হারাম করেছিলাম। কিন্তু ঐ চর্বি ব্যতীত যা পৃষ্ঠে কিংবা অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে। তাদের অবাধ্যতার কারণে আমরা তাদের এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমরা অবশ্যই সত্যবাদী’ (আন‘আম ৬/১৪৬)।

ঈসা (আঃ)-এর পেশকৃত পাঁচটি নিদর্শন

তাওহীদ ও রিসালাতের উপরে ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়ার পরে তিনি বনু ইস্রাঈলকে তাঁর আনীত নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

وَرَسُوْلاً إِلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّيْ أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْراً بِإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِئُ الأَكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِـي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ- (آل عمران ৪৯)-

‘নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকটে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। (যেমন-) (১) আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরী করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুঁক দেই, তখন তা উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে। (২) আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং (৩) ধবল-কুষ্ঠ রোগীকে। (৪) আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে। (৫) আমি তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও’ (আলে ইমরান ৩/৪৯)।

উল্লেখ্য যে, যখন যে দেশে যে বিষয়ের আধিক্য ও উৎকর্ষ থাকে, তখন সেই দেশে সেই বিষয়ে সর্বোচ্চ ব্যুৎপত্তি সহ নবী প্রেরণ করা হয়। যেমন মূসার সময় মিসরে ছিল জাদুবিদ্যার প্রাদুর্ভাব। ফলে আল্লাহ তাঁকে লাঠির মো‘জেযা দিয়ে পাঠালেন। অনুরূপভাবে ঈসার সময়ে শাম বা সিরিয়া এলাকা ছিল চিকিৎসা বিদ্যায় সেরা। সেকারণ ঈসাকে আল্লাহ উপরে বর্ণিত অলৌকিক ক্ষমতা ও মো‘জেযা সমূহ দিয়ে পাঠান। যেমন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সময়ে আরবরা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বোচ্চ অলংকারে ভূষিত ছিল। ফলে কুরআন তাদের সামনে হতবুদ্ধিকারী মো‘জেযা রূপে নাযিল হয়। যাতে আরবের স্বনামখ্যাত কবিরা মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়।

দাওয়াতের ফলশ্রুতি

ঈসা (আঃ)-এর মো‘জেযা সমূহ দেখে এবং তাঁর মুখনিঃসৃত তাওহীদের বাণী শুনে গরীব শ্রেণীর কিছু লোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ’লেও দুনিয়াদার সমাজ নেতারা তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। কারণ তাওহীদের সাম্য বাণী সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী নেতাদের স্বার্থেই প্রথম আঘাত হেনে থাকে। শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়। ফলে তারা ঈসা (আঃ)-এর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়।

বিগত নবীগণের ন্যায় বনু ইস্রাঈলগণ তাদের বংশের শেষ নবী ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে নানাবিধ চক্রান্ত শুরু করে। তারা প্রথমেই ঈসা (আঃ)-কে ‘জাদুকর’ বলে আখ্যায়িত করে। যেমন আল্লাহ বলেন, (হে ঈসা!) إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ إِنْ هَـذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيْنٌ- (المائدة ১১০)- ‘যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের তারা বলল, এটা প্রকাশ্য জাদু ব্যতীত কিছুই নয়’ (মায়েদাহ ৫/১১০)।

উক্ত অপবাদে ঈসা (আঃ) ক্ষান্ত না হয়ে বরং আরও দ্বিগুণ বেগে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে যেতে থাকেন। তখন বিরোধীরা বেছে নেয় অতীব নোংরা পথ। তারা তাঁর মায়ের নামে অপবাদ রটাতে শুরু করে। যাতে ঈসা (আঃ) অত্যন্ত ব্যথা পেলেও নবুঅতের গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সবকিছু নীরবে সহ্য করতে থাকেন। ফলে ঈসা (আঃ)-এর সমর্থক সংখ্যা যতই বাড়তে থাকে, অবিশ্বাসী সমাজ নেতাদের চক্রান্ত ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবার তারা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল এবং সেজন্য দেশের বাদশাহকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করল। তারা অনবরত বাদশাহর কান ভারি করতে থাকে এই মর্মে যে, লোকটি আল্লাহ দ্রোহী। সে তাওরাত পরিবর্তন করে সবাইকে বিধর্মী করতে সচেষ্ট। এসব অভিযোগ শুনে অবশেষে বাদশাহ তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন। তখন ইহুদীদের এসব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য আল্লাহ স্বীয় কৌশল প্রেরণ করেন এবং ঈসা (আঃ)-কে সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেন।

ইহুদীদের উপর প্রেরিত গযব ও তার কারণ সমূহ

ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার কারণে আল্লাহ ইহুদী কাফিরদের উপরে নানাবিধ দুনিয়াবী গযব নাযিল করেন। তাদেরকে কেন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল- সে বিষয়ে অনেকগুলি কারণের মধ্যে আল্লাহ বলেন,

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بَآيَاتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوْنَ إِلاَّ قَلِيْلاً- وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظِيْماً- وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلَـكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْناً- بَل رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزاً حَكِيْماً- (النساء ১৫৫-১৫৮)-

‘তারা যে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা ছিল (১) তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে, (২) অন্যায়ভাবে রাসূলগণকে হত্যা করার কারণে এবং (৩) তাদের এই উক্তির কারণে যে, ‘আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন’... (নিসা ১৫৫)। ‘আর (৪) তাদের কুফরীর কারণে এবং (৫) মারিয়ামের প্রতি মহা অপবাদ আরোপের কারণে’ (১৫৬)। ‘আর তাদের (৬) একথার কারণে যে, ‘আমরা মারিয়াম-পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি, যিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছিল, না শূলে চড়িয়েছিল। বরং তাদের জন্য ধাঁধার সৃষ্টি করা হয়েছিল। বস্ত্ততঃ তারা এ ব্যাপারে নানাবিধ কথা বলে। তারা এ বিষয়ে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে। শুধুমাত্র ধারণার অনুসরণ করা ব্যতীত এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। আর নিশ্চিতভাবেই তারা তাকে হত্যা করেনি’ (১৫৭)। ‘বরং তাকে আল্লাহ নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। আর আল্লাহ হ’লেন মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়’ (নিসা ৪/১৫৫-১৫৮)।

ঈসা (আঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ও তাঁর ঊর্ধ্বারোহন

তৎকালীন রোম সম্রাট ছাতিয়ূনুস-এর নির্দেশে (মাযহারী) ঈসা (আঃ)-কে গ্রেফতারের জন্য সরকারী বাহিনী ও ইহুদী চক্রান্তকারীরা তাঁর বাড়ী ঘেরাও করে। তারা জনৈক নরাধমকে ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করার জন্য পাঠায়। কিন্তু ইতিপূর্বে আল্লাহ ঈসা (আঃ)-কে উঠিয়ে নেওয়ায় সে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যায়। কিন্তু এরি মধ্যে আল্লাহর হুকুমে তার চেহারা ঈসা (আঃ)-এর সদৃশ হয়ে যায়। ফলে ইহুদীরা তাকেই ঈসা ভেবে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করে।

ইহুদী-নাছারারা কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়েই নানা কথা বলে এবং ঈসাকে হত্যা করার মিথ্যা দাবী করে। আল্লাহ বলেন, ‘এ বিষয়ে তাদের কোনই জ্ঞান নেই। তারা কেবলই সন্দেহের

মধ্যে পড়ে আছে। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি'(নিসা ৪/১৫৭)। বরং তার মত কাউকে তারা হত্যা করেছিল ।

উল্লেখ্য যে, ঈসা (আঃ) তাঁর উপরে বিশ্বাসী সে যুগের ও পরবর্তী যুগের সকল খৃষ্টানের পাপের বোঝা নিজে কাঁধে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শূলে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে খৃষ্টানদের দাবী স্রেফ প্রতারণা ও অপপ্রচার বৈ কিছুই নয়।

আল্লাহর পাঁচটি অঙ্গীকার

ইহুদীদের বিপক্ষে হযরত ঈসা (আঃ)-কে সাহায্যের ব্যাপারে আল্লাহ পাঁচটি ওয়াদা করেছিলেন এবং সবক'টিই তিনি পূর্ণ করেন। (১) হত্যার মাধ্যমে নয় বরং তার স্বাভাবিক মৃত্যু হবে (২) তাঁকে ঊর্ধ্বজগতে তুলে নেওয়া হবে (৩) তাকে শত্রুদের অপবাদ থেকে মুক্ত করা হবে (৪) অবিশ্বাসীদের বিপক্ষে ঈসার অনুসারীদেরকে ক্বিয়ামত অবধি বিজয়ী রাখা হবে এবং (৫) ক্বিয়ামতের দিন সবকিছুর চূড়ান্ত ফায়ছালা করা হবে। এ বিষয়গুলি বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيْسَى إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ-)آل عمران ৫৫)-

'আর স্মরণ কর যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে ওফাত দিব এবং তোমাকে আমার কাছে তুলে নেব এবং তোমাকে কাফিরদের হাত থেকে মুক্ত করব। আর যারা তোমার অনুসরণ করবে, তাদেরকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করে রাখবো। অতঃপর তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদের মধ্যকার বিবাদীয় বিষয়ে ফায়ছালা করে দেব' (আলে ইমরান ৩/৫৫)।

উক্ত আয়াতে বর্ণিত مُتَوَفِّيْكَ অর্থ 'আমি তোমাকে ওফাত দিব'। 'ওফাত' অর্থ পুরোপুরি নেওয়া। মৃত্যুকালে মানুষের আয়ু পূর্ণ হয় বলে একে 'ওফাত' বলা হয়। রূপক অর্থে নিদ্রা যাওয়াকেও ওফাত বা মৃত্যু বলা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا- 'আল্লাহ মানুষের প্রাণ নিয়ে নেন তার মৃত্যুকালে, আর যে মরেনা তার নিদ্রাকালে' (যুমার ৩৯/৪২)। সেকারণ যাহহাক, ফাররা প্রমুখ বিদ্বানগণ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ -এর অর্থ বলেন, আমি আপনাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেব এবং শেষ যামানায় (পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়ে) স্বাভাবিক মৃত্যু দান করব। এখানে বর্ণনার আগপিছ হয়েছে মাত্র' (কুরতুবী, ইবনু কাছীর)। যা

কুরআনের বহু স্থানে হয়েছে। ঈসার অবতরণ, দাজ্জাল নিধন, পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে ছহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীছ সমূহ বর্ণিত হয়েছে। প্রায় সকল বড় বড় নবীই হিজরত করেছেন। এক্ষণে পৃথিবী থেকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া, অতঃপর পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিয়ে স্বাভাবিক মৃত্যু দান করা- এটা ঈসা (আঃ)-এর জন্য এক ধরনের হিজরত বৈ কি! পার্থক্য এই যে, অন্যান্য নবীগণ দুনিয়াতেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে হিজরত করেছেন। পক্ষান্তরে ঈসা (আঃ) দুনিয়া থেকে আসমানে হিজরত করেছেন। অতঃপর আসমান থেকে দুনিয়াতে ফিরে আসবেন। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত এবং তিনিই সকল ক্ষমতার অধিকারী।

অতঃপর ঈসার অনুসারীদের ক্বিয়ামত অবধি বিজয়ী করে রাখার অর্থ ঈমানী বিজয় এবং সেটি ঈসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসারীদের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। ঈমানী বিজয়ের সাথে সাথে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিজয় যেমন খেলাফত যুগে হয়েছে, ভবিষ্যতে আবারও সেটা হবে। এমনকি কোন বস্তিঘরেও ইসলামের বিজয় নিশান উড়তে বাকী থাকবে না। সবশেষে ক্বিয়ামত প্রাক্কালে ঈসা ও মাহদীর নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক বিজয় সংঘটিত হবে এবং সারা পৃথিবী শান্তির রাজ্যে পরিণত হবে।[7]

[7]. আহমাদ, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৪২; তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৭৫, সনদ ছহীহ; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪৫৩-৫৪; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৭।

অতঃপর ঈসার অনুসারীদের ক্বিয়ামত অবধি বিজয়ী করে রাখার অর্থ ঈমানী বিজয় এবং সেটি ঈসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসারীদের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। ঈমানী বিজয়ের সাথে সাথে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিজয় যেমন খেলাফত যুগে হয়েছে, ভবিষ্যতে আবারও সেটা হবে। এমনকি কোন বস্তিঘরেও ইসলামের বিজয় নিশান উড়তে বাকী থাকবে না। সবশেষে ক্বিয়ামত প্রাক্কালে ঈসা ও মাহদীর নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক বিজয় সংঘটিত হবে এবং সারা পৃথিবী শান্তির রাজ্যে পরিণত হবে।[7]

[7]. আহমাদ, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৪২; তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৭৫, সনদ ছহীহ; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪৫৩-৫৪; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৭।

'হাওয়ারী' কারা?

حَوارِىٌّ শব্দটি حَوَرٌ ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন। অর্থ দেওয়ালে চুনকাম করার জন্য ধবধবে সাদা চুন। পারিভাষিক অর্থে ঈসা (আঃ)-এর খাঁটি অনুসারী শীর্ষস্থানীয় ভক্ত ও সাহায্যকারী ব্যক্তিগণকে 'হাওয়ারী' বলা হ'ত। কেউ বলেছেন যে, নাবাত্বী ভাষায় হাওয়ারী অর্থ ধোপা (القصار)। ঈসার

খাঁটি অনুসারীগণ ধোপা ছিলেন, যারা কাপড় ধৌত করতেন। পরে তারা ঐ নামেই পরিচিত হন। অথবা এজন্য তাদের উপাধি 'হাওয়ারী' ছিল যে, তারা সর্বদা সাদা পোষাক পরিধান করতেন। কোন কোন তাফসীরবিদ তাঁদের সংখ্যা ১২ জন বলেছেন। ঈসা (আঃ)-এর ভক্ত সহচরগণকে যেমন 'হাওয়ারী' বলা হয়; শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ভক্ত সহচরগণকে তেমনি 'ছাহাবী' বলা হয়। আভিধানিক অর্থে ছাহাবী অর্থ সাথী বা সহচর হ'লেও পারিভাষিক অর্থে রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত অন্যদের সাথীগণকে 'ছাহাবী' বলা হয় না। কেননা এই পরিভাষাটি কেবল ঐসকল পবিত্রাত্মা ব্যক্তিগণের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য 'হাওয়ারী' শব্দটি কোন কোন সময় শুধু 'সাহায্যকারী' বা আন্তরিক বন্ধু অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা বলেন, 'প্রত্যেক নবীর একজন 'হাওয়ারী' অর্থাৎ খাঁটি সহচর থাকে। তেমনি আমার 'হাওয়ারী' হ'ল যুবায়ের'।[৪]

ঈসা (আঃ) যখন বনু ইস্রাঈলের স্বার্থবাদী নেতাদের বিরোধিতা ও চক্রান্ত বুঝতে পারলেন, তখন নিজের একনিষ্ঠ সাথীদের বাছাই করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন এবং সবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে আমার সত্যিকারের ভক্ত ও অনুসারী কারা? একথাটিই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্তভাবে-

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ- رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ-)آل عمران ৫২-৫৩)-

'যখন ঈসা বনু ইস্রাঈলের কুফরী অনুধাবণ করলেন, তখন বললেন, কারা আছ আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্যকারী? তখন হাওয়ারীগণ বলল, আমরাই আল্লাহর পথে আপনার সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর উপরে ঈমান এনেছি। আপনি সাক্ষ্য থাকুন যে আমরা সবাই আত্মসমর্পণকারী'। 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা সেই সব বিষয়ের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যা তুমি নাযিল করেছ এবং আমরা রাসূলের অনুসারী হয়েছি। অতএব তুমি আমাদেরকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও' (আলে ইমরান ৩/৫২-৫৩)

অন্যত্র এসেছে এভাবে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوْا أَنصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللهِ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ- (الصف ১৪)-

‘হে বিশ্বাসী গণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও। যেমন মারিয়াম-তনয় ঈসা হাওয়ারীদের বলেছিল, কে আছ আল্লাহর জন্য আমাকে সাহায্যকারী? হাওয়ারীরা বলেছিল, আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী। অতঃপর বনু ইস্রাঈলের একটি দল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং অন্যদল প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর আমরা বিশ্বাসীদের সাহায্য করলাম তাদের শত্রুদের উপরে। ফলে তারা বিজয়ী হ’ল’ (ছফ ৬১/১৪)।

অবশ্য হাওয়ারীদের এই আনুগত্য প্রকাশের ক্ষমতা আল্লাহ দান করেছিলেন তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে। যেমন তিনি বলেন,

-وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّيْنَ أَنْ آمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ قَالُوْا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ- (المائدة ১১১)

‘আর যখন আমি হাওয়ারীদের মনে জাগ্রত করলাম যে, আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা সবাই আত্মসমর্পণকারী’ (মায়েদাহ ৫/১১১)। এখানে হাওয়ারীদের নিকট ‘অহি’ করা অর্থ তাদের হৃদয়ে বিষয়টি সঞ্চার করা বা জাগ্রত করা। এটা নবুঅতের ‘অহি’ নয়।

বস্ততঃ শত্রুদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে ঈসা (আঃ) তাঁর অনুসারীগণের প্রতি উপরোক্ত আহবান জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন। সাথে সাথে বার জন ভক্ত অনুসারী তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন এবং আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন। অতঃপর তারাই ঈসা (আঃ)-এর ঊর্ধ্বারোহণের পরে ঈসায়ী ধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। যদিও পরবর্তী কালে তাদের মধ্যে বহু ভেজাল ঢুকে পড়ে এবং তারা বহু দলে বিভক্ত হয়ে যায়। আজও বিশ্ব খৃষ্টান সমাজ রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যান্ট নামে প্রধান দু’দলে বিভক্ত। যাদের রয়েছে অসংখ্য উপদল। আর এরা সব দলই ভ্রান্ত।

ইমাম বাগাভী (রহঃ) সূরা ছফ ১৪ আয়াতের তাফসীরে আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ঈসা (আঃ)-এর ঊর্ধ্বারোহণের পর খৃষ্টান জাতি তিন দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল তাকে ‘আল্লাহ’ বলে। একদল তাঁকে ‘আল্লাহর পুত্র’ বলে এবং একদল তাকে ‘আল্লাহর দাস ও রাসূল’ বলে। প্রত্যেক দলের অনুসারী দল ছিল। তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ বাড়তে থাকে। অতঃপর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন ঘটে এবং তিনি মুমিনদের দলকে সমর্থন দেন। ফলে তারাই দলীলের ভিত্তিতে জয়লাভ করে। বলা বাহুল্য মুমিন ঈসায়ীগণ সবাই ইসলাম কবুল করে ধন্য হন। ‘বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ সাহায্য করলেন ও তারা বিজয়ী হ’ল’ বলতে

উম্মতে মুহাম্মাদীকে বুঝানো হয়েছে। যারা ঈসা ও মুহাম্মাদ উভয় নবীর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং অবিশ্বাসী কাফের মুশরিকদের উপর দুনিয়া ও আখেরাতে বিজয়ী হয়েছেন।

[৪]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬১০১ 'মানাক্বিব' অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ।

আসমান থেকে খাঞ্চা ভর্তি খাদ্য অবতরণ

মূসা (আঃ)-এর উম্মতগণের জন্য আল্লাহ আসমান থেকে মান্না ও সালওয়ার জান্নাতী খাবার নামিয়ে দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে একদা হাওয়ারীগণ ঈসা (আঃ)-এর নিকটে অনুরূপ দাবী করে বসলো। বিষয়টির কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ-

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوْا اللهَ إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِيْنَ- قَالُوْا نُرِيْدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِيْنَ- قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ- قَالَ اللهُ إِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّيْ أُعَذِّبُهُ عَذَاباً لاَّ أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِّنَ الْعَالَمِيْنَ- (المائدة ১১২-১১৫)-

'যখন হাওয়ারীরা বলল, হে মারিয়াম-পুত্র ঈসা! আপনার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করে দেবেন? তিনি বললেন, যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহকে ভয় কর' (মায়েদাহ ১১২)। 'তারা বলল, আমরা তা থেকে খেতে চাই, আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে এবং আমরা জেনে নেব যে, আপনি সত্য বলেছেন ও আমরা সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাব' (১১৩)। 'তখন মরিয়াম-তনয় ঈসা বলল, হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতি আসমান থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন। তা আমাদের জন্য তথা আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্য আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ হ'তে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদের রূযী দান করুন। আপনিই শ্রেষ্ঠ রূযীদাতা' (১১৪)। 'আল্লাহ বললেন, নিশ্চয়ই আমি সে খাঞ্চা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করব। অতঃপর যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতে অপর কাউকে দেব না' (মায়েদাহ ৫/১১২-১১৫)।

উল্লেখ্য যে, উক্ত খাদ্য সঞ্চিত রাখা নিষিদ্ধ ছিল। তিরমিযীর একটি হাদীছে আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত খাদ্যভর্তি খাঞ্চা আসমান হ'তে নাযিল হয়েছিল এবং হাওয়ারীগণ তৃপ্তিভরে খেয়েছিল। কিন্তু লোকদের মধ্যে কিছু লোক তা সঞ্চিত রেখেছিল। ফলে তারা বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।[9]

ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের কুফরী এবং ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর সঙ্গে ঈসা (আঃ)-এর কথোপকথন :

ঈসা (আঃ)-এর ঊর্ধ্বারোহনের ফলে ঈসায়ীদের মধ্যে যে আক্বীদাগত বিভ্রান্তি দেখা দেয় এবং তারা যে কুফরীতে লিপ্ত হয়, সে বিষয়ে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন ঈসাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ أَنْ أَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ- مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِيْ بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْداً مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ- إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ- (المائدة ১১৬-১১৮)-

‘যখন আল্লাহ বলবেন, হে মরিয়াম-তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদের বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন, আপনি মহাপবিত্র। আমার জন্য শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই তা জানেন। বস্ত্ততঃ আপনি আমার মনের কথা জানেন, কিন্তু আমি জানি না কি আপনার মনের মধ্যে আছে। নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয়ে অবগত’ (মায়েদাহ ১১৬)। ‘আমি তো তাদের কিছুই বলিনি, কেবল সেকথাই বলেছি যা আপনি বলতে বলেছেন যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর, যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। বস্ত্ততঃ আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সকল বিষয়ে পূর্ণ অবগত’ (১১৭)। ‘এক্ষণে যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস। আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত ও মহাবিজ্ঞ’ (মায়েদাহ ৫/১১৬-১১৮)।

উপরোক্ত ১১৭নং আয়াতে বর্ণিত فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ বাক্যটিতে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর দলীল তালাশ করার এবং তাঁর ঊর্ধ্বারোহনের বিষয়টিকে অস্বীকার করার প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করার কোন সুযোগ নেই। কেননা এ কথোপকথনটি ক্বিয়ামতের দিন হবে। যার আগে আসমান থেকে অবতরণের পর দুনিয়ায় তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়ে যাবে।[10]

[9]. আলবানী, যঈফ তিরমিযী হা/৩০৬১, 'তাফসীর' অধ্যায়; মিশকাত হা/৫১৫০ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'ন্যায় কাজের আদেশ' অনুচ্ছেদ-২২।
[10]. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫ 'ফিতান' অধ্যায় 'ক্বিয়ামত প্রাক্কালের নিদর্শন সমূহ ও দাজ্জালের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ-৩; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৫-০৭, 'ফিতান' অধ্যায় 'ঈসার অবতরণ' অনুচ্ছেদ-৫।

ঈসা (আঃ)-এর কাহিনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুঅতী জীবন থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ জানতে পারি। যেমন-

(১) পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র ইসহাক (আঃ)-এর বংশের হাযার হাযার নবী-রাসূলের মধ্যে সর্বশেষ নবী ও কিতাবধারী রাসূল ছিলেন হযরত ঈসা (আঃ)। তাঁর পূর্বেকার সকল নবী এবং তিনি নিজে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, যিনি ইবরাহীম (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশের একমাত্র নবী এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূল বনু ইস্রাঈল তথা স্ব স্ব গোত্রের প্রতি আগমন করলেও শেষনবী প্রেরিত হয়েছিলেন বিশ্ব মানবতার প্রতি বিশ্বনবী হিসাবে। অতএব ঈসা (আঃ)-এর প্রতিশ্রুত শেষনবী 'আহমাদ' বা মুহাম্মাদ-এর অনুসারী উম্মতে মুহাম্মাদীই হ'ল ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত অনুসারী ও প্রকৃত উত্তরসুরী। নামধারী খৃষ্টানরা নয়।

(২) মু'জেযা প্রদর্শনের মাধ্যমে বিরোধী পক্ষকে ভয় দেখানো যায় বা চুপ করানো যায়। কিন্তু হেদায়াতের জন্য আল্লাহর রহমত আবশ্যক। যেমন ঈসা (আঃ)-কে যে মু'জেযা দেওয়া হয়েছিল, সে ধরনের মু'জেযা অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। এমনকি তাঁর জন্মটাই ছিল এক জীবন্ত মু'জেযা। কিন্তু তা সত্ত্বেও শত্রুরা হেদায়াত লাভ করেনি।

(৩) সবকিছু মানবীয় জ্ঞান দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। বরং সর্বদা এলাহী সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বাসী ও আকাংখী থাকতে হয়। যেমন মারিয়াম ও তৎপুত্র ঈসার জীবনের প্রতিটি ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে।

(৪) যারা নিঃস্বার্থভাবে সমাজের কাজ করেন ও পরকালীন মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করেন, স্বার্থপর ও দুনিয়া পূজারী সমাজ নেতারা তাদের শত্রু হয় এবং পদে পদে বাধা দেয়। কিন্তু সাথে সাথে একদল নিঃস্বার্থ সহযোগীও তারা পেয়ে থাকেন। যেমন ঈসা (আঃ) পেয়েছিলেন।

(৫) দুনিয়াবী সংঘাতে দুনিয়াদারদের পার্থিব বিজয় হ’লেও চূড়ান্ত বিচারে তাদের পরাজয় হয় এবং তারা ইতিহাসে সর্বাধিক নিন্দিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে নবী ও সমাজ সংস্কারকগণ নির্যাতিত হ’লেও চূড়ান্ত বিচারে তারাই বিজয়ী হন এবং সারা বিশ্ব তাদেরই ভক্ত ও অনুসারী হয়। ঈসা (আঃ)-এর জীবন তারই অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ- اللَّهُمَّ اغْفِرْلِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الحِسَابُ-

সূত্র -বই:নবীদের কাহিনী।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আল্লাহর ঘরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ভয়াবহ শাস্তি

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ইরশাদ করেন,

الَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاصْحَابِ الْفِيْلِ ○ الَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيْلٍ ○ وَارْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ابَابِيْلَ ○ تَرْمِيْهِم بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ○ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاكُوْلٍ ○

আপনি কি দেখেননি, আপনার পালনকর্তা হস্তিবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দেননি? আর তিনি তাদের উপর পাঠালেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, যারা তাদের উপর কংকর জাতীয় পাথর নিক্ষেপ করছিল। ফলে আল্লাহ তাদের ভক্ষিত ভূষিসদৃশ করে দেন। (সূরা ফীল, আয়াত:১-৫)

এই সূরায় আসহাবে ফীল বা আবরাহার হস্তি বাহিনীর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তারা কাবা ঘর ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে হস্তি বাহিনী নিয়ে মক্কা মুকাররমায় অভিযান পরিচালনা করে ইয়ামান থেকে মিনা পর্যন্ত পৌঁছে ছিল। আল্লাহ তা‘আলা নগণ্য ও ক্ষুদ্র পাখিদের মাধ্যমে তাদের বাহিনী নিশ্চিহ্ন করে তাদের কুমতলব ধুলায় মিশিয়ে দেন।

খাতামুল আম্বিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের বছর মক্কা মুকাররমার অদূরে এই ঘটনা ঘটেছিল। বেশ কিছু রেওয়ায়েত দ্বারা এটা প্রমাণিত এবং এটাই প্রসিদ্ধ বর্ণনা। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

হাদীস বিশারদগণ এ ঘটনাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের একপ্রকার মুজিযারূপে আখ্যায়িত করেছেন। মুজিযা বলতে সাধারণত এমন কোন অলৌকিক ঘটনাকে বুঝানো হয় যেটা নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর নবীগণের দাবিকে সত্য প্রমাণিত করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা প্রকাশ করে থাকেন। তবে আম্বিয়া আলাইহিস সালামের নবুওয়্যাত দাবির পূর্বে বরং তাঁদের জন্মেরও পূর্বে আল্লাহ তা‘আলা মাঝে মধ্যে পৃথিবীর বুকে এমন কিছু ঘটনা ও নিদর্শন প্রকাশ করেন, যা অলৌকিকতায় মুজিযার অনুরূপই হয়ে থাকে। এধরনের নিদর্শনকে হাদীসবিদগণের পরিভাষায় ইরহাসাত (اِرْهَاصَاتٌ) বলা হয়। اِرْهَاصَاتٌ এর শব্দ رَهْصٌ (রহসুন) অর্থ ভিত্তি ও ভূমিকা। এসব নিদর্শন নবীর নবুওয়্যাত প্রকাশের ভিত্তি ও ভূমিকা হিসেবে সংঘটিত হয় বিধায় এগুলোকে ‘ইরহাসাত’ বলা হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যাত এমনকি জন্মেরও পূর্বে এ ধরনের কয়েকটি ইরহাসাত প্রকাশ পেয়েছে। উল্লিখিত সূরা ফীলে বর্ণিত হস্তি বাহিনীকে কুদরতী গজব দ্বারা প্রতিহত করার নিদর্শন এ সবের অন্যতম।

আসহাবে ফীল-এর ঘটনা

হাদীস ও ইতিহাসশাস্ত্রের ইমাম আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বর্ণনা করেন, ইয়ামানের উপর হিমইয়ারী শাসকদের কর্তৃত্ব ছিল, যারা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করতো। তাদের প্রধান বাদশা যু-নাওয়াস তৎকালীন আহলে হক তথা ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের দীনের অনুসারী তাওহীদপন্থীদের উপর খুব জুলুম করেছিল। সে বিশাল আকারে এক গর্ত খনন করে তাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করে এবং যে সমস্ত দীনদার তাওহীদপন্থী মূর্তিপূজা ছেড়ে এক আল্লাহর ইবাদত করতেন, তাদের সকলকে উক্ত প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেয়। যাদের সংখ্যা বিশ হাজারের কাছাকাছি ছিল। এটা ঐ অগ্নিকুন্ডের ঘটনা, যা ‘আসহাবে উখদুদ’-এর আলোচনায় সূরা বুরুজে উল্লেখ হয়েছে।

এদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তি যে কোনো উপায়ে তার কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে ছুটে এসে পারস্য-সম্রাটের কাছে ফরিয়াদ করে, হিমইয়ারী শাসনকর্তা দীনদার তাওহিদপন্থীদের উপর এরূপ অত্যাচার চালাচ্ছে। আপনি তার প্রতিশোধ নিন।

তখন পারস্য-সম্রাট ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের দীনের অনুসারী হাবশার শাসনকর্তার কাছে চিঠি লিখলেন, আপনি এই জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। তিনি এই নির্দেশ পেয়ে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী দুই কমান্ডার তথা আরবাত ও আবরাহার নেতৃত্বে ইয়ামানের ঐ বাদশার মোকাবেলা করার জন্য প্রেরণ করেন। উক্ত সেনাবাহিনী তার দেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং গোটা ইয়ামানকে হিমইয়ার সম্প্রদায়ের কবজা থেকে স্বাধীন করে।

তখন হিমইয়ার শাসনকর্তা যু-নাওয়াস পালিয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে নদীতে ডুবে মারা যায়। এভাবে আবরাহার মাধ্যমে ইয়ামান অঞ্চল হাবশার শাসনকর্তার দখলে চলে আসে।

পরবর্তীকালে আরবাত ও আবরাহার মধ্যে লড়াই হয়। তখন আরবাত নিহত হয় এবং আবরাহা জয়ী হয়। এতে আবরাহা ইয়ামানের উপর এককভাবে দখলদারিত্ব কায়েম করে।

আবরাহার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের বক্তব্য হলো, সে শাহী গোত্রের ছিল। তার নাম ছিল আবরাহা। কিন্তু যেহেতু তার নাক কাটা ছিল, তাই আরবরা তাকে ابرهة الاشرم (আবরাহা আলআশরাম) বলতো। আরবিতে اشرم শব্দের অর্থ নাক কাটা।

কারো কারো মতে, আবরাহা ৫২৫ খ্রিস্টাব্দে রাজত্ব শুরু করে। আর কোন কোন ঐতিহাসিক ৫৪৩ খ্রিস্টাব্দের কথা উল্লেখ করেছেন। ‘আরদুল কুরআন’ প্রণেতা দ্বিতীয় মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

আবরাহা কট্টর খ্রিস্টান ছিল, যার কারণে সে গোটা সাম্রাজ্যে ঈসায়ী মুবাল্লিগ নিযুক্ত করেছিল এবং শহরে-বন্দরে বড় বড় গির্জা নির্মাণ করেছিল। শেষ পর্যন্ত আবরাহা ইচ্ছা করলো, ইয়ামানে এমন একটি শানদার গির্জা নির্মাণ করবে, যার কোন নযীর পৃথিবীর বুকে থাকবে না। এর দ্বারা তার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, ইয়ামানসহ সারা বিশ্বে যে সমস্ত আরব-অনারব মক্কা মুকাররমায় উপস্থিত হয়ে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করে, তারা যেন এই গির্জার শান-শওকতে প্রভাবিত হয়ে কাবার পরিবর্তে এই গির্জায় আগমন করে।

এই খেয়ালে সে একটি সুউচ্চ আলীশান গির্জা নির্মাণ করলো, তার চূড়ায় দাঁড়ালে নিচের মানুষজন দেখা যেত না। সম্পূর্ণ গির্জাটি সে সোনা-রুপা, হীরা, মণি-মুক্তা ও হাতির দাঁত দিয়ে নকশা করে সাজিয়েছিল।

সুহায়লী রহ. বর্ণনা করেন, এই গির্জা নির্মাণের ক্ষেত্রে আবরাহা ইয়ামানের অধিবাসীদের উপর খুব অত্যাচার করেছিল। সে সেখানকার অধিবাসীদের জোরপূর্বক শ্রমিক বানিয়েছিল এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে এর পিছনে অঢেল সম্পদ ব্যয় করেছিল।

গির্জা-নির্মাণ সমাপ্ত করার পর আবরাহা হাবশার সম্রাট নাজাশীর কাছে এই মর্মে পত্র প্রেরণ করলো, আমি ইয়ামানের রাজধানী সানআয় আপনার জন্য 'আলকালিস' নামক এমন এক নযীরবিহীন গির্জা নির্মাণ করেছি, বিগত ইতিহাস যার কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারেনি। এখন আমার আকাঙ্ক্ষা হলো গোটা বিশ্বের যে সকল আরব-অনারব মক্কা মুআজ্জমায় হজ্জ পালন করার জন্য একত্র হয়, তাদের সকলের অন্তরাত্মা এই গির্জার দিকে ফিরিয়ে দিব, আর এখন থেকে এটাই হবে তাদের সবার হজ্জব্রত পালন করার স্থান।

সমস্ত আহলে আরব তথা ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষ সকলেই পবিত্র কাবার খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো এবং প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী বায়তুল্লাহর হজ্জ ও যিয়ারত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত মনে করতো। এ জন্যই আহলে আরবরা যখন আবরাহার এই উদ্দেশ্যের কথা জানতে পারলো, তখন আদনান, কাহতান ও কুরাইশ গোত্রের লোকেরা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। এমনকি এদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রাতের আঁধারে ঐ গির্জায় প্রবেশ করে তাতে মলমূত্র ত্যাগ করে তা অপবিত্র করে দিল। কোন কোন বর্ণনামতে, মুসাফিরদের একটি দল নিজেদের প্রয়োজনে উক্ত গির্জার পাশে আগুন জ্বালালে তা থেকে ঐ গির্জায় আগুন ধরে যায় এবং তার অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়।

আবরাহা যখন জানতে পারলো, কোন আরবীয় লোকের দ্বারা এ কাজ হয়েছে, তখন সে শপথ করলো, আমি তাদের কাবাগৃহের ইট একটা একটা করে খুলে ফেলবো এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তা না করতে পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি শান্ত হবো না। এরই ভিত্তিতে আবরাহা বায়তুল্লাহ অভিমুখে রওয়ানার প্রস্তুতি শুরু করলো এবং এই মর্মে বাদশা নাজাশীর কাছে অনুমতি চাইলো। নাজাশী তার 'মাহমুদ' নামক বিশেষ হাতিটি আবরাহার জন্য প্রেরণ করলো, যাতে করে সে সওয়ার হয়ে কাবা শরীফে আক্রমণ করতে পারে।

কোন কোন বর্ণনামতে, এটা খুব বড় ও শক্তিশালী হাতি ছিল, তৎকালীন সময়ে যার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যেত না। এর সাথে সাথে হাবশা সম্রাট অন্যান্য সেনা সদস্যের জন্য আরও আটটি হাতি প্রেরণ করেছিল। সে এই উদ্দেশ্যে এসব হাতি প্রেরণ করেছিল যে, বায়তুল্লাহ শরীফ ধ্বংস করার ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করে যেন সহজেই কার্যসিদ্ধি করা যায়। সে ভাবলো, বায়তুল্লাহর খাম্বাগুলো লোহার শক্ত শিকল দিয়ে আটকিয়ে ঐ শিকলগুলো হাতির

গলায় বেঁধে হাতি হাঁকানো হলে, হাতিগুলোর টানের তোড়ে সম্পূর্ণ বায়তুল্লাহ সাথে সাথে ভেঙ্গে পড়বে। (নাউযুবিল্লাহ)।

আরবরা যখন দুর্ধর্ষ আবরাহার এ কাবা আক্রমণের কথা শুনতে পেলো, তখন তারা সকলেই তার মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। সর্বপ্রথম যু-নাযার নামক আরব-বংশোদ্ভূত এক ইয়ামানী সরদার ইয়ামান থেকে বের হয়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে এই সংবাদ দিয়ে দূত প্রেরণ করলেন যে, আমি আবরাহার মোকাবেলা করতে চাই। সুতরাং আপনাদের উচিত হলো এই সৎকাজে আমাকে সহযোগিতা করা। এই বলে তিনি আরবদের একটি দলসহ আগে বেড়ে আবরাহা বাহিনীর মোকাবেলায় যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। কিন্তু তাতে তিনি পরাজয় বরণ করলেন এবং গ্রেফতার হলেন।

আবরাহা পথ অতিক্রম করে যখন 'খাসআম' গোত্রের এলাকায় পৌঁছালো তখন ঐ গোত্রের সরদার নুফায়েল ইবনে হাবিব নিজ গোত্রের লোকজন নিয়ে আবরাহা-বাহিনীর মোকাবেলা করলো। কিন্তু সেও পরাজিত হলো এবং গ্রেফতার হলো। তারপর সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য আবরাহার পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব গ্রহণ করলো।

অতঃপর আবরাহা বাহিনী তায়েফের নিকটে পৌঁছালো। সেখানকার অধিবাসী সাকিফ গোত্র পূর্ব থেকেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে লড়াইয়ে আবরাহা বাহিনীর বিজয়ের কথা শুনেছে। তাই এত বড় শক্তির মোকাবেলা করতে পারবে না মনে করে তাদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত না হয়ে নিজেদের সরদার মাসউদ ইবনে মুআত্তাবকে একটি প্রতিনিধিদলসহ আবরাহার সাথে সাক্ষাত করতে প্রেরণ করে। সে আবরাহার সাথে সাক্ষাত করে বললো, আপনার সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। সেজন্য আমাদের এ বিশ্বাস আছে, আপনি আমাদের উপাস্য 'লাত'-এর মন্দিরের কোন ক্ষয়-ক্ষতি করবেন না। বিনিময়ে আমরা আপনার সহযোগিতা ও পথপ্রদর্শনের জন্য আমাদেরএক সরদার আবু রিগালকে প্রেরণ করছি, তিনি আপনাকে মক্কা পর্যন্ত পৌঁছে দিবেন। আবরাহা এই প্রস্তাব গ্রহণ করে আবু রিগালকে সাথে নিয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হলো।

পথিমধ্যে 'মাগমাস' নামক উপত্যকায় আবু রিগাল মারা গেলো। বর্ণিত আছে, আবরাহাকে পথ দেখানো ছিল আবু রিগালের বিশ্বাস ঘাতকতামূলক অপরাধ। তাই তার মৃত্যুর পর সে যুগে আরবের লোকেরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার কবরের উপর পাথর নিক্ষেপ করে।

এই 'মাগমাস' নামক স্থানে মক্কার কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের ভেড়া-বকরি ও উটের চারণভূমি ছিল। আবরাহার সৈন্যবাহিনী এখানে পৌঁছে সর্বপ্রথম এসব পশুপালের উপর আক্রমণ করে

তা থেকে অনেক ভেড়া-বকরি ও উট লুট করে নিয়ে গেল। এ গুলোর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত পিতামহ কুরাইশ-নেতা আবদুল মুত্তালিবেরও দুইশ উট ছিল।

অতঃপর এই স্থানে অবস্থান নিয়ে আবরাহা তার হানাতা হামিরী নামক দূতকে মক্কা মুকাররমায় প্রেরণ করলো, যেন সে মক্কায় গিয়ে কুরাইশ সরদারের নিকট এই পয়গাম পৌঁছায় যে, আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করতে আসিনি। বরং কাবাঘর বিধ্বস্ত করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং এ ব্যাপারে যদি তোমরা আমাদের বাধা না দাও, তা হলে আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করবো না।

আবরাহার পয়গাম নিয়ে হানাতা হামিরী যখন মক্কা মুয়াজ্জমায় প্রবেশ করলো, তখন সকলেই আবদুল মুত্তালিব-এর দিকে ইঙ্গিত করে বললো, ইনিই হলেন মক্কার প্রধান সরদার। তখন হানাতা আবদুল মুত্তালিব-এর সাথে সাক্ষাত করে আবরাহার উক্ত পয়গাম পৌঁছালো।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী, আবদুল মুত্তালিব জবাব দিলেন, আমরা কখনোই আবরাহার সাথে লড়াই করতে চাই না। আর না আমাদের তার সাথে লড়াই করার মতো শক্তি আছে। তবে হ্যাঁ, আমি নির্দ্বিধায় এতটুকু বলতে পারি, কাবা আল্লাহর ঘর, যা তার খলীল ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নির্মাণ করেছেন। তিনি নিজেই এর হেফাজত করবেন। আর যে আল্লাহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, সে দেখতে পাবে, আল্লাহ তার সাথে কিরূপ আচরণ করেন।

অতঃপর হানাতা আবদুল মুত্তালিবের কাছে প্রস্তাব পেশ করলো, আপনি আমার সাথে চলুন। আমি আপনাকে আবরাহার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিব। তিনি এই প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে আবরাহার সাথে দেখা করতে গেলেন।

আবদুল মুত্তালিব অতিশয় সুশ্রী, বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্ববান লোক ছিলেন। আবরাহা তাকে দেখে খুবই প্রভাবিত হলো এবং নিজের সিংহাসন থেকে উঠে এসে তার পাশে বসলো। অতঃপর আবরাহা জিজ্ঞেস করলো, আপনি কী উদ্দেশ্যে এসেছেন? তিনি বললেন, আমার প্রয়োজন শুধু এতটুকু যে, আমার যে সমস্ত উট লুণ্ঠন করে আনা হয়েছে, সেগুলো ফেরত দেওয়া হোক। আবরাহা বললো, আমি আপনাকে দেখে খুবই উচ্চ মনের অধিকারী ও বিচক্ষণ নেতা মনে করেছিলাম। কিন্তু আপনার এই কথার দ্বারা আমার সেই ধারণার পরিবর্তন ঘটলো। কেননা, আপনি কেবল আপনার দুইশ উট ফেরত নেওয়ার ব্যাপারেই আমার সাথে কথা বললেন, অথচ আপনি জানেন যে, আমি আপনার পিতৃধর্মের কেন্দ্রস্থল কাবাঘর ধ্বংস করার জন্য মক্কায় এসেছি। কিন্তু আপনি সে ব্যাপারে কোন কথাই বললেন না। আবদুল মুত্তালিব জবাব দিলেন,

এই উটগুলোর মালিক আমি, তাই সে গুলোর ব্যাপারে আমাকেই চিন্তা করতে হবে। আর বায়তুল্লাহর ব্যাপারে কথা হচ্ছে, তারও একজন মহান মালিক আছেন। তিনি নিজেই এর হেফাজত করবেন।

তখন আবরাহা বললো, আপনার প্রভু তাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন না। তা শুনে আব্দুল মুত্তালিব বললেন, আমার বলার দরকার বললাম, এবার আপনার ইচ্ছা। আপনি যা চান, করতে পারেন।

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, আবদুল মুত্তালিবের সাথে আরো কয়েকজন কুরাইশ সরদার আবরাহার সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন এবং তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আপনি যদি বায়তুল্লাহর উপর হস্তক্ষেপ না করে ফিরে যান, তবে আমরা প্রতি বছর আমাদের উৎপাদিত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ আপনাকে কর হিসেবে প্রদান করবো। কিন্তু আবরাহা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো।

আলোচনার পরে আবরাহা আবদুল মুত্তালিব-এর উটগুলো ফিরিয়ে দিল। তিনি তার উট নিয়ে চলে এলেন।

অতঃপর আবদুল মুত্তালিব কুরাইশদের বিশাল একদল সাথে নিয়ে বায়তুল্লাহ শরীফের দরজার কড়া ধরে সকলে মিলে আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে লাগলেন, আয় আল্লাহ, আবরাহার এত বড় শক্তিশালী বাহিনীর মোকাবেলা করার সামর্থ আমাদের নেই। তাই আপনি নিজেই আপনার ঘরের হেফাজত করার ব্যবস্থা করুন।

খুব কাকুতি-মিনতির সাথে দু'আ করার পর আবদুল মুত্তালিব মক্কা মুকাররমার লোকদের নিয়ে আশপাশের পর্বতমালায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কারণ, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আবরাহার সৈন্যবাহিনীর উপর আল্লাহর গজব নাযিল হওয়া অবধারিত। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই আবদুল মুত্তালিব আবরাহার কাছে শুধু তার উট ফেরত চেয়েছিলেন। তখন বায়তুল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা করা এ জন্য পছন্দ করেননি যে, একে তো তাদের মোকাবেলা করার মতো শক্তি-সামর্থ ছিল না, অপরদিকে এই বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর রহম করে স্বীয় কুদরতে কাবার দুশমনদের নাস্তানাবুদ করে দিবেন।
পরের দিন সকালে আবরাহা তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করার জন্য অগ্রসর হলো। সে তার 'মাহমুদ' নামীয় হাতিটি সামনে চালানোর জন্য প্রস্তুত করলো। তখন নুফায়েল ইবনে হাবিব, যাকে আবরাহা রাস্তা থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছিল, সে এই সময় সামনে অগ্রসর

হয়ে উক্ত হাতির কান ধরে বললো, তুমি যেখান থেকে এসেছো, সেখানেই সহীহ-সালামতে ফিরে যাও। কেননা, তুমি আল্লাহ তা'আলার নিরাপদ শহরে (بَلَد امِيْن) অবস্থান করছো। এই বলে সে হাতির কান ছেড়ে দিল। এটা শোনামাত্র উক্ত হাতি বসে পড়লো।

হাতির মাহুতরা অনেক চেষ্টা করে তাকে উঠিয়ে সামনে অগ্রসর করাতে চাইলো। কিন্তু কি আশ্চর্য, সে উঠলো না। এমনকি হাতিটিকে খুব প্রহার হলো, বড় বড় চাবুক দিয়ে আঘাত করা হলো এবং আঘাত করতে করতে তাকে আহত করা হলো। আবার হস্তিটির নাকে লোহার আংটা লাগিয়ে তাকে উঠানোর চেষ্টা করা হলো। কিন্তু এতো কিছু সত্ত্বেও সে এক বিন্দুও সামনে বাড়লো না।

আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, সেই হাতিটি যখন বিপরীত দিকে অর্থাৎ উত্তর, দক্ষিণ বা পূর্ব দিকে চালানোর চেষ্টা করা হতো, তখন সে দৌড় শুরু করতো। পক্ষান্তরে মক্কার দিকে ফিরিয়ে চালানোর চেষ্টা করা হলে, সাথে সাথে বসে পড়তো। তখন কোনক্রমেই সম্মুখের দিকে চালানো সম্ভব হতো না।

হস্তিবাহিনীর উপর যেভাবে আযাব এলো

এভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ সমুদ্রের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে এলো। প্রত্যেকটি পাখির মুখে একটি ও দুই পায়ে দুটি করে পাথর ছিল।

ওয়াকিদী রহ. বর্ণনা করেন, পাখিগুলো এত আশ্চর্য ধরনের ছিল, ইতোপূর্বে কখনোই ঐ ধরনের পাখি দেখা যায়নি। সেগুলো আকৃতিতে কবুতরের চেয়ে একটু ছোট, লাল পাঞ্জাযুক্ত ছিল। এদের প্রত্যেক পাঞ্জা ও মুখে একটি করে কাঁকর-পাথর ছিল।

পাখিগুলো হঠাৎ করে এসে আবরাহার সৈন্যদের মাথার উপর শূন্যে অবস্থান গ্রহণ করলো এবং গোটা বাহিনীর উপর পাথরকুচির বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করলো। এই কংকর যার শরীরে পড়লো, সাথে সাথে তার শরীর বিগলিত হয়ে মাটিতে প্রবিষ্ট হয়ে গেল।

এই ভয়ানক শাস্তি দেখে সমস্ত হাতি দৌড়ে পালিয়ে গেল। কেবল একটি হাতি সেখানে থেকে গিয়েছিল। সেটাও কংকরের আঘাতে ধ্বংস হয়ে গেল।

সকল সেনাসদস্য ঐ স্থানে ধ্বংস হয়নি, বরং তাদের অনেকে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করলে, রাস্তায়ই মরতে থাকে এবং জমিনে লুটিয়ে পড়তে থাকে।

আবরাহা বাহিনীর ধ্বংসের বিবরণ রেওয়ায়েতে এভাবে এসেছে,

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ :لَمَّا ارَادَ اللهُ انْ يَّهْلِكَ اصْحَابَ الْفِيْلِ بَعَثَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا انْشِئَتْ مِنَ الْبَحْرِ امْثَالَ الْخَطَاطِيْفِ كُلُّ طَيْرٍ مِّنْهَا يَحْمِلُ ثَلَاثَةَ احْجَارٍ مُجَزَّعَةً حَجَرَيْنِ فِىْ رِجْلَيْهِ وَحَجَرًا فِىْ مِنْقَارِه قَالَ فَجَاءَتْ حَتّٰى صَفَّتْ عَلٰى رُؤُوْسِهِمْ ثُمَّ صَاحَتْ وَالْقَتْ مَافِىْ ارْجُلِهَا وَمَنَاقِيْرِهَا فَمَا يَقَعُ حَجَرٌ عَلٰى رَاسِ رَجُلٍ الَّاخَرَجَ مِنْ دُبُرِه وَلَايعق عَلٰى شَىْءٍ مِّنْ جَسَدِه الَّاخَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْاٰخَرِ وَبَعَثَ اللهُ رِيْحًا شَدِيْدَةً فَضَرَبَتِ الْحِجَارَةَ فَزَادَهَا شِدَّةً فَاهْلَكُوْا جَمِيْعًا)التفسير للامام ابن كثير(

হযরত উবাইদ ইবনে উমাইর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন 'আসহাবে ফীল'কে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন, তখন সমুদ্র থেকে তাদের উপর কবুতর ছানার ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন। সেগুলোর প্রত্যেকটি পাখি মুখে একটি এবং দুই পায়ে দুটি করে কাঁকর-পাথর নিয়ে আসে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর পাখিগুলো সারিবদ্ধভাবে আবরাহা বাহিনীর মাথার উপর অবস্থান নিয়ে চিৎকার করে আওয়াজ দেয় এবং তাদের মুখ ও দুই পায়ের পাথর নিক্ষেপ করে। পাথরগুলো আবরাহার সৈন্যদের মাথায় বিদ্ধ হয়ে পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যায় এবং শরীরের এক প্রান্তে প্রবেশ করে অপর প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা প্রস্তর নিক্ষেপের সাথে সাথে তাদের উপর প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ও প্রেরণ করেন। এই ঝড় উক্ত প্রস্তরের গায়ে আঘাত হেনে তার গতির প্রচন্ডতা তীব্রভাবে বাড়িয়ে দেয় এবং এর দ্বারা তাদের উপর কঠিন গজব নিপতিত হয়ে তারা সকলে ধ্বংস হয়ে যায়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ও ইকরিমা রহ. বর্ণনা করেন, ঐ পাথরকুচির স্পর্শ লাগলেই হস্তি বাহিনীর সৈন্যদের দেহে বসন্ত রোগ উদ্ভূত হয়ে যেত। আরব দেশগুলোতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব এই বছরই সর্বপ্রথম দেখা দেয়।

রইসুল মুফাসসিরীন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, যার উপর এই পাথরকুচি পড়তো, সাথে সাথে তার শরীরে ভয়ানক চুলকানি শুরু হয়ে যেত। এই চুলকানির ফলে চামড়া ফেটে যেত, গোশত খসে পড়ত এবং অস্থি বের হয়ে আসতো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর অন্য বর্ণনামতে, এই প্রস্তরের আঘাতে শরীরের গোশত ও রক্ত পানির মতো ঝরতে শুরু করতো, যার ফলে হাড্ডি বের হয়ে আসতো। স্বয়ং আবরাহারও এই অবস্থা দেখা দেয়। তার শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে খসে পড়ে যেতে থাকে। তার শরীরের যেখানেই পাথর খণ্ড পড়লো, সেখান থেকেই রক্ত ও পুঁজ প্রবাহিত হতে লাগলো।

এই অবস্থায় তাকেইয়ামানের রাজধানী সানআয় নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে সে ছটফট করতে করতে অত্যন্ত করুণ অবস্থায় মারা গেল।

আবরাহার মাহমুদ নামক হাতির দুইজন চালক মক্কা মুকাররমায় রয়ে গিয়েছিল। তারা অন্ধ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। আয়েশা সিদ্দিকা রা. থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমার বড় বোন হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা. বলেন, আমি ঐ ল্যাংড়া দুটোকে ভিক্ষা করতে দেখেছি।

হস্তি বাহিনীর এ ঘটনা সম্পর্কে সূরা ফীলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে ইরশাদ করা হয়েছে,

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيْلِ

আপনি কি দেখেননি, আপনার রব হস্তি বাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? এখানে প্রশ্ন হয় যে, اَلَمْ تَرَ (আপনি কি দেখেননি) বলা হয়েছে। অথচ এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের পূর্বেকার ঘটনা। কাজেই তার সেই ঘটনা দেখার প্রশ্নই উঠে না। এই প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, উক্ত ঘটনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ ও বর্ণনা তখন এতো ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল, এ ব্যাপারে কারো সন্দিহান হওয়ার কোন অবকাশ ছিল না। আর যে ঘটনা এরূপ নিশ্চিত যে, তা ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়, সেই ঘটনার জ্ঞানকেও দেখা বলে ব্যক্ত করা হয়। যেন এটা চাক্ষুষ ঘটনা। তা ছাড়া ঘটনার কিছু প্রভাব পরবর্তীতেও দেখা গেছে। যেমন, হযরত আসমা রা.-এর দুজন হস্তি চালককে অন্ধ-বিকলাঙ্গ ও ভিক্ষুকরূপে দেখার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আবরাহা বাহিনীকে যে পাখির মাধ্যমে ধ্বংস করেছেন, কুরআনে কারীম সে ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে,

وَارْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ

তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। (সূরা ফীল, আয়াত:৪)

এখানে উল্লিখিত اَبَابِيْلَ শব্দটি বহুবচন। কিন্তু আরবী ভাষায় এর কোন এক বচনের ব্যবহার পাওয়া যায় না। এর অর্থ পাখির ঝাঁক। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে 'আবাবীল' কোন পাখির নাম নয়, বরং এ শব্দ দ্বারা সেই পাখির আধিক্য বুঝানো হয়েছে। এই পাখির আকারে কবুতর অপেক্ষা একটু ছোট ছিল। কিন্তু এ জাতীয় পাখি এর পূর্বে কখনোই দেখা যায়নি। (আহকামুল কুরআন)

হস্তিবাহিনীর উপর যে কংকর নিক্ষিপ্ত হয়েছিল কুরআনে কারীমে সে ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে, بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ (পাথরজাতীয় কংকর দ্বারা।) ভেজা মাটি আগুনে পুড়িয়ে যে কংকর তৈরি করা হয়, সে কংকরকে سِجِّيْلٍ বলা হয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে, এই কংকর কেবল সাধারণ মাটি ও আগুনের তৈরি ছিল, যার নিজস্ব কোন বিশেষ শক্তি ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কুদরতে ঐ কংকর রাইফেলের গুলির চেয়ে বেশি কাজ করেছিল। যার ফলে আবরাহা বাহিনী ধ্বংস হয়ে ভক্ষিত ভূষির ন্যায় হয়ে গিয়েছিল।

নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে,

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاكُوْلٍ

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের ভক্ষিত ভূষিসদৃশ করে দেন। (সূরা ফীল, আয়াত:৫)

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত عَصْف শব্দের অর্থ ভূষি। ভূষি নিজেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন তৃণ। তদুপরি যদি কোন জন্তু সেটিকে চাবায়, তবে এই তৃণও আর তৃণ থাকে না, বরং সম্পূর্ণ নিষ্পেষিত গুঁড়া হয়ে যায়। কংকর নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে আবরাহার সৈন্যবাহিনীর অবস্থাও তদ্রুপই হয়েছিল।

আসহাবে ফীলের ঘটনাস্থল

আসহাবে ফীলের এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল মিনা ও মুজদালিফার মাঝখানে মুহাসসার নামক স্থানে। মুসলিম ও আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম জাফর সাদেক রহ. তার পিতা ইমাম মুহাম্মাদ বাকের রহ. হতে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্জের যে বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুযদালিফা হতে মিনার দিকে চললেন, তখন মুহাসসার উপত্যকায় চলার গতি খুব বাড়িয়ে দিলেন। বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ ইমাম নববী রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হস্তিওয়ালাদের উপর আযাব নাযিলের ঘটনা ঠিক এই জায়গায় সংঘটিত হয়েছিল। এ জন্য গযবের এই স্থানটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব দ্রুত অতিক্রম করেছিলেন। সুতরাং এই স্থান এভাবে দ্রুত অতিক্রম করে যাওয়াই সুন্নত।

আল্লাহ তা‘আলা হাবশীদের এই শাস্তি দেওয়ার সাথে সাথে তিন-চার বছরের মধ্যে ইয়ামান হতে তাদের শাসন ক্ষমতারও অবসান ঘটান। হস্তিবাহিনীর এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরে ইয়ামানের হাবশীদের শক্তি ও ক্ষমতা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। দিকে দিকে ইয়ামানী সরদাররা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে থাকে। এক পর্যায়ে ইয়ামানী নেতৃবর্গ হাবশীদের মোকাবেলায় পারস্য-সম্রাটের নিকট সামরিক সাহায্যের আবেদন করে। ফলে ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের মাত্র এক হাজার সৈন্য ছয়টি যুদ্ধ জাহাজ সহ ইয়ামানে আগমন করে এবং সেখান থেকে হাবশীদের পরাস্ত করে তাদের শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

হস্তিবাহিনীর এই অভূতপূর্ব ঘটনা সমগ্র আরবের এবং সারাবিশ্বের মানুষের অন্তরে কুরাইশদের মাহত্ম্য আরো বাড়িয়ে দেয়। এরপর থেকে সবাই এক বাক্যে স্বীকার করতে লাগলো, কুরাইশরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ভক্ত। তাই তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তা‘আলা তাদের শত্রুদের নাস্তানাবুদ করে দিয়েছেন। (আল জামি‘ লি আহকামিল কুরআন লিল-কুরতবী)

আসহাবে ফীলের ঘটনা থেকে শিক্ষা

পবিত্র কুরআনে উল্লেখকৃত এ ধরনের ঘটনা থেকে আমাদের উপদেশ গ্রহণ করা জরুরী যে, আল্লাহ তা‘আলার হুকুম-আহকামের অবমাননা করা নিজেদের ধ্বংস ও বরবাদি ডেকে আনারই নামান্তর। তাই সব ধরনের পাপাচার ও ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করে আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত পন্থা অবলম্বন করা আমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। এর মাধ্যমেই আমরা খোদায়ী আযাব-গযব হতে রক্ষা পেয়ে দুনিয়া ও আখেরাতে সফল হতে পারবো।

হস্তিবাহিনীর এই অভূতপূর্ব ঘটনা সমগ্র আরবের এবং সারাবিশ্বের মানুষের অন্তরে কুরাইশদের মাহত্ম্য আরো বাড়িয়ে দেয়। এরপর থেকে সবাই এক বাক্যে স্বীকার করতে লাগলো, কুরাইশরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ভক্ত। তাই তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তা‘আলা তাদের শত্রুদের নাস্তানাবুদ করে দিয়েছেন। (আল জামি‘ লি আহকামিল কুরআন লিল-কুরতবী)

গাযওয়ায়ে বদর

আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনের সূরা আনফালে ইরশাদ করেন,

كَمَآ اَخْرَجَکَ رَبُّکَ مِنْۢ بَيْتِکَ بِالْحَقِّ ۪ وَ اِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَکٰرِهُوْنَ○ يُجَادِلُوْنَکَ فِى الْحَقِّ
بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ کَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ○

(গনিমতের মাল বণ্টনের এ বিষয়টা কল্যাণকর হওয়ার দিক থেকে এমনই) যেমন আপনাকে আপনার রব আপনার ঘর (মদীনা) থেকে (বদরপ্রান্তরে) বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের

(কাফেরদের সাথে যুদ্ধের) জন্য, আর মুমিনদের একটি দল (সংখ্যা স্বল্পতা আর যুদ্ধাস্ত্রের স্বল্পতার কারণে স্বভাবত) তা অপছন্দ করছিল। তারা আপনার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে (তথা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে) (মশওয়ারা সাপেক্ষে) তা (যুদ্ধের সিদ্ধান্ত) প্রকাশিত হওয়ার পর। (তারা আপনার সাথে এমনভাবে বিবাদ করছিল) যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর তারা (মৃত্যুকে) দেখছে। (সূরা আনফাল, আয়াত:৫-৬; তাফসীরে মারিফুল কুরআন, ৪/১৮১)

এ আয়াত দুটিতে গাযওয়ায়ে বদর প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামের ইতিহাসে গাযওয়ায়ে বদর বা বদরের যুদ্ধ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই যুদ্ধ দ্বারা একদিকে তখনকার ইসলাম বিরোধী কুফরী শক্তির দর্প চূর্ণ হয়েছে। অপরদিকে মুসলিমগণ মানসিকভাবে অশেষ দৃঢ়তা অর্জন করতে পেরেছেন।

আল্লাহ তা'আলা এই যুদ্ধের মাধ্যমে হক ও বাতিলের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রচনা করে দিয়েছেন। এই যুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ঘটনার প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দিলে মুমিনের ঈমান বাড়ে আর অবিশ্বাসী সম্প্রদায় এর দ্বারা ইসলাম গ্রহণ করার এবং ইসলামের বিরোধিতা না করার নসীহত লাভ করতে পারে।

অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের নসীহত অর্জনের মতো আরেকটি যুদ্ধ হলো গাযওয়ায়ে খায়বার। এ যুদ্ধেও ইসলাম বিরোধীদের নাস্তানাবুদ হওয়ার চিত্র প্রত্যক্ষভাবে ফুটে উঠেছে।

আমরা সবিস্তারে এই দুই গাযওয়া সম্পর্কিত আয়াতগুলোর তাফসীর করার চেষ্টা করবো। যাতে মুসলিমগণের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা যেন আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ না হয় আর অবিশ্বাসী সম্প্রদায় নসীহত অর্জনপূর্বক ইসলামের বিরোধিতা থেকে বিরত থাকে।

প্রথমে বদর যুদ্ধের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। এ যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট দুটি আয়াত উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতে বলা হয়েছে,

وَ انَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ

"মুমিনদের একটি দল তা অপছন্দ করছিল।"

সাহাবায়েকেরামের একটি দল বদর যুদ্ধকে কেন অপছন্দ করছিলেন, তা বুঝার জন্য বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট জানা প্রয়োজন।

গাযওয়ায়ে বদরের প্রেক্ষাপট

ইবনে উকবা ও ইবনে আমেরের বর্ণনা মোতাবেক বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট নিম্নরূপ।

কাফেররা বিভিন্নভাবে ইসলামের ধ্বংস সাধনের অপচেষ্টা করতে থাকে। তাদের অত্যাচারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণ মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হন। কিন্তু তাদের মদীনায় চলে আসার পরও কাফেররা ইসলাম ও মুসলিমদের ধ্বংস সাধনে নানারকম ষড়যন্ত্র করতে থাকে।

ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সেই ষড়যন্ত্রের সূত্রেই কাফেররা মক্কা থেকে সিরিয়ায় একটি বৃহৎ বাণিজ্য-কাফেলা প্রেরণ করে। যার উদ্দেশ্য ছিলো, ব্যবসার মুনাফা লব্ধ অর্থসম্পদ তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যয় করবে। এমনকি এ ব্যাপারে তারা মান্নত করে নিলো।

তাদের এ অসৎ পরিকল্পনার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেনে গেলেন। তাই তাদের সেই চক্রান্তমূলক বাণিজ্য-কাফেলার গতিরোধ করার ইচ্ছা করলেন।

দ্বিতীয় হিজরির রমযান মাস চলছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হঠাৎ একদিন খবর পেলেন, কুরাইশ-সরদার আবু সুফিয়ান মক্কার সেই বৃহৎ ব্যবসায়ী কাফেলা নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করছে। এই ব্যবসায় মক্কার সমস্ত কুরাইশ শরীক ছিল। এই কাফেলায় তখনকার পঞ্চাশ হাজার দিনার সমমূল্যের মাল ছিল। বর্তমান টাকার হিসেবে পঞ্চাশ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এই ব্যবসায়ী কাফেলার হেফাজতের জন্য কুরাইশের সত্তরজন সশস্ত্র জওয়ান পাহারায় নিযুক্ত ছিল। এদের চল্লিশজনই ছিল নেতা পর্যায়ের। তাদের মধ্য থেকে আমর ইবনুল আস ও মাখযামা বিন নাওফেল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যদিও ব্যবসা ছিল কুরাইশদের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু এই ব্যবসায়ী কাফেলার মাধ্যমে তারা বিশেষভাবে অর্থসম্পদ ও যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে অবতীর্ণ হওয়ার শপথ করেছিলো এবং এই কাফেলার সমস্ত মাল তারা ইসলাম ও মুসলিমদের উৎখাতের জন্য ব্যয় করার মান্নত করে রেখেছিল।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই ব্যবসায়ী কাফেলার সিরিয়া থেকে মক্কার পথে রওনা হওয়ার কথা শুনলেন, তখন তিনি কুরাইশদের এই ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতার ভিত উপড়ে ফেলার জন্য এই কাফেলার গতিরোধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

এ নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবায়েকেরামের সাথে পরামর্শ করলেন। তখন একে তো রমযান মাস চলছিল, তা ছাড়া পূর্ব থেকে তাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি ছিল না, তাই এ ব্যাপারে কেউ কেউ কিছুটা অমত প্রকাশ করেছিলেন। আবার কেউ কেউ খুব বাহাদুরির সাথে হামলার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে এই জিহাদে শরীক হওয়ার হুকুম দিলেন না। বরং বললেন, যারা যেতে আগ্রহী এবং যাদের বাহন-জন্তু এ এলাকায় উপস্থিত আছে, শুধু তারাই আমার সাথে যুদ্ধে বের হবে।

এ কথা শুনে অনেকেই এ জিহাদে শরীক হলেন না। কারণ, তারা ভাবছিলেন, ব্যবসায়ী কাফেলার গতিরোধ করা হবে। এর জন্য বেশি সংখ্যক মুজাহিদের প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে শরীক হওয়াকে জরুরী বলেননি। বরং ঐচ্ছিক বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

অনেকে যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছায় বাহন-জন্তু গ্রাম থেকে নিয়ে আসার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুমতি দিলেন না। কারণ, হাতে এতটা সময় ছিল না যে, তাদের জন্য অপেক্ষা করা হবে। এসব কারণে খুব কম সংখ্যক সাহাবী এ যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন।

যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কাফেলা রওনা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়েকেরামকে নিয়ে মদীনার বাইরে 'বিরে সুকআ' নামক স্থানে পৌঁছলেন। কায়েস বিন সা'সা রা. কে সৈন্য সংখ্যা গণনা করার হুকুম দিলেন। তিনি জানালেন, সৈন্য সংখ্যা সব মিলে ৩১৩। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তালুতের বাহিনীর সৈন্য সংখ্যাও ৩১৩ জন ছিল। এর দ্বারা বিজয়ের শুভ লক্ষণ গ্রহণ করা যেতে পারে।

সাহাবায়ে কেরামের সাথে মোট সত্তরটি উট ছিল। পালাক্রমে প্রত্যেক তিনজন একটি উটে আরোহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ছিলেন হযরত আলী ও

আবু লুবাবা রা.। যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে হেঁটে চলার পালা আসতো, তখন তারা বলতেন, আপনার পরিবর্তে আমরাই হেঁটে চলছি, আপনি উটের উপর থাকুন। উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, তোমরা আমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী নও, আর আমি আখিরাতের সাওয়াব থেকে অমুখাপেক্ষী নই যে, নিজের সুযোগ হাতছাড়া করবো। এ জবাবের পর কিছু বলার থাকে না। তাই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামও নিজের পালার সময় পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন।

ওদিকে একব্যক্তি সিরিয়ার প্রসিদ্ধ স্থান আইনে যারকা পৌঁছে কাফেলা-প্রধান আবু সুফিয়ানকে সতর্ক করলো। সে সংবাদ দিল, মুহাম্মাদ অস্ত্রশস্ত্র ও দলবল নিয়ে তার অপেক্ষায় আছেন।

এই সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য আবু সুফিয়ান ভিন্ন পথে অগ্রসর হলো এবং হিজাযের সীমানায় প্রবেশ করে যামযাম বিন উমর নামক এক বিচক্ষণ ও দ্রুতগামী দূতকে অনেক সম্পদের বিনিময়ে মক্কার সরদারের নিকট এই মর্মে সংবাদ দিয়ে পাঠালো যে, ব্যবসায়ী কাফেলা মুসলিম ফৌজ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। অনতি বিলম্বে ব্যবস্থা নিন।

যামযাম বিন উমর ব্যবসায়ী কাফেলার আশঙ্কা বুঝানোর জন্য ঐ সময়ের বিশেষ রীতি অনুযায়ী মক্কায় প্রবেশের পূর্বে নিজ উটের নাক-কান কেটে দিল এবং পরিধেয় বস্ত্র অগ্র-পশ্চাৎ থেকে ছিঁড়ে ফেললো। আর উটের হাওদা উল্টিয়ে উটের পিঠে রেখে দিল। যখন সে এই অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করলো, তখন মুহূর্তে তার সংবাদ মক্কার অলিগলিতে পৌঁছে গেল এবং তার নিকট বিস্তারিত খবর শোনার পর কুরাইশের শত শত যুবক মুসলিমদের হাত থেকে তাদের ব্যবসায়ী কাফেলা রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

কুরাইশের সামর্থ্যবানরা নিজেরাই যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। আর যারা দুর্বল বা সমস্যাগ্রস্ত ছিল, তারা নিজেদের পক্ষ থেকে আরেকজনকে পাঠানোর ব্যবস্থা করলো। মাত্র তিন দিনের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনীয় যুদ্ধসামগ্রী নিয়ে হাজার সৈনিকের একটি দল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। তাদের মধ্যে ছিল এক হাজার যোদ্ধা, দুইশত ঘোড়া এবং ছয়শত উট ও বাদক দল।

এসব নিয়ে কাফের বাহিনী মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করলো। প্রত্যেক মনযিলে (ষোল মাইলে এক মনযিল) এ বাহিনীর খাবারের জন্য দশটি করে উট জবাই করতে হতো।

এ যুদ্ধে যেতে যে-ই পিছপা হচ্ছিল, কুরাইশ-সরদার তাকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। তা ছাড়া যেসব লোকের ব্যাপারে কুরাইশদের ধারণা ছিল, তারা মুসলিমদের সহমর্মী এবং ঐসব মুসলমান, যারা বিভিন্ন ওজরের কারণে তখনও পর্যন্ত হিজরত করতে পারেননি, তাদের এবং বনী হাশেমের মধ্য থেকে যার ব্যাপারে সামান্য ধারণা হলো যে, সে মুসলিমদের ব্যাপারে নরম মনোভাব রাখে, তাদেরও জোরপূর্বক এই যুদ্ধে শরীক করে নেওয়া হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস রা. এবং আবু তালিবের দুই ছেলে তালিব ও আকিল এই অপারগদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এ দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু একটি ব্যবসায়ী কাফেলাকে ধাওয়া করার প্রস্তুতির নিয়তে রমাযানের ১২ তারিখে মদীনা থেকে বের হয়েছেন। মক্কার কাফেরদের পূর্ণ যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা তারা জানতেন না, তাই তাদের মোকাবেলায় পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ প্রস্তুতি তাদের ছিল না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩১৩ জন সাহাবীকে নিয়ে কয়েক মনযিল পথ অতিক্রম করে বদরের নিকটবর্তী একস্থানে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে আবু সুফিয়ানের কাফেলার সংবাদ নেওয়ার জন্য দুই ব্যক্তিকে পাঠালেন। গুপ্তচররা এই সংবাদ নিয়ে এলেন যে, মুসলিমদের পিছু ধাওয়া করার সংবাদ পেয়ে আবু সুফিয়ান সমুদ্র সৈকতের পথ ধরে মক্কায় পৌঁছে গেছে আর মক্কা থেকে এক হাজারের এক বাহিনী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মদীনার দিকে আসছে।

গুপ্তচরের এ সংবাদ পরিস্থিতি পাল্টে দিলো। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়েকেরামের সাথে পরামর্শে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কুরাইশদের আগত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করবো নাকি তাদের এড়িয়ে যাবো?

হযরত আবু আইয়ুব আনসারীসহ কয়েকজন সাহাবী বললেন, তাদের সাথে যুদ্ধ করার মতো সামর্থ্য বর্তমানে আমাদের নেই। তাছাড়া আমরা সমরাস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার নিয়তে বা সেই রকম প্রস্তুতি নিয়ে বের হইনি।

তাদের কথা শেষ হওয়ার পর হযরত আবুবকর রা. দাঁড়ালেন এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে যে কোনো হুকুম বাস্তবায়নের জন্য নিজেকে পেশ করলেন। এরপর হযরত উমর রা. ও যে কোন নির্দেশ পালনের জন্য নিজেদের মানসিক প্রস্তুতির কথা জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথা শুনে খুশি হলেন এবং তাদের জন্য দু‘আ করলেন।

কিন্তু তখন পর্যন্ত আনসারী সাহাবীগণের পক্ষ থেকে যুদ্ধের জন্য সম্মতিসূচক কোন কথা পাওয়া যায়নি। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বললেন, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, এ জিহাদে অগ্রসর হবো, নাকি হবো না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলত আনসারী সাহাবীগণকে লক্ষ্য করেই এ কথা বলেছিলেন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আনসারদের সরদার সাদ বিন মুয়ায রা. বললেন, আল্লাহর রাসূল, আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং এ সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি যা বলেন তা সব সত্য ও সঠিক। আর আমরা আনসারীগণ আপনার সাথে এই অঙ্গীকার করেছি যে, আমরা সর্বাবস্থায় আপনাকে মান্য করবো। অতএব, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে হুকুম দিয়েছেন, তা আপনি নিশ্চিন্তে জারি করুন। শপথ ঐ সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যদি আপনি আমাদের উত্তাল সমুদ্রতরঙ্গে ঝাঁপ দিতে বলেন, তবু আমরা পিছপা হবো না। কালই যদি আপনি আমাদের শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন, তবু আমাদের কোন দ্বিধা থাকবে না। আমরা আশা করছি, আল্লাহ তা'আলা আমাদের দ্বারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করবেন, যা দেখে আপনার চক্ষু শীতল হবে। আপনি যেখানে চান আমাদের নিয়ে চলুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ রা. এর দৃপ্তকণ্ঠের আত্মপ্রত্যয়ী কথা শুনে দারুণ খুশি হলেন। কাফেলাকে হুকুম দিলেন, আল্লাহর নামে সামনে অগ্রসর হও। আর সাহাবীগণকে এ সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা দুই দলের (আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়ী কাফেলা ও আবু জাহেলের নেতৃত্বাধীন কুরাইশ সেনাবাহিনীর) মধ্য থেকে যেকোনো একটির উপর বিজয় দানের ওয়াদা করেছেন। (তাফসীরে মারিফুল কুরআন, ৪/১৮৭)

উক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আয়াতে বর্ণিত 'আর মুমিনদের একটি দল অপছন্দ করছিল'- এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হযরত আবু আইয়ূব আনসারীসহ কিছু সাহাবীর পূর্ণ যুদ্ধপ্রস্তুতি না থাকায় এতে অমত পোষণ করা। আর এ বিষয়টিই পরবর্তী আয়াতে 'তারা আপনার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে' দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

যদিও সাহাবীগণ কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ করেননি, কিন্তু যুদ্ধের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানশা বা ইচ্ছা বুঝার পরও তার ইচ্ছার বিপরীত খেয়াল প্রকাশ করা সাহাবায়েকেরামের উঁচু মর্যাদা অনুযায়ী হয়নি। তাই এক্ষেত্রে তাদের এই অবস্থাকেই বিবাদ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। (তাফসীরে মারিফুল কুরআন, ৪/১৮৭)

সেসময় মুসলমানগণ আল্লাহ তা‘আলার নিকট নিজেদের সংখ্যা স্বল্পতা, যুদ্ধাস্ত্রের অপ্রতুলতা এবং শত্রুবাহিনীর সংখ্যাধিক্যের ফরিয়াদ করলে আল্লাহ তা‘আলা জানিয়ে দেন, আমি তোমাদের এমন এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবো, যারা যুদ্ধের ময়দানে ধারাবাহিকভাবে নামবে। উল্লিখিত আয়াতসমূহে এসব বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনশ’ তের জন সাহাবীকে নিয়ে কয়েক মনযিল পথ অতিক্রম করে বদরের নিকটবর্তী এক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে আবু সুফিয়ানের কাফেলার সংবাদ নেওয়ার জন্য দুই ব্যক্তিকে পাঠালেন। গুপ্তচরদ্বয় এই সংবাদ নিয়ে এলেন যে, মুসলিমদের পিছু ধাওয়ার সংবাদ পেয়ে আবু সুফিয়ান সমুদ্রসৈকতের পথ ধরে মক্কায় পৌঁছে গেছে আর মক্কা থেকে এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী মুসলিমদেরবিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মদীনার দিকে আসছে।

এভাবে শেষ পর্যন্ত মক্কার কাফেরদের সাথে যুদ্ধ অবধারিত হয়ে যায়। পূর্বপ্রস্তুতি না থাকা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার ও মুহাজির সাহাবায়ে কেরামের সাথে মশওয়ারা করে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মুসলিমদের পূর্বেই মক্কার মুশরিকবাহিনী বদর নামক স্থানে পৌঁছে তুলনামূলক উঁচু ও শক্ত স্থানে শিবির স্থাপন করলো। পানির কূপগুলো তাদের কাছাকাছি ছিল। মুসলিম ফৌজ সেখানে পৌঁছে তুলনামূলক নিম্নভূমিতে শিবির স্থাপনে বাধ্য হলো। অবশ্য মুসলিম ফৌজ প্রথমে যেখানে শিবির স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিল, হযরত হুবাব ইবনুল মুনযির রা. এর পরামর্শে সেখান থেকে আরেকটু এগিয়ে মুশরিক বাহিনীর দখলকৃত দুই-একটা কূপ ছিনিয়ে নিয়ে শিবির স্থাপন করলো।

শিবির স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর হযরত সাদ বিন মুয়ায রা. বললেন, আল্লাহর রাসূল, আমাদের মন চায়, আমরা আপনার জন্য নিরাপদ কোন স্থানে একটি ঝুপড়ি তৈরি করে দিই, যেখানে আপনি অবস্থান করবেন এবং আপনার বাহন-জন্তুও তার আশপাশে থাকবে। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুমতি দিলেন। ঝুপড়ি তৈরি করা হলো। হযরত আবুবকর সিদ্দিক রা. ছাড়া সেখানে অন্য কারো প্রবেশের অনুমতি ছিল না। হযরত মুয়ায রা. নাঙ্গা তরবারি হাতে ঝুপড়ির দরজায় পাহারায় নিযুক্ত হন।

যুদ্ধের পূর্বের রাত। তিনশ’ তের জন অস্ত্রহীন মুজাহিদের মোকাবেলায় এক হাজার সশস্ত্র কাফের প্রস্তুত। রণাঙ্গনের শক্ত ও চলাচলের জন্য অধিক উপযোগী স্থানটাও শত্রুসেনাদের

দখলে। নিজেদের শিবির বালুময় নরম ভূমির উপর, যেখানে চলাচল অত্যন্ত কষ্টকর। স্বভাবতই মুসলমানগণ অত্যন্ত পেরেশান। কাউকে তো শয়তান এই ওয়াসওয়াসাও দিল যে, তোমরা নিজেদের হকের উপর প্রতিষ্ঠিত মনে করো। অথচ এই নিশুতি রাতে আরাম করার পরিবর্তে তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য ইবাদতে লিপ্ত রয়েছ, তা সত্ত্বেও দুশমনের অবস্থা সর্বদিক দিয়ে তোমাদের তুলনায় অনেক ভাল।

পেরেশানীর কারণে কারো ঘুম আসছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমতে সবার উপর ঘুম চাপিয়ে দিলেন। তাই ঘুমাতে না চাওয়া সত্ত্বেও তারা ঘুমাতে বাধ্য হয়েছিলেন। হযরত আলী রা. বলেন, গাযওয়ায়ে বদরের রাতে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আমাদের প্রত্যেকেই ঘুমিয়ে ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারারাত তাহাজ্জুদে মশগুল ছিলেন। (তাফসীরে মারিফুল কুরআন, ৪/১৯৫)

যুদ্ধের ময়দানের এমন ঘুম বা তন্দ্রার ব্যাপারে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, 'যুদ্ধের ময়দানে তন্দ্রা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ আসে। আর নামাযের মধ্যে তন্দ্রা আসে শয়তানের পক্ষ থেকে।' (তাফসীরে মারিফুল কুরআন, ৪/১৯৫)

ঐ রাতে মুজাহিদদের জন্য আরেকটি নিয়ামত এই ছিল যে, মুসলিমদের অনুকূলে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এমন বৃষ্টি, যা একদিকে যেমন রণাঙ্গনের নকশা পাল্টে দেয়, অন্যদিকে তার বরকতে মুসলিম ফৌজের অন্তর থেকে সব ধরনের শয়তানি ওয়াসওয়াসা দূরীভূত হয়। সেই বৃষ্টি শত্রু শিবিরে খুব বেশি পরিমাণে হয়। এতে তাদের শক্ত ভূমি কর্দমাক্ত হয়ে চলাফেরা করা দুঃসাধ্য হয়ে যায়। অপরদিকে মুসলিম শিবিরে অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হয়। যার ফলে বালু জমে গিয়ে চলাফেরা খুব সহজ হয়ে যায়।

এসব নিয়ামতের কথা আল্লাহ তা'আলা নিম্মোক্ত আয়াতে উল্লেখ করেছেন,

اذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ امَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ
وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ○

স্মরণ করো, যখন তিনি তার পক্ষ থেকে প্রশান্তিস্বরূপ তোমাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর পানি নাযিল করেন, যেন তার মাধ্যমে তোমাদের পবিত্র করেন এবং তোমাদের থেকে শয়তানের নাপাকি (কুমন্ত্রণা) দূর করে দেন, আর তোমাদের অন্তরে দৃঢ়তা তৈরি করেন এবং তার মাধ্যমে তোমাদের পা স্থির করে দেন। (সূরা আনফাল, আয়াত:১১)

এর পরবর্তী আয়াতে আরেকটি নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা মুসলিমদের উহুদ যুদ্ধের সময়ও দেওয়া হয়েছিল। তা হলো, যুদ্ধের ময়দানে ফেরেশতাদের মাধ্যমে মুসলিমদের সাহায্য প্রদান। আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে মুজাহিদদের সাহায্যের জন্য পাঠানো ফেরেশতাদের সম্পর্কে বলেন,

اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ سَاُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ○

স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদের ওহীর মাধ্যমে হুকুম দিলেন, আমি তোমাদের সাথে আছি, কাজেই তোমরা মুমিনদের দৃঢ়পদ রাখো। আমি অবশ্যই কাফেরদের মনে ভীতি সঞ্চার করবো। সুতরাং তোমরা তাদের ঘাড়ের উপর আঘাত করো এবং তাদের মধ্য থেকে আঙুলের জোড়াসমূহে আঘাত করো। (সূরা আনফাল, আয়াত:১২)
এখানে ফেরেশতাদের দুটি দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এক. মুসলিমদের সাহস বৃদ্ধি করে ময়দানে দৃঢ় রাখা। দুই. কিতালে অংশগ্রহণ করা। ফেরেশতাগণ এ উভয় কাজই সুচারুরূপে আনজাম দিয়েছিলেন।

এই যুদ্ধ মূলত কুফর ও ইসলামের মধ্যকার যুদ্ধ ছিল। কাফেরদের আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতাই এ যুদ্ধের মূল কারণ ছিল। সে জন্য এ যুদ্ধের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতা করে, তাদের পরিণাম তেমন শোচনীয়ই হয়ে থাকে, যেমনটি মক্কার কাফেরদের হয়েছিল। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ○ ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَ اَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ○

তা এ জন্য যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে। আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন আযাবদানকারী। সুতরাং এর মজা ভোগ করো। নিশ্চয়ই কাফেরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। (সূরা আনফাল, আয়াত:১৩-১৪)

সকালবেলা উভয়দল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। টিলার আড়াল থেকে কুরাইশ সৈন্যরা বের হয়ে এলো। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সহস্রাধিক কুরাইশ সৈন্য রণাঙ্গনে সদম্ভে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে

গেল। লৌহবর্মে আচ্ছাদিত শতাধিক অশ্বারোহী সেনাপতির হুকুমের প্রতীক্ষা করতে লাগলো। সেনাপতি ও কবিরা কুরাইশ জোয়ানদের মুসলিম মুজাহিদদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগলো।

অপরপক্ষে মুসলিমদের মাত্র ৩১৩ জন পদাতিক মুজাহিদ ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে ময়দানের অপরপ্রান্তে সমবেত। অস্ত্র ও বাহ্যিক সরঞ্জামের দিক দিয়েও তারা অত্যন্ত দুর্বল। তবু তারা ভীত নন। কারণ, আল্লাহ তা'আলার উপর তাদের অটল বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তাদের অবশ্যই জয়ী করবেন। আল্লাহর সাহায্য তাদের সাথে আছে। আল্লাহর উপর এ বিশ্বাস ও ভরসাই তাদের মূল শক্তি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন, আয় আল্লাহ, বিজয়ের যে ওয়াদা আপনি আমার সাথে করেছেন, তা আজ পূর্ণ করুন। দু'আ শেষে জিবরাইল আলাইহিস সালামের পরামর্শে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন মুষ্টি বালু ও কংকর নিয়ে কাফেরদের ডানে-বায়ে ও মধ্যখানে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতে বালুর কণাগুলো কাফেরদের চোখে ঢুকিয়ে দিলেন। এ ঘটনার বর্ণনা নিম্মোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ

(হে নবী,) আপনি যখন (মাটি) নিক্ষেপ করেছেন, তখন তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন। (সূরা আনফাল, আয়াত:১৭)

চোখে বালুকণা ঢুকায় শত্রু সেনারা ভড়কে গিয়ে শোরগোল শুরু করে দিল। এ সুযোগে মুজাহিদগণ শত্রুবাহিনীর উপর ব্যাপক হামলা শুরু করেন। ফেরেশতাগণও মুজাহিদদের সাথে যোগ দিলেন। শত্রু সেনাদের বাহিনী প্রধান আবু জাহেল সহ সত্তরজন নিহত হলো এবং সত্তরজন বন্দি হলো। অন্যরা পালিয়ে জান বাঁচালো।

কুরাইশী বাহিনী মক্কা থেকে বের হওয়ার পূর্বে উক্ত বাহিনীর প্রধান আবু জাহেল কাবা শরীফের গিলাফ ধরে দু'আ করেছিল। দু'আর মধ্যে সে বলেছিল, 'আয় আল্লাহ, দুই লশকরের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ, হেদায়েতপ্রাপ্ত, ভদ্র এবং যাদের ধর্ম উত্তম, তাদের বিজয় দান করুন।'

আবু জাহেল মনে করেছিল, মুসলিমদের তুলনায় তারাই সবদিক দিয়ে উত্তম। তাই সে হক ও বাতিলের মধ্যে ফায়সালার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার উপর ন্যস্ত করলো। সে ভেবেছিল, যেহেতু তারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই বিজয় তাদেরই হবে। আল্লাহর তা'আলার কাছে হক ও বাতিলের মধ্যে ফায়সালার সিদ্ধান্ত প্রার্থনার উক্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَ اِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ اِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ○

(হে কাফেররা,) যদি তোমরা মীমাংসা কামনা করো, তবে নিঃসন্দেহে মীমাংসা তোমাদের নিকট এসে গেছে। এখন যদি তোমরা নিবৃত্ত হও, তবে তা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। আর যদি পুনরাবৃত্তি করো, তা হলে আমরাও পুনরাবৃত্তি করবো। তোমাদের দল তোমাদের কোন কাজে আসবে না, তা যত বেশিই হোক। জেনে রেখো, আল্লাহ মুমিনদের সাথে আছেন। (সূরা আনফাল, আয়াত:১৯)

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সত্য-মিথ্যার মীমাংসা নির্ণয় করে দিয়েছেন- ঈমানদারদের পথই হলো সত্য পথ এবং কাফেরদের পথ হলো মিথ্যা। তাই আল্লাহ তা'আলা ঈমানদের সাথে আছেন। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের বিজয়ী করবেন, কাফেরদের দলবল যত বেশিই হোক। অতএব, কাফেররা সর্বশক্তি নিয়োগ করেও দুনিয়ার বুক থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত দীন ইসলাম নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না। বরং ইসলামের নূরকে আল্লাহ তা'আলা পূর্ণতায় পৌঁছাবেন।

বদর যুদ্ধের এই অভাবনীয় ফল লাভের মধ্যে যেমনিভাবে কাফেরদের জন্য শিক্ষা রয়েছে, তেমনি মুমিনদের জন্য রয়েছে উপদেশ। তা হলো, মুমিনদের বিজয়ের জন্য সেনাবাহিনীর সংখ্যার আধিক্য কিংবা অস্ত্রশস্ত্রের চাকচিক্য শর্ত নয়, বরং মুমিনদের বিজয়ের জন্য শর্ত হলো, তাদের খাঁটি মুমিন হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ○

হীনম্মন্য হয়ো না এবং পেরেশানী করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত:১৩৯)

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যতদিন মুসলিম উম্মাহ আল্লাহ তা‘আলার খাঁটি ঈমান ধারণ করে তার উপর তাওয়াক্কুল করবে, ততদিন তারা বিজয়ী হবে। তখন কাফেরদের পারমাণবিক বোমাও মুসলিমদের পরাজিত করতে পারবে না। কাফের-বেদীনদের মোকাবেলায় মুসলিম বাহিনীর বিজয় অর্জনের এটাই চাবিকাঠি।

তায়েফের ঘটনা

অল্প সময়ের ব্যবধানে খাদীজা (রাঃ) ও আবু তালেবের মৃত্যুর পর মূর্খ কুরাইশরা রসূল (ﷺ) এর উপর প্রকাশ্যে নির্যাতন শুরু করল। তাই তিনি এই আশায় তায়েফ গমণ করলেন যে, তায়েফবাসী হয়ত তাঁকে আশ্রয় দিবে এবং সাহায্য করবে। তায়েফ গিয়ে তিনি সেখানকার অধিবাসীদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করলেন। কিন্তু তিনি সেখানে কোন সাহায্যকারী পেলেন না এবং তাকে কেউ আশ্রয়ও দিল না। এমনকি একজন লোকও তাঁর দাওয়াত কবুল করল না। বরং তারা তাঁকে আরও বেশী কষ্ট দিল। এত কষ্ট তিনি ইতিপূর্বে তাঁর জাতির লোকদের থেকেও ভোগ করেন নি। তাঁর সাথে ছিলেন তাঁরই মুক্ত করা ক্রীতদাস যায়েদ ইবনে হারেসা। রসূল (ﷺ) তায়েফে দশ দিন অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি তায়েফের সকল গোত্রীয় সর্দারদের কাছে গমণ করেন এবং প্রত্যেককে দ্বীনের দাওয়াত দেন। কিন্তু সবাই একই কথা বলল যে, তুমি আমাদের শহর থেকে বেরিয়ে যাও। শুধু এ কথা বলেই ক্ষান্ত হয় নি; বরং তারা দুষ্ট বালকদের তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। ফেরার পথে তায়েফের মূর্খ ও দুষ্টরা তাঁর পিছে লাগল। তারা আল্লাহর রসূলকে গালি দিচ্ছিল, তাঁর পিছনে হৈ চৈ করছিল এবং পাথর নিক্ষেপ করছিল। পাথরের আঘাতে তাঁর শরীর থেকে রক্ত ঝরে পায়ের জুতা দু’টি লাল হয়ে গেল। যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) প্রিয় নাবীকে রক্ষা করছিলেন। একটি পাথর এসে তাঁর মাথায় লেগে গেল। এতে তাঁর মাথা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল।

নাবী (ﷺ) তায়েফ থেকে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে মক্কায় ফেরত আসলেন। ফেরার পথে তিনি আল্লাহর দরবারে এই প্রসিদ্ধ দু’আটি করলেন-

اللّٰهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِى، وَقِلَّةَ حِيلَتِى وهَوَانى عَلَى النَّاس يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وأَنْتَ رَبِّى إِلَى مَنْ تَكِلُنِى إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِى؟ أَوْ إِلى عَدوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِى، إنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَىَّ فَلاَ أُبَالِى، غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ هِى أَوْسَعُ لى، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِى أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنيا وَالآخِرَةِ أَنْ يَحِلَّ عَلَىَّ غَضَبُكَ أَوْ أَنْ يَنْزِلَ بى سَخَطُك، لك الْعُتبى حَتَّى تَرْضَى وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلا بِكَ

“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে স্বীয় দুর্বলতা, (মানুষকে বুঝাতে) আমার কলা-কৌশলের স্বল্পতা এবং মানুষের কাছে আমার মূল্যহীনতার অভিযোগ করছি। হে সর্বাধিক দয়ালু! তুমি দুর্বলদের প্রভু, আমারও প্রভু। তুমি আমাকে কার কাছে ন্যস্ত করছ? তুমি কি আমাকে দূরের

এমন অচেনা কারও হাতে ন্যস্ত করছ, যে আমার সাথে কঠোর ব্যবহার করবে? নাকি কোন শত্রুর হাতে সোপর্দ করছ, যাকে তুমি আমার বিষয়ের মালিক করে দিয়েছ? তুমি যদি আমার উপর রসূান্বিত না হও তাহলে আমি কোন কিছুই পরওয়া করিনা। তবে নিঃসন্দেহে তোমার ক্ষমা আমার জন্য সর্বাধিক প্রশস্ত ও প্রসারিত। আমি তোমার সেই চেহারার আলোর আশ্রয় চাই, যা দ্বারা অন্ধকার দূরিভূত হয়ে যায় এবং যা দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতের সকল বিষয় সংশোধন হয়। এই কথার মাধ্যমে আমার উপর তোমার ক্রোধা নেমে আসা হতে অথবা আমার উপর তোমার অসন্তুষ্টি নাযিল হওয়া থেকে তোমার আশ্রয় চাই। তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই আমার সকল প্রচেষ্টা। তোমার সাহায্য ব্যতীত অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় এবং তোমার তাওফীক ও শক্তি ছাড়া তোমার আনুগত্য করা অসম্ভব"।[1]

ফেরার পথে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিস্তা প্রেরণ করলেন। ফিরিস্তা তাঁর কাছে তায়েফবাসীদের উপর মক্কার বড় দু'টি পাহাড় নিক্ষেপ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার অনুমতি চাইলেন। উত্তরে নাবী (ﷺ) বললেন বরং আমি চাই আল্লাহ তাদের বংশধর হতে এমন মানুষ সৃষ্টি করবেন যারা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবেনা।

'ওয়াদীয়ে নাখলা' নামক জায়গায় এসে কয়েক দিন অতিবাহিত করলেন। তিনি রাত্রে সেখানে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করছিলেন। তখন আল্লাহ রাববুল আলামীন জিনদের একটি দল তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। তারা নাবী (ﷺ) এর কুরআন তিলাওয়াত শুনল। কুরআনের এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি তাদের আগমণ সম্পর্কে অবগত হতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنْ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ

"স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন আমি তোমার প্রতি প্রেরণ করেছিলাম একদল জিনকে। যারা কুরআন পাঠ শুনছিল। যখন ওরা তার নিকট উপস্থিত হলো, ওরা একে অপরকে বলতে লাগল- চুপ করে শ্রবণ কর। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল ওরা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল, এক একজন সতর্ককারীরূপে"। (সূরা আহকাফ-৪৬:২৯-৩১) আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন-

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا

“বলোঃ আমার প্রতি এই মর্মে অহী প্রেরিত হয়েছে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি”।[2] ‘নাখলা’ নামক জায়গায় কয়েকদিন অতিবাহিত করার পর যায়েদ তাঁকে বললেন- মক্কার কুরাইশরা আপনাকে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছে। এখন আপনি কিভাবে সেখানে প্রবেশ করবেন? তিনি বললেন- হে যায়েদ! তুমি যেই মসীবত প্রত্যক্ষ করছ, আল্লাহ্ তা‘আলা তা অবশ্যই বিদূরিত করবেন, তিনি তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করবেন এবং তাঁর নাবীকে সাহায্য করবেন।

মক্কার নিকটবর্তী হয়ে তিনি খোযা’আ গোত্রের একজন লোকের মাধ্যমে মুতইম বিন আদীর কাছে আশ্রয় চাইলেন। তিনি মুতইমকে বললেন- আমি তোমার আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে চাই। সে রাজী হল এবং ঘোষণা দিল যে, আমি মুহাম্মাদকে আশ্রয় দিচ্ছি। সে তার ছেলেদেরকে ডেকে বলল- তোমরা অস্ত্র হাতে নাও এবং কাবার চারপাশে দাঁড়িয়ে যাও। আমি মুহাম্মাদকে আশ্রয় দিচ্ছি। যায়েদকে সাথে নিয়ে তিনি মুতইম বিন আদীর আশ্রয়ে কাবায় প্রবেশ করলেন। মুতইম বিন আদী স্বীয় বাহনের উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিল যে, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি মুহাম্মাদকে আশ্রয় দিয়েছি। সুতরাং কেউ যেন তাঁর উপর আক্রমন না করে।
অতঃপর নাবী (ﷺ) হাজরে আসওয়াদের কাছে গিয়ে তাতে চুম্বন করলেন এবং দু’রাকাত সলাত আদায় করলেন। মুতইম বিন আদী এবং তার ছেলেরা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নাবী (ﷺ) কে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলেন।[3]

[1]. সীরাতে ইবনে হিশাম, ইমাম আলবানী রহঃ) এই বর্ণনাটিকে যঈফ বলেছেন। ফিকহুস্ সীরাতঃ (১/১২৫)।

[2] . সূরা জিন-৭২:১

[3]. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতইমের এই উপকার কখনও ভুলতে পারেন নি। বদর যুদ্ধের দিন বন্দীদের ব্যাপারে আলোচনা চলার সময় তিনি বললেনঃ মুতইম বিন আদী যদি আজ জীবিত থাকতো এবং এই পঁচা লোকদের (কাফেরদের) ব্যাপারে শাফায়া’ত করতো তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দিতাম। (বুখারী)

মক্কা বিজয়

ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়

পবিত্র কুরআনে কারীমে সূরা ফাতহে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

انَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُّبِيْنًا

'হে রাসূল! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি।'(সূরা ফাতহ, আয়াত:১)

সূরা ফাতহের এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামকে ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের পূর্বসুসংবাদ প্রদান করেছেন। যে বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দীনকে, তার রাসূলকে এবং মুমিন বান্দাদেরকে সম্মানিত করেছেন। যে বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব মানবতার হেদায়াতের প্রাণকেন্দ্র বাইতুল্লাহকে কুফর ও শিরক থেকে মুক্ত করেছেন। তাই ইসলামী ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিজয় ছিল একটি "ঐতিহাসিক বিজয়"!

মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপট

ষষ্ঠ হিজরী জিলক্বদ মাসে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌছার পর মক্কার কাফেররা তাতে বাঁধা প্রদান করে। পরিশেষে দু'পক্ষের মাঝে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতিহাসে যাকে "হুদাইবিয়ার সন্ধি" নামে আখ্যায়িত করা হয়। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৪৩)

হুদাইবিয়ার এই সন্ধি চুক্তির ধারাগুলো বাহ্যিকভাবে ছিল সম্পূর্ণরূপে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী। কিন্তু প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা আপাত দৃষ্টিতে নীতিগত এই পরাজয়কেই ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট বিজয় আখ্যায়িত করেছিলেন। এবং এ হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকেই রচিত হয়েছিল মক্কা বিজয়ের মূল প্রেক্ষাপট।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

كَانَتْ صُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ مُقَدِّمَةً وَتَوْطِئَةً بَيْنَ يَدَيْ هَذَا الْفَتْحِ الْعَظِيمِ، امِنَ النَّاسُ بِهِ وَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَنَاظَرَهُ فِي الْاسْلَامِ وَتَمَكَّنَ مَنِ اخْتَفَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِمَكَّةَ مِنْ اظْهَارِ دِينِهِ، وَالدَّعْوَةِ الَيْهِ، وَالْمُنَاظَرَةِ عَلَيْهِ، وَدَخَلَ بِسَبَبِهِ بَشَرٌ كَثِيرٌ فِي الْاسْلَامِ، وَلِهَذَا سَمَّاهُ اللهُ فَتْحًا فِي قَوْلِهِ} :انَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا{

হুদাইবিয়ার সন্ধি মূলতঃ ছিল মহান মক্কা বিজয়ের ভূমিকা। এ সন্ধির মাধ্যমে মানুষের জান-মালে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। কাফের-মুসলমান পারস্পরিক মতবিনিময় ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আদান-প্রদানের সুযোগ তৈরি হয়। মক্কায় আত্মগোপনে থাকা মুসলমানরা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করে। ব্যাপকভাবে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা এ সন্ধি চুক্তিকে 'সুস্পষ্ট বিজয়' আখ্যায়িত করেছেন'। (যাদুল মা'আদ, ৩:৩৬৯)

তবে হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর প্রাথমিক পর্যায়ে বাহ্য দৃষ্টিতে তা নীতিগত পরাজয় মনে হওয়ায় সাহাবায়ে কেরামের জন্যও তা মেনে নেওয়া কষ্টকর ছিলো।

বীর সাহাবী হযরত উমর ফারুক রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুযোগ করে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সত্যের উপর আর কাফেররা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, এ কথা কি সঠিক নয়? নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই সঠিক! হযরত উমর রা. পুনরায় জিজ্ঞাস করলেন, আমাদের শহীদরা জান্নাতী আর তাদের মৃতরা জাহান্নামী, এ বিশ্বাসও কি নির্ভুল নয়? নবীজী বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই! এরপর উমর রা. বললেন, তবে কেন আমরা আমাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে এমন পরাজয়মূলক শর্ত মেনে নেব? নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

،«يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، انِّي رَسُولُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ ابَدًا»

'হে খাত্তাবের পুত্র! নিশ্চয় আমি আল্লাহর রাসূল! কাজেই আল্লাহ তা'আলা কখনোই আমাকে ধ্বংস করবেন না!...

এরপর যখন উপরোক্ত আয়াত সহ সূরা ফাৎহ অবতীর্ণ হলো, তখন উমর রা. তা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, 'সত্যিই কি এ পরাজয় বিজয়ে রূপান্তরিত হবে? নবীজী বললেন, "হ্যাঁ"। উমর রা. সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন।' (মুসলিম শরীফ, হা. নং ১৭৮৫)
পরবর্তীতে সকল সাহাবায়ে কেরামই বুঝতে পেরেছিলেন যে, মক্কা বিজয়ের পটভূমি রচিত হয়েছে এই হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি থেকেই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

.انَّكُمْ تَعُدُّونَ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ، وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ صُلْحَ الْحُدَيْبِيَةِ

‘তোমরা ফাতহে মক্কাকে ফাৎহ (বিজয়) মনে কর, অথচ আমরা (সাহাবায়ে কেরাম) তো হুদাইবিয়ার সন্ধিকেই ফাৎহ মনে করতাম। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা ফাতহ, আয়াত:১)

পরাজয় যেভাবে বিজয়ে রূপান্তরিত হলো

হুদাইবিয়ার সন্ধি মুসলমানদের জন্য বাহ্যিকভাবে যদিও পরাজয়মূলক ছিল, কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে তাতে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য চূড়ান্ত বিজয় তথা মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল। মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. তার “আস সীরাতুন্নবিয়্যাহ” গ্রন্থে হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রেক্ষাপট রচনার বিশদ বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন। যার কয়েকটি নিম্নরুপ:

১. নবশক্তির উত্থান

এ চুক্তির মাধ্যমে ইসলাম ‘জাযীরাতুল আরবে’ এক নবশক্তিরূপে এমনভাবে আবির্ভূত হলো যে, সমগ্র আরব তাদের শক্তির স্বীকৃতি দিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিল।

২. যুদ্ধবিরতী

এ চুক্তির মাধ্যমে সশস্ত্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ধারা বন্ধ হয়ে গেলো। মুসলমানরা নিশ্চিন্তে-নির্বিঘ্নে ইসলামের প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগের উন্মুক্ত সুযোগ পেয়ে গেলো।

৩. বিশ্ব দরবারে ইসলাম

হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তির পরই নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পারস্য, রোম সহ বিভিন্ন সম্রাজ্যের বাদশাহর নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র প্রেরণ করেন।

৪. মক্কার দূর্বল মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ

মক্কার যে সকল মুসলমান কোন অপারগতা বশত হিজরত করতে না পারার দরুণ অসহায়ত্বের জীবন অতিবাহিত করছিলো, এই সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে তারা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করলো।

৫. ইসলামের সৌন্দর্যের প্রচার-প্রসার

সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলে কাফেররা ইসলামের সৌন্দর্য কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়ে গেলো। ফলে ইসলামের নির্মল আলোয় তাদের হৃদয়াকাশ থেকে কুফর-শিরকের অন্ধকার দূর হয়ে যেতে লাগলো। এভাবে মক্কা বিজয়ের আগেই তারা ব্যাপকভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে লাগলো।

ইমাম যুহরী রহ. বলেন, "হুদাইবিয়ার সন্ধি পরবর্তী দু'বছরে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা পূর্ববর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যার তুলনায় বেশি ছিল!" ইবনে হিশাম রহ. বলেন, "ইমাম যুহরীর এ কথার প্রমাণ হলো, হুদাইবিয়া সন্ধির সময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪০০। আর মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১০,০০০ (দশ হাজার)!"

৬. খালেদ ইবনে ওলীদ রা. এর ইসলাম গ্রহণ

হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে ইসলাম গ্রহণকারী এ সকল নও মুসলিমের মধ্যে 'আল্লাহর তরবারী' খ্যাত হযরত খালেদ ইবনুল ওয়ালীদ রা. ও ছিলেন। যে তরবারী ইসলামের পক্ষে কখনো কোনো ময়দানে পরাজিত হয়নি! (আল ইসাবাহ, ২:২১৫; সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩:৩৩৭)

মক্কা বিজয়ের বাহ্যিক প্রেক্ষাপট:

কুরাইশ কর্তৃক হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ

মক্কা বিজয়ের মূল প্রেক্ষাপট হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে রচিত হলেও মক্কা অভিমুখে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনার জন্য একটি তাৎক্ষণিক উপলক্ষের প্রয়োজন ছিল। কুরাইশ কর্তৃক সন্ধি চুক্তি ভঙ্গের মাধ্যমে তা পূর্ণতা লাভ করে।

আল্লামা আইনী রহ. ফাতহে মক্কার এই বাহ্যিক প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে বলেন, 'মক্কার কুরাইশরা হুদাইবিয়ায় নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কৃত সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করেছিলো। এ খবর নবীজীর কাছে পৌঁছলে নবীজী মক্কা অভিমূখে অভিযান পরিচালনা করেন। (উমদাতুল কারী, ১২:২৬০)

হুদাইবিয়ার যুদ্ধ বিরতির চুক্তি অনুযায়ী কুরাইশদের জন্য মুসলমানদের সাথে কিংবা তাদের কোনো মিত্র গোত্রের সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া নিষিদ্ধ ছিলো। কিন্তু কুরাইশরা এ চুক্তি লঙ্ঘন করে ফেলে...।

হযরত ইকরামা রহ. বলেন, 'হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তির পর আরব গোত্র সমূহের মধ্য হতে বনু খুজাআ মুসলমানদের সাথে এবং বনু বকর কুরাইশদের সাথে মৈত্রি চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। বনু বকর আর বনু খুজাআর মধ্যে জাহিলী যামানা হতে সশস্ত্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত অব্যাহত ছিল। বনু বকর কুরাইশদের সহযোগিতায় পূর্ব শত্রুতার পরিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হলো। কুরাইশরাও তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করলো।'

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, বনু বকরের সরদার নওফেল ইবনে মু'আবিয়ার নেতৃত্বে 'ওতীর' নামক এক জলাশয়ের নিকট তারা বনু খুজাআর উপর হামলা করলো। বনু খুজাআ 'হারামের সীমানায় আশ্রয় নিলেও বনু বকর হারামের নিষিদ্ধতা উপেক্ষা করে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে গেলো।

ইবন সাদ রহ. বলেন, কুরাইশদের মধ্য হতে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা, হুয়াইতিব ইবনে আব্দুল উয্যা, মিকরাজ ইবনে হাফস প্রমূখ কাফের রণাঙ্গনে বনু বকরের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অবতীর্ণ হলো। ইমামে মাগাযী, মূসা ইবনে উকবা কুরাইশদের মধ্য হতে শাইবা ইবনে উসমান ও সাহল ইবনে আমর এর নামও উল্লেখ করেছেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৭; তাবাকাতে ইবনে সা'আদ, ২:৩১৬)

নবীজীর দরবারে বনু খুজাআর ফরিয়াদ

লড়াই শেষ হলে বনু খুজাআর একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় নবীজীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগমন করলো। ইবনে সা'দ রহ. এ প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে আমর ইবনে সালেম এর নাম উল্লেখ করেছেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৭; তাবাকাতে ইবনে সা'আদ, ২:৩১৭)

আমর ইবনে সালেম, বনু বকরের লড়াই এবং কুরাইশদের সহযোগিতা ও তাদের সন্ধি ভঙ্গের কথা দীর্ঘ এক কবিতায় আবেগঘন ভাষায় উপস্থাপন করেন। 'মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা'র উল্লিখিত বর্ণনায় উদ্ধৃত সে কবিতাসমূহের দুটি পংক্তি নিম্নরূপ..

يَا رَبُّ اِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدًا حِلْفَ اِبِينَا وَابِيهِ الْاَتْلَدَا

فَانْصُرْ هَدَاكَ اللهُ نَصْرًاايِّدَا وَادْعُ عِبَادَ اللهِ يَاتُوا مَدَدًا

‘হে আমার প্রতিপালক! আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই মৈত্রি চুক্তি স্বরণ করিয়ে দিচ্ছি, যা সম্পাদিত হয়েছিল আমাদের এবং তার পূর্ব পুরুষদের মাঝে।

(হে আল্লাহর রাসূল!) আমাদের সাহায্য করুন। এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে আহবান করুন, যাতে তারা সাহায্যের জন্য উপস্থিত হয়।’

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ফরিয়াদ শুনে বললেন,

نصرتياعمروبنسالم

হে আমর ইবনে সালেম! তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে। (ফাতহুল বারী, ৭:৬৩৫)

সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যামুরা রা. কে পত্র বাহক হিসেবে মক্কার কুরাইশদের নিকট এ মর্মে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, তারা যেন তিনটি প্রস্তাবের কোনো একটি গ্রহণ করে নেয়,

১. বনু খুজাআর নিহত ব্যক্তিদের রক্তপণ আদায় করে দিবে।

২. অথবা বনু বকরের সাথে কৃত মৈত্রি চুক্তি ভঙ্গ করে পৃথক হয়ে যাবে।

৩. কিংবা হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে দিবে।

পত্রবাহক যখন সংবাদ নিয়ে মক্কায় পৌঁছলো, তখন কুরাইশদের পক্ষ হতে কুরতা ইবনে আমর এ জবাব পাঠালো যে, আমরা হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গের জন্য তৈরি আছি। জবাব নিয়ে দূত রওয়ান হয়ে যাওয়ার পরক্ষণেই তাদের বোধদয় হলো এবং হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি নবায়নের জন্য তারা আবু সুফিয়ানকে মদীনায় প্রেরণ করলো। (ফাতহুল বারী, ৭:৬৪২)

কুরাইশদের সন্ধি নবায়ন প্রচেষ্টা

আবু সুফিয়ান মদীনায় এসে উপস্থিত হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বললেন,

قَدْ جَاءَكُمْ ابُو سُفْيَانَ وَسَيَرْجِعُ رَاضِيًا بِغَيْر حَاجَتِهِ

'তোমাদের নিকট আবু সুফিয়ান এসে উপস্থিত হচ্ছে। আর সে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েই ফিরে যাবে'। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৭)

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা !

আবু সুফিয়ান মদীনায় পৌছে প্রথমত তার কন্যা নবীজীর বিবি উম্মে হাবীবা রা. এর কাছে গেলেন।

উম্মে হাবীবা রা. এর নাম হলো 'রমলা'। মদীনায় হিজরতের আগে যখন মুসলমানরা হাবশায় হিজরত করেছিলেন তখন তাদের মধ্যে উম্মে হাবীবাও ছিলেন। হাবশায় থাকা অবস্থায় নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। হাবশার বাদশাহ 'নাজাশী' চারশত দীনারের মহর নিজের পক্ষ হতে আদায় করে দিয়ে উম্মে হাবীবা রা.কে নবীজীর সাথে বিয়ে দেন। (যাদুল মা'আদ, ১:১০৬)

আবু সুফিয়ান যখন উম্মে হাবীবার কাছে পৌঁছলেন, তখন উম্মে হাবীবা রা. পিতাকে দেখে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিছানা উঠিয়ে ফেললেন, যাতে পিতা নবীজীর বিছানায় বসতে না পারে। আবু সুফিয়ান কন্যার এ আচরণ দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে কন্যা! তুমি এ বিছানা কেন উঠিয়ে রাখলে? এ বিছানাকে আমার যোগ্য মনে করো না, নাকি আমাকে এ বিছানার যোগ্য মনে করো না? উম্মে হাবীবা রা.বললেন,

هُوَ فِرَاشِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَ مُشْرِكٌ نَجِسٌ، فَلَمْ احِبَّ انْ تَجْلِسَ عَلَى فِرَاشِهِ،

'এটা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা। আপনি তো মুশরিক, আর মুশরিক তো নাপাক হয়ে থাকে। কাজেই নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানার উপর কোনো নাপাক ব্যাক্তি বসবে এটা আমি কখনোই পছন্দ করবো না।'

আবু সুফিয়ান বললো, হে আমার মেয়ে! সত্যিই আমার থেকে বিচ্ছেদের পর তোমার মাঝে অনেক বিরূপ পরিবর্তন ঘটেছে!'

এরপর আবু সুফিয়ান নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে সন্ধি নবায়নের দাবি জানালেন। নবীজী কোনো জবাব দিলেন না। (যাদুল মা'আদ, ৩:৩৫০)

আবু সুফিয়ান, দরবারে নববী থেকে ব্যর্থ হয়ে একে একে আবু বকর রা. উমর রা. এর কাছে গেলেন। কিন্তু কেউই এ ব্যপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সুপারিশ করতে সম্মত হলেন না। পরিশেষে হযরত আলী রা. এর পরামর্শে এককভাবে মসজিদে নববীতে সন্ধি নবায়নের ঘোষণা দিয়ে মক্কায় চলে এলেন। কুরাইশরা আবু সুফিয়ানের আগমণের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলো। যখন তারা জানতে পারলো যে, আবু সুফিয়ান, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে সন্ধি নবায়নের কোনো প্রতিশ্রুতি ছাড়াই কেবল এককভাবে ঘোষণা দিয়ে চলে এসেছে, তখন তাকে অভিসম্পাত করে বললো,

وَاللهِ مَا رَايْنَا كَالْيَوْمِ وَافِدَ قَوْمٍ ,وَاللهِ مَا اتَيْتَنَا بِحَرْبٍ فَنَحْذَرَ ,وَلَا اتَيْتَنَا بِصُلْحٍ فَنَامَنَ

খোদার কসম! তোমার মত নির্বোধ কোনো প্রতিনিধি আমরা আগে কখনো দেখিনি। আল্লাহর শপথ! তুমি না যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে এসেছো যে, আমরা তার প্রস্তুতি নিতে পারি। আর না সন্ধির সুসংবাদ নিয়ে এসেছো যে, আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি! (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৭)

বিজয়াভিযানের প্রস্তুতি

আবু সুফিয়ান চলে যাওয়ার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যান্ত গোপনীয়তার সাথে অভিযানের প্রস্তুতির জন্য সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিলেন । এবং আম্মাজান আয়েশা রা. কে বললেন,

جَهِّزِينِي وَلَا تُعْلِمِنَّ بِذَلِكَ احَدًا

'আমার সফরের সরঞ্জাম প্রস্তুত করো। আর কাউকে এ ব্যাপারে কিছু জানিও না'।

কন্যা আয়েশা রা. এর প্রস্তুতি দেখে পিতা হযরত আবু বকর রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভিযানের কারণ জিজ্ঞেস করলে নবীজী বললেন,

انَّهُمْ اوَّلُ مَنْ غَدَرَ

নিশ্চয় কাফেররা [হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করে] সর্বপ্রথম গাদ্দারী করেছে! (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৫)

হাতেব ইবনে আবী বালতাআ রা. -এর চিঠি

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অভিযানের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেললেন, তখন সাহাবী হযরত হাতেব ইবনে আবী বালতাআ রা. এ অভিযানের সংবাদ সম্বলিত একটি চিঠি 'সারা' নাম্মী এক মহিলার মারফতে মক্কাবাসীর নিকট প্রেরণ করেন। মূসা ইবনে উকবা রহ. এর মতে এ মহিলাকে দশ দীনারের পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়েছিল।

চিঠির ভাষা ছিল,

اما بعد :يَا معشر قُرَيْش، فَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، جَاءَكُم بِجَيْش كالليل، يسير كالسيل، فوَاللَّه لَو جَاءَكُم وَحده نَصره الله عَلَيْكُم، وانجز لَهُ وعده، فانظروا لانفسكم وَالسَّلَام.

হে কুরাইশগণ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের নিকট এমন এক বাহিনী নিয়ে ধেয়ে আসছেন, যারা নিকষ রাতের মত [চারিদিক ছেয়ে ফেলবে], যাদের গতি হবে প্লাবনের স্রোতের ন্যায়। আল্লাহর কসম! যদি নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাই তোমাদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হন, তবুও আল্লাহ তা'আলা নিজ প্রতিশ্রুতি পূরণার্থে তাকে তোমাদের উপর বিজয়ী করবেন। সুতরাং তোমরা নিজেদের বাঁচানোর চিন্তা করো। সালাম। (ফাতহুল বারী, ৭:৬৩৫-৬৩৬)

বুখারী শরীফের বর্ণনায় এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে হাতেব রা. এর চিঠির ব্যাপারে অবগত হয়ে হযরত আলী রা., হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা., হযরত আবু মারছাদ রা. ও হযরত মিকদাদ রা. এ চারজন সাহাবীকে নির্দেশ প্রদান করলেন যে,

«انْطَلِقُوا حَتَّى تَاتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَانَّ بِهَا امْرَاةً مِنَ المُشْرِكِينَ، مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ ابِي بَلْتَعَةَ الَى المُشْرِكِينَ»

তোমরা বেরিয়ে পড়। "রওজায়ে খাখ" নামক স্থানে তোমরা মুশরিকদের প্রতি প্রেরিত হাতেবের চিঠি বহণকারিণী এক মুশরিক নারী কে পাবে...!

নবীজীর কথার সত্যতার উপর সাহাবায়ে কেরামের ঈমান!

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মত চার সাহাবী "রওজায়ে খাখ" নামক স্থানে গিয়ে সে মহিলাকে দেখতে পেয়ে ধরে ফেললো। এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো। মহিলা চিঠির কথা পুরোপুরি অস্বীকার করে বসলো। চার সাহাবী মহিলার প্রাথমিক তল্লাশী করে কোনো চিঠি খুঁজে পেলেন না। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের ঈমান তো ছিলো এমন যে, চোখের দেখা ভুল হতে পারে, কিন্তু নবীজীর কথা কখনোই অসত্য হতে পারে না। এ কারণেই তাঁরা মহিলাকে হুমকি দিয়ে বললেন,

مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَتُخْرِجِنَّ الكِتَابَ اوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ

'নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই অসত্য বলেননি। তুমি হয়তো চিঠি বের করে দেবে। আর না হয়তো আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করে তল্লাশী নিতে বাধ্য হবো'!

মহিলা বাধ্য হয়ে তার শরীরের পেছন দিকে [দেহের নিম্মাংশের পরিধেয় বস্ত্র] ইযার -এর মধ্যে গুজে রাখা মাথা হতে প্রলম্বিত চুলের বেণীর অগ্রভাগ থেকে চিঠি বের করে দিলো।

চার সাহাবী যখন চিঠি নিয়ে নবীজীর দরবারে পৌছলেন, তখন নবীজী হাতেবকে ডেকে চিঠির কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন।

হাতেব রা. বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার ব্যপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করবেন না। (আমি যা করেছি তার কারণ হলো) আমি কুরাইশের সাথে মৈত্রি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলাম। আপনার সঙ্গী অন্যান্য মুহাজিরগণের হিজরতকালীন মক্কায় রেখে আসা ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের হেফাজতের জন্য আত্মীয়-স্বজন সেখানে রয়েছে। কিন্তু আমার ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন হেফাজতের জন্য কোনো অবলম্বন সেখানে নেই। যদ্দরুণ আমি চেয়েছিলাম, এ চিঠির মাধ্যমে কুরাইশরা যেন আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। এবং কৃতজ্ঞতার অনুভূতি থেকে মক্কায় রেখে আসা আমার পরিবার-পরিজনদের কোনো ক্ষতি করা থেকে তারা বিরত থাকে। আমি এ কাজ এ জন্য করিনি যে, আমি মুরতাদ হয়ে গেছি, কিংবা এ জন্যও করিনি যে, আমি কুফরের উপর সন্তুষ্ট আছি..!"

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতেব রা. এর আত্মপক্ষ সমর্থনকে সত্যায়ন করে বললেন, "নিশ্চয় সে [হাতেব] সত্য কথা বলেছে। "

এতদ্বসত্ত্বেও হাতেব রা. এর এ কর্মকান্ড যেহেতু বাহ্যদৃষ্টিতে ভিন্নরকম মনে হচ্ছিল, তাই বীর সাহাবী হযরত উমর রা. তা বরদাশত করতে না পেরে বলে ফেললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আমি এই মুনাফেকের গর্দান উড়িয়ে দিই!’

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

انَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ :اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

ওফাত

মহানবী (সা.) তাদের মতানৈক্য ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাবার্তায় অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন : ‘ওঠো এবং আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও’

শেষ মুহূর্তে রাসুল (স.) এর ওসিয়ত:

অন্যান্যদের উপস্থিতিতে মহানবী (সা.) আলী (আ.) এর দিকে তাকালেন এবং তার উদ্দেশ্যে ওসিয়ত করতে চাইলেন, বললেন: কাছে এসো। অতঃপর তিনি নিজের যেরা (যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত ইস্পাতের তৈরী জামা), তলোয়ার, আংটি ও মোহর হযরত আলী (আ.) কে দিয়ে বললেন: ‘বাড়ীতে যাও’। এর কিছুক্ষণ পর তাঁর অসুস্থতা তীব্র আকার ধারণ করলো। তিনি পূনরায় স্বাভাবিক হওয়ার পর আলী (আ.) কে কাছে না পেয়ে স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে বললেনদ: ‘আমার ভাই ও সহচর কোথায়’। তারা হযরত আবু বকরকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আসলে মহানবী (সা.) পূনরায় একই বাক্য পূনরাবৃত্তি করলেন। অতঃপর তারা হযরত উমরকে ডেকে নিয়ে এলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) আবার বললেন : ‘আমার ভাই ও সহচর কোথায়’। উম্মু সালামাহ বললেন : তিনি আলীকে খোঁজ করছেন, তাকে আসতে বলো। আলী (আ.) আসলেন, অতঃপর তারা দু’জনে কানে কানে কিছুক্ষণ কথা বললেন। যখন আলী (আ.) কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, মহানবী (সা.) কি বলেছেন?

তিনি উত্তরে বললেন: আমাকে তিনি জ্ঞানের ১০০০টি অধ্যায়ের শিক্ষা দিয়েছেন এবং প্রতিটি অধ্যায় হতে আমার জন্য ১ হাজারটি অধ্যায় উন্মুক্ত হয়েছে। আর আমাকে কিছু কাজের কথা বলেছেন, যেগুলোকে আমি অবশ্যই সম্পাদন করব। ঐ অবস্থায় মহানবী (সা.) কয়েকবার বললেন:

ما ظن محمد بالله لو لقی الله و هذه عذره عنده

জীবনের শেষ দিনগুলির একটিতে তিনি মুসলমানদেরকে মসজিদে উপস্থিত হওয়ার লক্ষ্যে আহবান জানানোর জন্য হযরত বিলাল (রা.) কে নির্দেশ দিলেন। তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন: তিনি যদি কারো নিকট ঋণী থাকেন তবে তারা যেন দাবী করে। মহানবী (সা.) এ

কথার কেউ কোন উত্তর দিল না, তিনি এ কথাকে তিনবার পূনরাবৃত্তি করলেন। এমন সময় ভীড়ের মধ্য হতে ‘উক্কাশাহ’ নামক এক গোলাম (দাস) উঠে দাঁড়িয়ে নিজের অধিকার দাবী করলো। মহানবী (সা.) হতে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য একটি চাবুক প্রস্তুত করলো; কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার সময় প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে জড়িয়ে ধরে ক্রন্দন শুরু করলো এবং তাঁকে ক্ষমা করে দিল। মহানবী (সা.) বললেন : সে বেহেশতে আমার বন্ধু হবে।

অতঃপর তিনি হযরত আলী (আ.) কে নির্দেশ দিলেন তাঁর এক স্ত্রীর নিকট বিদ্যমান অর্থ দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করার জন্য।

সূত্র: আহকামে জিন্দেগী এপস্ থেকে।